শ্যামলী

নিরুপমা দেবী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

—সাড়ে চার টাকা—

পঞ্চম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৬২

প্রচ্ছদপট : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

কভার মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

প্রকাশক—শ্রীভানু রায়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বিজয়কুমার মিত্র, কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

২৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সাগ্নিকের পূজা

বক্ষের আঁধার গর্ভগৃহে অনির্ব্বাণ জ্বলে যে আলোক—
দগ্ধ করি অন্তরের যত কামনা কালিমা মোহ শোক,
চারিদিকে জটিল তিমির, অন্ধ বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ,
অচপল সেই স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখাইয়া দেয় লক্ষ্যপথ।

ওগো মোর দীপ্ত প্রাণশিখা, কবে জ্বলেছিল সে গুহায়
নিভেও গিয়েছে কবে, তবু তোমারি পরশ-জ্যোতি তায়
সাগ্নিকের অগ্নি সম সেথা, চলে হোম রাত্রি-দিনমান,
তাহারি আহুতি এই গীতি, এই অর্ঘ্য, এই সামগান॥

এই লেখিকার—

দিদি

অন্নপূর্ণার মন্দির

বিধিলিপি

পরের ছেলে

প্রত্যাবর্ত্তন

দেবত্র

যুগান্তরের কথা

উচ্ছৃঙ্খল

অনুকর্ষ

অষ্টক

১

আসন্ন শ্রাবণের মেঘভার আকাশের দিকে দিকে স্তূপীকৃত হইতেছিল। ঘন কৃষ্ণবর্ণ করীযূথের ন্যায় তাহারা দলে দলে অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া গগন-প্রান্তর ছাইয়া ফেলিতেছে। বৃংহিতধ্বনি নাই, বপ্রক্রীড়ার ঘটা নাই, তাহাদের ধীর মন্থর গতি ক্রীড়াকৌতুকের চাপল্যমাত্র-বর্জ্জিত। গম্ভীর অথচ শ্যামশোভায় আকাশ ছাইয়া তাহারা নীরবে যেন কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

সেই ঘন মেঘের শ্যামচ্ছায়া পৃথিবীর বুকের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহার হরিৎ বসনখানির বর্ণ গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। দীর্ঘশির বৃক্ষগুলা সেই মেঘরচিত শ্যামচ্ছদের নিম্নে স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে যেন অধীর হইয়া উঠিতেছিল। আর তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। যাহা হইবার শীঘ্র হইয়া যাউক, এতক্ষণ ধরিয়া কেন এ বৃথা প্রতীক্ষা, এইরূপ বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিয়া তাহারা ক্রমে চঞ্চল ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল। কেতকী ও কদম্বের বনে ঘন হরিতের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া শুভ্র পুষ্পস্তর ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। কুটজ কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি বর্ষার শ্বেত লোহিত পুষ্পদল সেই শ্যামচ্ছায়া সবুজের বুকের উপর নিতান্তই যেন উপেক্ষিত ভাবে ফুটিয়া আছে মাত্র। বর্ষার সেই ঊর্দ্ধে অধে বিস্তৃত ঘনশ্যাম বর্ণ-সমুদ্রের মধ্যে তাহাদের ঐ বর্ণ-বৈচিত্র্যটুকু নিতান্তই যেন খাপছাড়া, সুরহারা!

কিন্তু সেই শ্যামায়মানা প্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অট্টালিকার উপরে একটি

তরুণী নিস্পন্দদেহে নিশ্চলনেত্রে সেই পুঞ্জীভূত স্তূপীকৃত মেঘভারের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার অঙ্গের শ্যামবর্ণে এবং সেই তনুদেহের চতুর্দ্দিকে লম্বিত কতকগুলা কৃষ্ণকেশের চাঞ্চল্যে তাহাকে এই শ্যামলা প্রকৃতির সঙ্গে যেন একীভূত কোন পদার্থের মতই দেখাইতেছিল। যেমন ঐ হরিৎবসনা ধরণীর সহিত বহু উর্দ্ধের সেই স্তরবিন্যস্ত ঘনশ্যাম মেঘের মৌন একত্ব নিঃশব্দেই প্রতিভাত হইতেছিল, তেমনি সেই তরুণীর স্বচ্ছবিশাল নেত্রের শ্বেত ক্ষেত্রটুকু পর্য্যন্ত আকাশ ও ধরণীর শ্যামচ্ছায়াপাতে শ্যামলা হইয়া উঠিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ অন্তরকেও সেই শ্যামপ্রকৃতির সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিল। যেন এই আসন্নবর্ষার জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে তাহার দেহমনের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এমনি তন্ময় নিস্পন্দ ভাবে সে মেঘের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গুম্-গুম্ গুম্-গুম্—স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। মূক জড়-প্রকৃতির উপরে শব্দময় অনন্তের যেন এ একটা উপহাস মাত্র। তাই তাহার রুদ্ধকর্ণ এ শব্দে সচকিত হইল না। তরুণীটিরও মুখে বা চোখে একটুও স্পন্দন আসিল না। সে যেমন চাহিযা ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল। বায়ু আরও বেগে বহিল। এইবার যেন তাহারও সারা অঙ্গে সাড়া জাগিয়া উঠিল! মুক্তকেশগুচ্ছ আরও উড়িতে লাগিল, অঞ্চল বিপর্য্যস্ত হইল। তরুণী সেই আর্দ্র বায়ুর আঘাতে সসংজ্ঞ হইয়া হর্ষকণ্টকিতদেহে আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেই দেখিল আকাশের এককোণে বিদ্যুতের স্বর্ণজ্যোতি ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। যেন শ্যাম-গিরিশৃঙ্গে স্বর্ণভুজঙ্গিনী খেলিয়া বেড়াইতেছে। সেই দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তরুণীর সমস্ত মুখে ও চক্ষে মুহূর্ত্তে সেই বিদ্যুতের মতই দীপ্তি খেলিয়া গেল। ছাতের আলিসার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আনন্দোজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িল। তরুণী তাহার সেই হর্ষবিকসিত চক্ষুকে আবার উর্দ্ধে মেঘের পানে স্থির করিবামাত্র তাহার চোখে-মুখেও

কতকগুলা ফোঁটা পড়িল। হাসিয়া চক্ষু মুছিয়া সে আবার চাহিল। আবার চোখের ভিতর জল পড়ায় চোখ মুছিতে হইল, কিন্তু তথাপি সে রণে ভঙ্গ দিল না। মেঘের ধারার সঙ্গে এই হাসির খেলা তাহার কিছুক্ষণ ধরিয়াই চলিল, ওদিকে সর্ব্বাঙ্গ যে মন্দ মন্দ বৃষ্টিধারায় অভিষিক্ত হইতেছে, সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্যই নাই।

একটি রমণী ভিজিতে ভিজিতে ছাতে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ডাকিলেন, "শ্যাম্‌লি!" তরুণী চমকিয়া উঠিয়া আগন্তুকের পানে চাহিল। রমণী বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যাকে ভগবান বঞ্চিত করেন তাকে কি এমনি করেই বঞ্চিত করেন! এমন করে ভিজছিস্ তাও কি তোর হুঁস্ নেই? চল্।" বলিতে বলিতে তিনি ছাত হইতে তাহাকে একপ্রকার টানিয়া সিঁড়ির মধ্যে লইয়া গেলেন। নবাগতার বিরক্তিপূর্ণ মুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তরুণী উচ্ছ্বাসের সহিত তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং বালিকার ন্যায় অধীর আনন্দে বাহিরের মেঘের পানে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া রমণীর বিরক্ত মুখখানা সেইদিকে ফিরাইয়া ধরিল। রমণী বলিলেন, "দেখেছি, দেখেছি, মেঘ উঠেছে, ভিজ্‌তে হবে কি তাই বলে? সব চুল ভিজে গেছে, সারা গায়ে জল, এতটুকুও কি তোর হুঁস্ হবে না? নে, মাথা মোছ্।"

সম্মুখের সুবিন্যস্ত সুনীল মেঘস্তরে সুতীব্র আলোক জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। রমণী ব্যস্তভাবে "মাগো চোখ গেল যে! চল্ হতভাগী নীচে চল্" বলিয়া কন্যাকে আকর্ষণ করিতে গেলেন, কিন্তু কন্যা ইতিমধ্যে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সেই বর্ষণোন্মুখ মেঘের পানে চাহিয়া উচ্ছল আনন্দে করতালি দিতে দিতে সে মেঘমণ্ডিত আকাশের তলে বসিয়া পড়িল! রমণী বিব্রত ভাবে ডাকিলেন, "বিজ্‌লি, বিজ্‌লি, ওঁকে ডেকে দে ত একবার!"

সিঁড়ির নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, "কেন মা?"

"এ পাগলকে যে আমি ঘরে নিয়ে যেতে পারি না। তুইই একবার আয় দেখি।"

স্থির বিদ্যুৎলেখার ন্যায় একটি কিশোরী মাতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সভ্রূভঙ্গে বলিল, "ও তো মেঘ দেখলেই অমনি করে,—থাকুক অমনি,—যেমন ওর বুদ্ধি!"

"তাই বলে কি ভিজে মরবে? এই বর্ষায় ভিজ্‌লে ব্যারাম হবে যে!"

"দাঁড়াও তুমি, আমি দেখি।"

"না রে তুই আর ভিজিস্‌ না—জোরে জলও এল যে,—আমিই দেখি।" মাতা ছুটিয়া গিয়া আবার কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ওরে ঘরে চল্‌ পাগল—ঘরে চল্‌!"

পাগল নড়িল না, স্পন্দিত-তার-লোচনে দিগন্তে যেখানে পেঁজা তুলার আকারে তরলীকৃত মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মাতা এইবার দুইহাতে কন্যার মুখ নিজের পাশে ফিরাইয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "শ্যাম্‌লি, শ্যাম্‌লি, আমার কথা শুন্‌বি না—আমায় কষ্ট দিবি? চল্‌, ঘরে চল্‌, জান্‌লায় গিয়ে বসে মেঘ দেখবি চল্‌।"

মাতার মুখের পানে চক্ষের পানে একটু চাহিয়া শ্যামলী আবার শিশুর মত তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল এবং এইবার মাতা আকর্ষণ করিতেই তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে ধীরে-ধীরে আশ্রয়ের তলায় গিয়া দাঁড়াইল। মাতা তাহার অঞ্চল নিংড়াইয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন আর বিজলী বকিতে বকিতে নিজের শুষ্ক অঞ্চল দিয়া তাহার সুদীর্ঘ আর্দ্র কেশগুলিকে নিংড়াইতে লাগিল।—"ও তো চিরকেলে পাগল! তুমিও এই বর্ষায় কি বলে ওর সঙ্গে ভিজে এলে মা? বাবা দেখলে এখনি অনর্থ করবেন। নাও, তুমি এইবার কাপড় ছাড়গে, আমি শ্যাম্‌লিকে নীচে নিয়ে যাচ্চি। কি লো নীচে যাবি, না বাবাকে ডাকব?"

কনিষ্ঠার রুক্ষ মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তে শ্যামলী বিদ্রোহীভাবে ফিরিয়া

দাঁড়াইল এবং নিজের কেশগুলা তাহার হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল।

বিজলী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখলে, দেখলে মা! এঁকে বল তুমি পাগল! 'সেয়ানা পাগল বোঁচ্‌কা আগল!' রাগটুকু বিলক্ষণ আছে! তাও যদি কানে শুনতে পেত আর কথা কইতে পারত তাহলে না জানি কি করত!"

"তাহলে কি ও এমনই হত রে? আমার কপাল, ওরও কপাল! যা, তুই আর বকাবকি করিস্‌নে; উনি শুনতে পেলে, এসে আরও গণ্ডগোল করবেন। তুই নীচে যা, আমি ওকে নিয়ে যাচ্চি।"

বিজলী অস্ফুটস্বরে বকিতে বকিতে নীচে চলিয়া গেল। মাতা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া সাদর ভঙ্গীতে নীচে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং তাহার একখানি হাত ধরিয়া নিজেও অগ্রসর হইলেন। শ্যামলী নিঃশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে মাতার সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল।

সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া মাতা কন্যাকে একটি জানালার নিকটে বসাইয়া দিলেন। শ্যামলী বাহিরের বর্ষণাচ্ছন্না ধূমাকারা পৃথিবীর পানে চাহিয়া সাগ্রহে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মাতা ক্ষুব্ধস্নেহের ম্লানহাস্যে বলিলেন, "হয়েছে-হয়েছে, আর আদর করতে হবে না। চুপ করে এই জানালায় বসে থাক্ এখন, বুঝলি? বাইরে যাস্‌নে যেন।"

কন্যা মাতার মুখভাবের ইঙ্গিতে তাঁহার কথা যে বুঝিয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া চোখ মুদিল। মাতা ক্ষণেক সেইভাবে থাকিয়া বলিলেন, "ছাড়্, কাজ আছে।" হস্তদ্বারা কন্যাকে সরাইয়া দিয়া মাতা উঠিয়া গেলেন।

শ্যামলী তখন একাগ্রমনে জানালায় বসিল। এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির ধূমল বর্ণের এবং শীতলস্পর্শের যে একখানি আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার অন্তরালে তাহার চির-অম্লান অপরিবর্ত্তিত ধ্রুবরূপটি চিরপ্রকাশিত আছে, এই

মেঘাবরণ ভেদ করিয়া শ্যামলী সেই রূপটি দেখিবার জন্যই তাহার সদা-জাগ্রত মনটিকে যেন চক্ষের পথে প্রাণান্ত আগ্রহে অগ্রসর করিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। ধরণী যেখানে ভাষাময়ী শব্দময়ী, সেখানে তো তাহার সহিত শ্যামলীর কোন পরিচয় নাই। সে যে আজন্ম বধির আজন্ম মূক। সেইজন্য এই রূপময়ী বর্ণময়ী প্রকৃতিই তাহার সর্ব্বস্ব এবং দুটি সদা-জ্বলন্ত সদা-জাগ্রত চক্ষুই শ্যামলীর তাহাকে অনুভব করিবার একমাত্র অবলম্বন।

২

সহরের কোন প্রসিদ্ধ বড় রাস্তার উপরে কোন এক ধনীর প্রকাণ্ড চারিতালার অট্টালিকার মধ্যে সেই গৃহের গৃহিণী তাঁহার পুত্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। গৃহের সাজসজ্জার অভাব নাই। অট্টালিকাটিও যেমন বিপুল, তাহার মহার্ঘ সজ্জাও তেমনি গৃহস্বামীর বিপুল ধনের পরিচায়ক। কক্ষে কক্ষে বিদ্যুতের আলোক,—দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার শিল্পকৌশলসংযুক্ত ধাতু কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নির্ম্মিত খট্টা, আসন, দ্বারাবরণী, পুত্তলিকা, স্ফটিকের নানাবিধ দ্রব্য, কিছুরই অভাব নাই। কেবল এহেন সুখসৌভাগ্যশালী গৃহের মধ্যস্থ মাতা-পুত্রের কথোপকথনে সমমতের কিছু অভাব লক্ষিত হইতেছিল। মাতা বলিলেন, "এবার আর কথাটি কইতে পাবি না—বুঝ্‌লি?"

পুত্র বলিল, "একটিও না?"

পুত্র হাসি-হাসি মুখে উত্তর দিতেছে। মায়ের কথাগুলি কোপ ও দৃঢ়তাসূচক!

"না, একটিও না! এম-এ পাশ করা হয়ে গেল, আবার কথা কইবি কি শুনি? এখন যে মেয়ে আমি পছন্দ করে দেবো তাকেই তোকে বিয়ে করতে হবে।"

"তা সে কানা-খোঁড়াই হোক্, আর হাবা-কালাই হোক্—নয় মা?"

"তোর চালাকি রাখ্ত অনিল। ওসব কথায় এবার আর আমায় ফাঁকি দিতে পারছিস্ না। আমি ওঁকে কানা-খোঁড়া কি কালোকুচ্ছিত মেয়েই গছিয়ে দেবো যেন! উনি যেন তা জানেন না, তাই এই সব চালাকি! কিন্তু এই মেয়ে-পছন্দ নিয়েই যে তুমি আমায় হায়রান করবে আবার, সে জোটি তোমার রাখছি না। আমার যাকে পছন্দ হবে তাকেই তোর বিয়ে করতে হবে, জেনে রাখ্।"

"হ্যাঁ মা, তাকে যদি আমার পছন্দ নাও হয়, তবুও বিয়ে করতে হবে?"

"হ্যাঁ হবে। ওঁর আবার পছন্দ! এই তিন চার বচ্ছর ধরে কত কত পরীর মত সুন্দরী মেয়ে ওঁকে দেখালাম, তার একটাকেও যার পছন্দ হ'ল না তার কি পছন্দ বলে কোন জিনিস আছে? এবার আমি যা সুমুখে পাব, যে মেয়েকে আমার ইচ্ছে হবে, তাকেই ধরে তোর বিয়ে দেবো। দেখি তুই কি করতে পারিস্।"

পুত্র অপরিমিত হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওমা তাই কর মা! সেকালের গল্পের সেই রাজাদের মত তোমার এই ধেড়ে আইবুড়ো ছেলের দায়ে বিব্রত হয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে রাত পোহালে উঠে যার মুখ দেখব তার সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবো। তারপরে সকালে উঠে জানালা দিয়ে রাস্তা সাফ্করা মেথরাণীকেই ছাখ কিম্বা ডিম্ওয়ালি মাখন্ওয়ালিকেই ছাখ, তাকেই বৌ করে ফেলো, কেমন মা?"

"আমাকে বিস্তর রাগাসনে, অনিল। আমি মেথরাণী বৌ করব? তার

মেয়ে আমার পছন্দ লাখ্‌গুণে উঁচু তা জানিস্‌? কেমন মেয়ে বৌ করতে যাচ্ছি দেখবি একবার তবে?”

মাতা ব্র্যাকেট হইতে এক্‌থোলো চাবি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটা চন্দনকাষ্ঠের বহুশিল্পচাতুর্য্যযুক্ত আল্‌মায়রা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো ফটো বাহির করিলেন। সেখানির উপর একবার নিজে চোখ বুলাইয়া লইয়া সগর্ব্বে সেটি পুত্রের চক্ষের নিকট ধরিয়া বলিলেন, “ত্যাখ্‌ দেখি একবার!”

অনিল একভাবেই হাসিমুখে বলিল, “আঃ চোখের ভেতর গুঁজে দিলে কি দেখতে পাওয়া যাও? হাতে দাও, দেখি—কাণ্ডখানা কি!”

“এই ত্যাখ্‌—কিন্তু এ তোমায় পছন্দ করতেই হবে বাপু তা কিন্তু বলে রাখছি—নইলে আমি অনর্থ করব। আমি ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছি!”

পুত্র ফটো হাতে লইতে গিয়া হাত টানিয়া লইল, হাসিয়া বলিল, “যখন পছন্দ করতেই হবে,—তোমার এই হুকুম, তখন আর কেমন, কি বৃত্তান্ত, দেখে কি হবে! তা সে গয়লানীই হোক্‌ আর মালীবৌই হোক্‌।”

“অনিল, তুই কি আমায় পাগল করবি! কি অপছন্দের জিনিসটা আমি পছন্দ করছি একবার চোখ মেলে ত্যাখ্‌ আগে—তারপরেই না হয় ওসব বলিস্‌!”

“পছন্দ করতেই হবে একথা শুন্‌লে কি মা আর পছন্দের পাত্তা পাওয়া যায়? সে ও হুকুমকে সেলাম ঠুকে দুশো হাত দূরে পালায়, তা কি জান না মা?”

“আচ্ছা আচ্ছা, তুই আগে ত্যাখ্‌, পছন্দ কর, তার পরেই না হয় সে-কথা হবে।”

“বেশ, এই তো ভদ্রলোকের মেয়ের মত কথা। তুমি যে তাড়া আমায় দিয়েছ মা—তাতে ঠিক যেন বোধ হ’ল তোমার বাবা—সে কথা কি আর বলব—”

মাতা স্নেহ-কোপের সহিত সতর্জ্জনে বলিলেন, “আমি যাই তেমন বাপের

বেটি, তাই এই তোর মত বুড়ো ছেলেরও এত দামালি সয়ে আছি! আমার বাপকে আবার গাল?"

পুত্র ভালবাসা ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কোমল চক্ষে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, —"হ্যাঁ, তা সেটা আমায়ও স্বীকার করতে হবে মা।"

"নে নে, এখন বাজে বকুনি রাখ্—ছবি দেখবি কি না?"

"দাও, না দেখে আর কি করি। কিন্তু বল্‌ছিলাম কি মা যে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদটা দিয়ে ছবি দেখাদেখি করলে হত না?"

"এম-এ হলো তো আবার রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ? আর তাই যদি পড়্‌বি পড়্‌না, তাতে বিয়ে করলে কি দোষটা হবে শুনি?"

"আহা বোঝ তো মা, বিয়ে করলে কি আর পড়াশোনা হয়? তোমরাই তো বল এ-কথা!"

"আবার চালাকি? এখনো যদি অম্‌নি করবি, সত্যি আমি মাথামুড় খুঁড়্‌ব—"

"আচ্ছা আচ্ছা, আর আমি কিছু বল্‌ব না, তুমি বিয়ের জোগাড় কর।"

"আগে ছবি ছ্যাখ্—ছ্যাখ্ আমি কেমন মেয়ের খোঁজ পেয়েছি এবার। কত পরীর মত সুন্দরী মেয়ে যে তুই ফিরিয়ে দিয়েছিস্, একে যদি ঘরে আন্‌তে পারি সে দুঃখ আমার ঘুচবে।"

পুত্র ছবিখানা লইয়া ধীর অনুসন্ধিৎসুভাবে ক্ষণিক দেখিয়া বলিল, "এরও তো দুটো পা, দুটো চোখ, দুটো হাত! কই মা, পরীর মত দুটো ডানার সন্ধান তো মোটেই পাচ্ছি না।"

মাতা সবেগে পুত্রের হাত হইতে ছবিখানা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "ছ্যাখ্ দেখি কেমন চোখ, কেমন ভুরু, কেমন মুখ, কি গড়ন, আর রংও –"

"আঃ সে তো দেখতেই পাচ্ছি—কেমন ছাইএর মতন চমৎকার –"

"এ ফটোতে রঙের কি বুঝ্‌বি বল্ ত? পেণ্ট করে আনালে দেখতে

পেতিস্ কেমন গোলাপের মত রং। নামেও বিজলী, দেখতেও ঠিক বিদ্যুতের মতই। বিশ্বাস না হয় শিশিরকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর।"

"শিশিরকে?—সেই বুঝি এবারের গুপ্তচর তোমার?"

"সে কেন হবে? সইকে আমিই তোর উপযুক্ত একটি মেয়ের জন্য চিঠি লিখি—সেই খোঁজ দিয়েছে। তার চিঠিতে মেয়েটি বড্ড সুন্দর শুনে শিশিরকে আমি দেখতে পাঠিয়েছিলাম, ফটোর ক্যামেরাটাও সঙ্গে দিয়েছিলাম।"

"বাঃ! এত কাণ্ড করেছ, অথচ আমি কিছুই জানি না। আমি জানি শিশির তার বাড়ী যাচ্ছে। তার সঙ্গে কখন্ বা এত পরামর্শ আঁট্‌লে?"

"তুই তো সব খোঁজই রাখিস্? কি বিষয়-আশয় দেখা, কি সংসারের কিছু দেখা, কিসের খোঁজ তুই রাখিস্? আমি না থাক্‌লে তোর যে কি গতি হবে—"

"সে কথা সত্যি গো। তোমার মতন মা-টি না হলে আমার যে কি হত—"

"নে-নে, কিন্তু তাই বলে চিরকাল তো মায়ের খোকা হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না বাপু—"

"কেন চল্‌বে না? তোমার সলিল সব বিষয়-আশয় সংসার-ধর্ম্ম দেখবে, আর আমি তোমার খোকা হয়েই তোমার কোলে দিন কাটাব।"

"তাইত! তা হলেই আমি বর্ত্তে গেলাম আর কি! তুই আগে, সলিল পরে। একটি ভাল বৌ এনে তোর এই খোকামি ঘুচিয়ে সংসারী করে তবে আমার নিশ্চিন্তি।"

"তোমার ভাল বৌ এসে সর্ব্বাগ্রে আমার খোকামিটিই ঘোচাবে? তবেই হয়েছে মা,—"

"ওরে রাখ্ রাখ্। এই সুন্দর বৌ পেয়ে শেষে দিনান্তে একবার মায়ের কাছে আস্‌তেই মনে থাকবে না হয়ত দেখিস্! তখন হয়ত এ খোকামির কথা মনে করতেও হাসি পাবে।"

পুত্র ছলগম্ভীর মুখে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "এই এতক্ষণে ছেলের বিয়ে দেওয়ার সার মর্ম্ম তোমার মনে এসেছে মা। তবুও এই ছেলে পর করার ঝোঁক্ তো যাবে না!"

"ঝোঁক যাবে কিরে, সংসারে এসে এই-ই তো করতে হয়। মেয়েটিকে কত যত্নে মানুষ করে পরের ঘরে পাঠিয়ে পরের চেয়েও পর করে দিতে হয়। ছেলেকে ততোধিক আশার সঙ্গে গড়ে তুলে শেষে কারও কপালে সে আপনারই থাকে, কারও পর হয়ে যায়, তবু একটি পরের মেয়ে এনে তার সঙ্গে গেঁথে দিয়ে তবে ত মার নিশ্চিন্তি। এ-কি একা আমি করছিরে, জগতই তো এই করছে। এই একান্ত আপনারটিকে পর করতে না পেলেও মানুষের কতনা ভাবনা কতনা দুঃখ!" মাতা উচ্ছ্বসিত একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। পুত্র ব্যথিত হইয়া মাতার পানে চাহিয়া রহিল! মাতা তখনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "কি এমন করে দেখছিস্—মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে মা বাপে কত কাঁদে দেখিস্নি কি? তুই যে ছেলের মত নস্, তুই যে আমার মেয়ের মত চিরকেলে আঁচলধরা। তোকে আমার চেয়েও একজন আপনার লোক এনে দেবো, এতে একটু চোখে জলও আস্‌বে না?"

পুত্র অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "কি জানি কি করছ মা— ভাল করছ কি মন্দ করছ ভগবানই জানেন।"

"সেই ভাল কথা, মায়ে যা করে থাকে তাই করছি, ফল ভগবানের হাতে। তুই ভাবিস্‌নে অনিল, বেশ সদ্বংশের মেয়ে, বড়লোক নয়, কিন্তু খুব ভাল ঘর। কেমন মেয়ে আনব, সে কেমন হবে, তা কি আমারই ভয় নেইরে?"

"তুমি সবদিক দেখেই করছ, তা কি আমি জানি না? আমি সেকথা ভাবছি না মা—আমি ভাবছি—কি জানি কি ভাবছি তাও জানিনা—কেমন মনটা বড় খারাপ করছে।"

মাতা লজ্জিতভাবে বলিলেন, "আমারি দোষে করছে অনিল। আমি বুড়ো-

মাগী সত্যিই যেন মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি এমনি কাণ্ড করলাম। তুই যে আমার ছেলে, তুই যে আমায় বৌ এনে দিবি, নাতি-নাতনি দিবি, আমার সংসার সাজিয়ে দিবি। তুই কি আমার সত্যিই মেয়ে যে পরের ঘরে পর হয়ে যাবি অনিল? ছিঃ, আর ওকথা ভাবিস্‌নে। শিশিরকে ডাকতে পাঠিয়েছি। তার কাছে যা তোর খোঁজ নিতে ইচ্ছে হয় নে। এ মেয়ে ইচ্ছে না হয় বল্‌ অন্য মেয়ে দেখি, কিন্তু এইটিই আমার বড় পছন্দ।"

"তোমার পছন্দেই কাজ হোক্‌ মা—এর আর শুনব দেখব কি?"

"না-না, তাও কি হয়? খোকা সেজে থাকিস্‌ বলে কি সত্যিই তুই তাই? সব ভার মেয়েমানুষ মার ওপর দিলে হবে কেন? এই যে শিশির এসেছিস্‌—অনিলকে বল্‌ কেমন মেয়ে দেখে এলি।"

অনিল এইবার চেষ্টার দ্বারা মুখে হাসি আনিয়া বন্ধুকে সম্ভাষণ করিল, "কিহে গুপ্তচর, তোমার এই কাজ? তুমি না কত কি করবে, কত কি হবে? চিরকৌমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দ্বিতীয় ভীষ্ম হবে?"

শিশির হাসিয়া কাশিয়া মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "বাঃ আমি কি নিজে বিয়ে করতে যাচ্ছি নাকি? আমি তো মার হুকুমে তোমার কনে দেখতে গিয়েছিলাম?"

"শুধু কনে দেখতে যাওয়া? ক্যামেরা পর্য্যন্ত ঘাড়ে করে! বাহাদুর বটে! পরের জন্য এমন ঘাড় না ভেঙে নিজের চেষ্টা দেখলেই তো পারতে।"

"ওকে কেন বক্‌ছিস বাছা—ও তোর মত অবাধ্য ছেলে নয়। ও কি আমার কথা ঠেল্‌তে পারে? নে তোরা কথাবার্ত্তা কয়ে সব ঠিক করে ফ্যাল্‌; আমি পূজো করতে যাই। আসছে মাসেই বিয়ের দিন ঠিক করব—তা কিন্তু বলে রাখছি।"

মাতা চলিয়া গেলে অনিল শিশিরকে বলিল, "মাকে এমন করে খেপালে কেন বল দেখি?"

"একটু বাড়িয়ে বলিনি ভাই—মেয়েটি সত্যই অতি অপূর্ব্ব !"

"অপূর্ব্ব তো নিজের জন্যে ঠিক করলেই পারতে! তোমার অনূঢ় আদর্শের গয়ায় পিণ্ডি পড়ে যেত।"

"আঃ—কি যে বল—গিয়েছি তোমার জন্যে কনে দেখতে—"

"তা কি হয়েছে ? তোমায় আমায় প্রভেদটা কিসে ?"

"জমীন-আসমানে যতখানি। তুমি হলে লক্ষপতি কৃতবিদ্য সুন্দর সচ্চরিত্র—"

"আর তুমি একটা এম-এ পাশ হতভাগা বওয়াটে বোম্বেটে! চাট্টি টাকা বেশী বলে আমার বিশেষণ ঐগুলি—আর তুমি—নাঃ, যার প্রারম্ভেই বন্ধু-বিচ্ছেদ শুরু হ'ল, তার শেষ ফল না-জানি কতদূর—"

"বন্ধু-বিচ্ছেদ ? তুমি বল কি অনিল ?" রুদ্ধকণ্ঠে শিশির উত্তর দিল।

"আর বল কি !" ফটোর পানে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অনিল বলিল, "আমাদের দেশের কনের মত ছোটখাটো নয়, বয়স চোদ্দ-পনের হবে, নারে ?"

"কিছু কম হবে, তের-চোদ্দ এই রকম। কিন্তু তুমি বন্ধুবিচ্ছেদ শব্দটা মুখে কেন আন্‌লে অনিল ? এমন শুভদিনের সম্ভাবনায় এমন কথা—"

"আঃ—যা প্রায়ই ঘটে থাকে তাই-ই বলেছি, তাতে হয়েছে কি ? এই তো মা ছেলে পর হয়ে যাবার আশঙ্কায় কেঁদে ফেল্‌লেন, আবার বিয়ে দিতেও ছাড়বেন না। আর তুমিও সেই 'অপূর্ব্ব' মেয়েটি দেখে নিশ্চয়ই মনে আশঙ্কা করেছ যে এইবার আমাদের চিরকালের বন্ধুত্বের মাঝে একটি বিষম ছেদ পড়বার সময় এল। আমিও বলছি যে এইবার এক নূতন পালা শুরু হ'ল আমাদের—না ?"

শিশির ঈষৎ আশ্বস্তভাবে বলিল, "হ্যাঁ, তা একরকম হ'ল বই কি। কিন্তু এ যে জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য—তোমায় করতেই হবে অনিল।"

"নাঃ, সুন্দর মেয়ে দেখে তোর মত পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেছে দেখছি। এমন

কথা তো তোর মুখে শুনিনি কখনো !"

"আমি কি আমার বিষয়ে বল্‌ছি নাকি ? তোকে যখন মার কথায় বিয়ে করতেই হবে তখন এ অবশ্যকর্ত্তব্য না ত কি ? এমন মেয়ে হয়ত আর না পেতেও পার অনিল ?"

ফটোখানা আর-একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া অনিল বলিল, "হ্যাঁ সুন্দরী বটে, বংশও ভাল শুনেছি, কিন্তু আমাদের এই মা-ছেলের মধ্যের উপযুক্ত হয় তবে ত ?"

মাতা সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "নাঃ, তোর জ্বালায় আমার পূজো করতে বসাও ঘটে না দেখছি। অত ভাবছিস্ কেন বল্ ত ? আমি যদি ঠিক তোরও মা হতে পারি, তাকে আমার মেয়ে হতেই হবে, এ জেনে রাখিস্।"

"তুমি ছেলের বিয়ের ভাবনাতেই যখন পূজো আহ্নিক বন্ধ করলে মা, তখন বিয়ের সময় এলে যে কি করবে, এই ভাবনায় আমারও পেটের ভাত চাল হচ্ছে। যাক্, আর আমি অন্য ভাবনা ভাবতে যাচ্ছি না। যদি কিছু ভাবি সে কেবল বিয়ের রেশালার কথা,—আর—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্ধুর প্রতি গোপন কটাক্ষপাতে মাতার অলক্ষ্যে তাহাকে ইঙ্গিতে ফটোখানা দেখাইল। উভয় বন্ধু যুগপৎ সজোরে হাসিয়া উঠায় মাতাও সকটুকু না বুঝিয়া—"আচ্ছা—আচ্ছা—সবতাতেই বাক্‌চাতুরী ! তোমায় রেশালার ভাবনাও ভাবতে হবে না বাপু, যাও, এখন স্নান করতে যাও"—বলিতে বলিতে তিনি হাসিমুখে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

নির্দ্দিষ্ট কালের অধিকাংশ দিনই প্রায় কাটাইয়া দিয়া শরৎলক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাঁহার রাজসভার সঙ্গে লইয়া পল্লীগ্রামের উপর আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু কে তাহার খবর রাখে! মানুষ আপনার সুখদুঃখ ও অভাব-অভিযোগ লইয়া, এমন অবকাশ পায় না যে, আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টি ফিরায়। যাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন অনুভবশক্তি জগতের যত যা কিছু অনুভাব্য, তাহা প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে সক্ষম—তাহাদের কাছে প্রকৃতির এ নিত্য নব বিচিত্রতায় তো কোন অজ্ঞাত রহস্যের আকর্ষণ নাই। তাহারা জানে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, শরতের পর হেমন্ত, শীতের পর বসন্ত এ তো পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে চিরকালই চলিতেছে, চলিবে। তাহারা দেখে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে জ্বালাময় আকাশকে এবং দগ্ধ তাম্র দিগন্তকে বর্ষার মেঘে শ্যামল করে, শরতের বিচিত্র মেঘভরা স্বর্ণ-কিরণোজ্জ্বল নীলাম্বর ও হরিৎ দিক্‌শোভাকে নীহার-বাষ্পে ধূসর করিয়া হেমন্ত আসে। তার পরে শীতের ঘনশুভ্র তুষারজাল ঝাঁপিয়া বসন্তের পীত উত্তরী জলে স্থলে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা শোনে, গ্রীষ্মের খর-দাহদগ্ধ ভীত পক্ষীর 'ফটি-ই-ইক্ জল,' আষাঢ়-শ্রাবণের স্নিগ্ধ চণ্ড নীরদ নির্ঘোষ, শরৎ হেমন্তের বিচিত্র কাকলী; শীতজর্জ্জর তীক্ষ্ণ বায়ুর বৃক্ষপত্র-কুঞ্জে শিরশির শব্দ, তার পরে বসন্তস্পর্শমুগ্ধ জগতের শত কণ্ঠে শতগান শততান। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিস্ময়ের বা মুগ্ধ হইবার তো কিছুই নাই। যাহাদের সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন, কিসের হইতে কি হইতেছে, তাহা ভাবিবার অগ্রেই বুঝিতে পারে, তাহারা তো প্রকৃতির দ্বারে ভিক্ষুকের মত চাহিয়া বসিয়া থাকে না। আর যে অর্দ্ধবোধ-শক্তিসম্পন্ন জীব এই

অনুভবময়ী প্রকৃতির আধখানার বেশী অনুভব করিতে পারে না, এই শব্দশব্দ-চাঞ্চল্যময়ী প্রকৃতি যাহার চোখের উপর নৃত্য করিতেছে, যাহার নৃত্য-ভঙ্গী সে দেখিতে পায়, অথচ তাহার নূপুরের শব্দ যাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, সেই বধিরতার অতল সমুদ্রে নির্ব্বাসিত জীবের কাছে এই অর্দ্ধমাত্র প্রকাশিত প্রকৃতির নিত্য নবরূপসম্পদ অতি আশ্চর্য্যের, অতি আকর্ষণের! যে দেখিতে পায় না, সে তাহার বাকী সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি দিয়া কেবল শোনে; আর যে শুনিতে পায় না, তাহার সর্ব্বাঙ্গ একান্ত ভিক্ষুকের মত, মুগ্ধের মত প্রকৃতির দ্বারে শুধু দেখিবার জন্যই পড়িয়া থাকে। বায়ুর পদশব্দ তাহার বোধশক্তিতে পৌঁছে না বলিয়া বায়ুর স্পর্শে এবং তাহার মেঘে মেঘে ও পৃথিবীর বসনাঞ্চলের উপর দিয়া গমনভঙ্গী দর্শনমাত্রেই সে হর্ষকণ্টকিত হইয়া উঠে। এই বহুবর্ণময়ী রূপ-শোভান্বিতা প্রকৃতির বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে কেবল তাহাকে দেখিয়াই লয়। তাহার সেই অর্দ্ধ-উন্মেষিত জীবন উন্মাদের বা শিশুর মত কেবল দেখাতেই মুগ্ধ ও তন্ময় থাকে।

বিস্তৃত জলাশয়ের তীরে শ্যামলী বসিয়া ছিল। তাহার মাতা এবং ভগ্নী তখনো স্নান করিতেছেন, শ্যামলীর সিক্তবস্ত্র ছাড়াইয়া গা মাথা মুছাইয়া দিয়া মাতা তীরে তুলিয়া দিয়াছেন,—বিজলী তখনো সাঁতার কাটিতেছে। শ্যামলী বিলের অপর তীরের পানে মুগ্ধদৃষ্টি পাতিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল। শরতের নির্ম্মল নীল আকাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ শুভ্র মেঘখণ্ড যখন বিলের বিস্তৃত স্বচ্ছ হৃদয়ে ছায়া ফেলিয়া মাঝে মাঝে সূর্য্যকে আড়াল করিতেছিল, তখন আবার সচকিতে সে আকাশ-পানে চাহিয়া হর্ষের আধিক্যে উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল।

মাতা ও ভগ্নী স্নান সমাপনান্তে উঠিয়া আসিলে শ্যামলী হস্তের ইঙ্গিতে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইল নিকটস্থ একটি বৃক্ষে, একটা অতিক্ষুদ্র পক্ষী বসিয়া মাঝে মাঝে মুখ নাড়িতেছে ও গলা ফুলাইতেছে। মা চাহিয়া

দেখিলেন, বিজলীও দেখিয়া মুগ্ধ ভাবে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "এইখানে বসে ও এমন করে ডাকছে! ছাখ মা, অন্য দিকে চেয়ে আছে বলে এত কাছেও আমাদের টের পাচ্ছে না, একমনে ডেকেই যাচ্ছে। আঃ ধরতে পারা যেত যদি?"

মাতা বলিলেন, "খাঁচায় পুরলে কি ও অমন করে আর ডাকৃত বাছা?"

শ্যামলী তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, বিজলী সভ্রূভঙ্গে চক্ষে ও কর্ণে হস্ত দিয়া হস্ত নাড়িয়া ইঙ্গিতে শ্যামলীকে জানাইল, "ও পাখীর রূপ কি ছাই, বিচ্ছিরি! ওর ডাক্ শুন্‌তে পাচ্ছিস কি যে ওর মিষ্টি স্বর তুই বুঝবি? হাঁ করে দেখবার কিচ্ছু নেই ও পাখীতে, কেবল ওর গান শুন্‌তে মিষ্টি। ও তুই কি বুঝবি?"

ভগ্নীর পুনঃ পুনঃ কর্ণেন্দ্রিয় স্পর্শে ও কি একটা ইঙ্গিতে শ্যামলী প্রায়ই এমনি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত। এখনও মার দুঃখপূর্ণ দৃষ্টি এবং বিজলীর ইঙ্গিতে আবার নিজের একটা কিছু অভাবের তীব্র আভাস বুঝিয়া শ্যামলী বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ দৃষ্টিতে কেবল পাখীটার পানে চাহিয়া রহিল। কিসের তাহার অভাব তা ত সে জানে না,—কিন্তু কেন সকলে তাহার পানে এমন করিয়া চায়?

নিকটে নরসমাগম বুঝিয়া পাখীটা এইবার পলাইল; কোন্ দিকে গেল দেখা গেল না, কেবল তার উচ্চ তীব্রকণ্ঠ দিকে দিকে বাজিতে লাগিল— "কু-কু-কু-কু-কু-কু-কু-কু! কুক্ কুকু! কুক্ কুকু!"

বিজলী আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টিতে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "কি সুন্দর ডাক্‌ছে—ওমা—কি মিষ্টি গলা ওদের! ঠিকই যেন বলছে, 'চোখ গেল—চোখ গেল'—পাপিয়ার মত মিষ্টি স্বর আর কোন পাখীরই নয়—না?"

মা একটা হুঁ বলিয়া বিহ্বলদৃষ্টি দুর্ম্মনা চিরবধির কন্যার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া সস্নেহ সবিষাদ ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, "চল্ মা, বাড়ী যাই চল্।"

মাতার অঞ্চল ধরিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্যামলী অত্যন্ত মন্থর গতিতে,

যেন বিষাদের ভরে বিহ্বল হইয়া চলিতে লাগিল। পাখীটাকে দেখা যাইতেছে না—অথচ তাহার ভগ্নী কি যেন একটা সুন্দর জিনিস অনুভব করিতেছিল। সে অনুভবটা যেন শ্যামলীর এই শারদসৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়ার সুখানুভবের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। ঐ যে বিকশিত শুভ্র কাশের বন, বিলের জলকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া মাথা নাড়িতেছে; ও-পাশের কাঁচা সোনার বর্ণের ক্ষেত, ক্বচিত কোন স্থান সবুজ, বায়ুর স্পর্শে মাঝে মাঝে সেই বিচিত্র রঙের বিস্তীর্ণ কোমল আসনখানি যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, বিলের বুকের নির্ম্মল কাঁচের মত জলে সবুজ শ্যাম পত্রদলের মাঝে মাঝে আরক্ত পদ্মের যে শোভা, উপরের দিগন্ত-বিস্তৃত উদার সুনীল আকাশের যে স্ফূর্ত্তি, এই সব দেখিয়া শ্যামলীর যেমন সুখ হইতেছিল, ঐ পাখীটাকে দেখিতে না পাওয়া গেলেও তাহার কি যেন আর একটা অনুভব করিয়া বিজলীও তেমনি সুখে উৎফুল্ল হইয়া চলিল। বিজলীর ভাবে ও ইঙ্গিতে নিজের মধ্যে কিসের একটা অভাব সহসা আজ তীব্র হইয়াই শ্যামলীর মনে উদয় হইতে লাগিল, অথচ তাহা যে কি—তাহা বুঝিবারও যে তাহার শক্তি নাই। হায়, প্রকৃতির একি বিদ্রূপ—না অভিশাপ?

তাহারা গৃহে গিয়া পৌছিতেই গৃহস্বামী অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, “ওগো শুনছ—মঙ্গলবারে বিজলীকে পাকা দেখতে আসবে বরপক্ষ থেকে। মাঝে এই তিনটে দিন মাত্র। এর মধ্যেই সম্ভব-মত উয্যুগ-টুয্যুগ করতে হবে। মনে করছি গ্রামের নিকট আপনার লোকগুলিকেও নিমন্ত্রণ করব সেদিন, বুঝলে?”

গৃহিণী নিঃশব্দে সিক্তবস্ত্রাদি শুকাইতে দিতে লাগিলেন। কর্ত্তা উৎসাহের সহিত বলিয়াই যাইতে লাগিলেন,—“তারা কিছু যখন নেবে না, তখন বিয়ের একটু ধুম ধাম তো করতে হবে,—গ্রামের সব লোককে খুঁটিয়ে ভোজ-ফলার দিতে হবে। ঈশ্বরেচ্ছায় যখন অমন পাত্রটিতে মেয়ে দিতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন সকলকেই নিয়ে একটু আনন্দ করা চাই ত! ২রা অগ্রাণই বিয়ে বুঝলে?

এখন থেকেই উয্যুগ-টুয্যুগ করতে আরম্ভ কর। গায়েহলুদ আর বাসি-বিয়ের ভোজ দুটো আর বিয়ের রাত্রের ফলারে গাঁয়ের ছোটবড় সব্বাইকে বলতে হবে।”

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “গাঁয়ের ছোটরা খেতে পারে, কিন্তু বড়রা এ বিয়ের ভোজ-ফলার কি খাবে গো?”

“খাবে না কি-রকম? সবাই খাবে—কত আহ্লাদ করে খাবে।”

“মুখে আহ্লাদ জানাবে বটে, কিন্তু মাতব্বররা কেউ খাবে না।”

“তুমি বল কি? আমার কি কুলে কোন দোষ আছে, না আমি জাতে তাদের চেয়ে ছোট, যে তারা খাবে না? দলাদলির জন্যে যদি বল, সব দলকেই আমি সমান আদর করব। তবে কেন খাবে না?”

“সব দলই বলবে, তুমি পতিত, তুমি বড় মেয়ে অদত্তা করে ঘরে রেখে ছোটর বিয়ে দিচ্ছ—তোমার ঘরে কেউ তারা খাবে না।”

কর্ত্তা বিস্ফারিত চক্ষে ক্ষণেক স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, “বটে? কারু মুখে শুনেছ নাকি এ-রকম কথা?”

গৃহিণী বেদনাবিদ্ধস্বরে বলিলেন, “শুনেছি বই কি! তাই বলছি, বেশী ঘটা করে কাজ নেই, তাতে কেবল অপমান হতে হবে।”

কর্ত্তা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, “অপমান কিসের? কারও কি অঙ্গহীন সন্তান হয় না? তাই বলে সে জাতে ঠ্যালা থাকে? তার বাড়ী কেউ খায় না?”

“তা নয়। এতদিন খেয়েছে, কিন্তু এই বিয়ের পর আর বড় কেউ খাবে না।”

“আমার অপরাধ? আমি কি শ্যামলীর বিয়ের চেষ্টা করিনি? কালা, বোবা মেয়ে কেউ নিতেও চাইবেন না—আবার জাতেও মারবেন—এ কি-রকম বিচার?”

“যাদের জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলে অঙ্গহীন সন্তান হয়, তাদের তো ঐসব কষ্টই ভোগ করতে হয় চিরকাল, তার জন্যে রাগ করে ফল নেই তো!”

"তবে কি চুপ করে সইব? এ কি ভগবানের কাজ? তিনি সে পাপের যা শাস্তি দিয়েছেন, মাথা পেতে নিয়েছি—তা বলে মানুষের এ অত্যাচার সইতে পারব না।"

"না সয়ে কি করবে? শাস্তি ভগবানই দেন—কতক নিজের হাতে, কতক মানুষের হাত দিয়ে।"

"আমি সে মানি না। এ তাদের হিংসে। বিদ্বান লক্ষপতি জামাই পাচ্ছি বিনা পয়সায়, এই হিংসেয় মরছে সব। নইলে এতদিন কি ক্রিয়াকর্ম্মে আমার বাড়ী কেউতে খায়নি?"

গৃহিণী ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "কেবল আমাদের বলে নয়—আমাদের বাপের বাড়ীর দেশেও দেখেছি একজনের একটা জড়পিণ্ড মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি বলে তার ছোট মেয়ের বিয়ে হয় না, শেষে তেমনি একটা জন্তু ধরে জড়টার বিয়ে দিয়ে ফেলে, তবে তারা অন্য মেয়ের বিয়ে দিতে পায়।"

"তোমার মেয়েরও কি আমি তেমন বিয়ে দিতে চাইনি? তাতে তুমি রাজী হয়েছ কি এতদিন? তারপরে সেই খোঁড়া ছোঁড়ার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলাম তো তার মা রাজী হ'ল না। হবে কি করে? তোমার ও মেয়েটি কি শুধু কালা বোবা? ও যে পাগল, হাবা-কালার বাড়া। ও গলগ্রহ কে ঘাড়ে করে মরবে?"

মাতা নতমুখে নিঃশব্দে রহিলেন।

কর্ত্তা বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—"নিজ হাতে খেতে জানে না, নাইতে জানে না, খিদে তেষ্টা বুঝতে জানে না, ওটা একটা জন্তু। নইলে কানা মেয়েও শুনেছি হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে আন্দাজে-আন্দাজে কত শিল্পকাজ করে। মথুর মুচির জন্মান্ধ মেয়েটা ঘরকন্নার কাজ পর্য্যন্ত করতো, আর এ তোমার কি যে মেয়ে? হাবা কালা হলেই কি অমনি বুদ্ধিহীন হয়? সাত জন্মের আমার পাপের ফল—আর কি! কিন্তু তা বলে ঐ একটার জন্যে আমি এমন পাত্র

তো হাতছাড়া করতে পারব না। ভাল মেয়েটার কপালে যদি এমন পাত্র জুটেছে তো আমায় যেমন করে হয় তা বজায় রাখ্‌তেই হবে—তাতে ওটার বরাতে যাই হোক্‌। বিয়েয় লোকজন না হয় নাই খাওয়ালাম। ভেবেছিলাম একটু আহ্লাদ করব—কপালে নেই, কোত্থেকে হবে? কিন্তু তাই বলে যে জাতে ঠেলা থাক্‌ব, ক্রিয়া-কর্ম্মে কেউ বাড়ীতে পাত পাত্‌বে না, সে সহ্য হবে না।"

গৃহিণী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবে?"

কর্ত্তা তাড়া দিয়া উঠিলেন, "তা কি এখনি ভেবে ঠিক করতে পেরেছি? দেখি ভেবে। কিন্তু বলে দিচ্ছি, যা ধরে বিয়ে দিতে চাইব তাতেই তোমায় রাজী হতে হবে, কথাটি কইতে পাবে না। তারপরে তোমার ও পাগল মেয়ে কেউ কেড়ে নেবে না সে ঠিক জেনো—তোমার আমারই ঘরে চিরদিন থাকবে, কিন্তু সেজন্যে ত আমি ভাব্‌ছি না, অ-ঘর না হয় এইটুকু মাত্র দেখতে হবে। খারাপ ঘরে যদি সম্প্রদান করি—বিজলীর পাত্রটিও হয়ত হাতছাড়া হবে। বড় ঘর আর সুন্দর মেয়ে বলেই তারা নিচ্ছে, শুনেছ ত? সেই ঘরে না ছোট হতে হয় এই যা এক মহা ভাবনা। যাক্‌, তুমি এখন পাকা দেখার ঠিক কর তো সব। আর আমিও দেখি এঁরা সব সেদিনে আমার বাড়ী ফলার খেতে আসেন কি না!"

নির্দ্দিষ্ট দিনে পাত্র পক্ষ হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কন্যা দেখিতে এবং বিবাহের দিন স্থির করিতে আসিলেন। বিজলীর পিতা তাঁহাদের পল্লীগ্রামের পক্ষে সম্ভাবাতিরিক্ত সমাদর করিলেন। গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদেরও তিনি সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ করিলেন—কিন্তু গৃহিণীর অনুমানই সত্য হইল। নিমন্ত্রিতের মধ্যে কেহবা একেবারেই পদার্পণ করিলেন না। যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারাও আহারের পূর্ব্বেই নানা অছিলায় পলায়ন করিলেন। পাছে ভাবী কুটুম্বেরা তাঁহার এই সদ্য একঘরে অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া ফেলেন, সেজন্য কর্ত্তা এবিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি মাত্র না করিয়া, গ্রামস্থ প্রধানেরাও

যে সেদিন নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাহা নবকুটুম্বদের বুঝিতে দিলেন না।

কন্যার রূপে এবং কন্যাকর্ত্তার সমাদরে বরপক্ষের সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা তখন কন্যার বিবাহের সময়েও পাছে এই ব্যাপার ঘটিয়া বিবাহে কোন বাধা উপস্থিত করে এজন্য শ্যামলীর উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কালা বোবা এবং পাগল এই ত্রিবিশেষণ-বিশিষ্টা কন্যাকে নামে মাত্র সম্প্রদানের জন্যও স্বজাতি এবং সমকুলস্থ এমন কোন পাত্রই তিনি তখন খুঁজিয়া পাইলেন না যে, তাঁহাকে জাত্যিচ্যুতি হইতে রক্ষা করে। বিজলীর বিবাহের আনন্দ তাঁহাদের ঘুরিয়া গেল। সম্ভ্রান্ত কুটুম্বদের সম্মুখে গ্রামের সমাজপতিদের দ্বারা পাছে অপমানিত হন, এই ভয়ে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

৪

বিজলীর পিতা কার্ত্তিক মাসটার একটু অন্যায় রকম শীঘ্র শীঘ্র কাবার হইয়া যাওয়ার ধরনে বড়ই চটিয়া গেলেন। কিন্তু সে যে তাঁহার অসন্তোষের কোন খাতির রাখে এমন বোধ হইল না। তাই যথানিয়মে কালের হর্ত্তাকর্ত্তা অরুণদেব দক্ষিণায়নের তুলারাশি অতিক্রম করিয়া মার্গশীর্ষে উন্নীত হইলেন। বিজলীর মাতাপিতার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সঙ্গে কন্যার বিবাহের উদ্যোগের মধ্যেই মাসের প্রথম দিন কাটিয়া বিবাহের নির্দিষ্ট দ্বিতীয় দিনেরও প্রভাত আসিয়া ক্রমে উদয় হইল।

প্রভাতের আলোকে স্বামীর মুখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দেখিয়া

বিজলীর মাতা কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীকে অত্যন্ত ভয় করিয়াই চলিতেন, সেজন্য কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, স্বামী নান্দীমুখ এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গলবস্ত্র হইয়া গ্রামস্থ সমস্ত প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া তবে ক্রিয়ায় বসিলেন। স্বামীর এই অদম্য বাসনার ফল যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিতেও তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল। সমাগত নবকুটুম্বদের সমক্ষে গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা অপমানিত হইবার এরূপ পন্থা না করিয়া তিনি যদি নিঃশব্দে বিবাহটি সম্পন্ন করিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ কন্যাদান-কার্য্যটি নির্ব্বিঘ্নে হইবার আশা ছিল। একঘরের ঘর হইতে কন্যাগ্রহণ-কালে তাহারা না জানি কি করিবে, ইহা ভাবিতেই তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিতেছিল—তথাপি কলের পুতুলের মত তিনি যাহা করিবার তাহা করিয়া যাইতেছিলেন—একবার স্বামীকে এ বিষয়ে একটু কিছু বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র তাঁহার কাছে এমন ধমক্ খাইয়াছিলেন যে, ভগবানকে স্মরণ করিয়া ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না।

শ্যামলী দেখিতেছিল, কয়েকদিন হইতে তাহাদের বাটীতে কি যেন একটা চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছে। কতরকম কাজ, কত সব জিনিসপত্রের আমদানি, সকলের মুখেই একটা আনন্দ ও আশার উচ্ছ্বাস—কিন্তু সবচেয়ে মুখখানি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভগিনীর। তাহার সেই অতুল সৌন্দর্য্যভরা মুখে যেন কে নূতন করিয়া রূপের তুলি বুলাইতেছে। শ্যামলীর রূপমুগ্ধ চক্ষু পলকহীনভাবে এক একবার ভগ্নীর মুখে সম্বদ্ধ হইতেছিল। সে মুখ কখনো লজ্জার আভাসে আরক্ত, কখনো দুঃখকল্পনায় উচ্ছ্বসিত, কখনো বা আনন্দের ভরে উষাকালের গোলাপের মত অতুলনীয়। সে মুখে তাহার চিরস্বভাবানুরূপ বিরক্তিসূচক ভঙ্গী বা ভ্রূকুটী নাই, বাপ-মায়ের কাছে সে কত আদর জানাই-তেছে, আদর পাইতেছে—তাহাকেও যে ইঙ্গিত করিতেছে তাহা যেন কত

স্নেহসিক্ত মধুভরা! কিসে বিজলীর এমন পরিবর্ত্তন আসিল, শ্যামলী যেন অবাক হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল। বিজলীর সাজসজ্জা ও নিত্যনূতন এই যে একটা আনন্দভরা চাঞ্চল্যে এবং নবীন ব্যাপারে তাহাদের বাড়ী উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া—ইহার নায়িকা যে বিজলী, বিজলীকে লইয়াই যে এত ধুমধাম চলিতেছে, তাহা শ্যামলী যেন ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছিল। তাহাকে নববস্ত্র পরাইয়া কতকগুলি রমণীতে কত আনন্দে কতরকমই যে করিতেছে! কোন দিন হরিদ্রা মাখাইতেছে, পায়সান্ন খাওয়াই-তেছে, আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তাহাই অবাক হইয়া শ্যামলী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। কোথা হইতে সেদিন নানারকম বস্ত্রালঙ্কার ও অগণ্য দ্রব্য-সম্ভার আসিল তাহাও যে বিজলীর জন্যই, তাহাও শ্যামলী বুঝিয়াছে। কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া এক-একবার সকলের পানে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিতে-ছিল, কিন্তু তাহার সে প্রশ্ন কে-ই বা বুঝিবে? কেবল বুঝিতেছিল তাহার মা। তাই শ্যামলীর চোখে তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছিলেন।

সাজিয়া-গুজিয়া সাক্ষাৎ গৌরীটির মত পুষ্পচন্দনে ভূষিত হইয়া বিজলী অঙ্গনস্থ সজ্জিত কদলীমণ্ডপের মধ্যে একখানি চিত্রিত পিঁড়ির উপর পিতার পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং পিতা কত মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া তাহার ললাটে স্পর্শ করাইতে লাগিলেন, কতরকম জিনিসে কপালে তিলক কাটিয়া দিতে লাগিলেন। অন্য কয়দিন হইতে বিজলীকে লইয়া এইরূপ নানাপ্রকারের দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া শ্যামলী ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল, এইবার পিতার পার্শ্বে বিজলীর এইরূপ সজ্জিতভাবে উপবেশন এবং তাঁহার দ্বারা সাদর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির দৃশ্য যেন তাহাকে একটু অভিভূত করিয়া ফেলিল। যেন বাপের স্নেহ হইতে ও জগতের আনন্দ হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত বলিয়া শ্যামলীর মনে হইতে লাগিল। সে শুষ্কমুখে ঈষৎ ম্লান চক্ষে ছাম্‌লাতলার একধারে একটা

কলাগাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহার রুক্ষ কেশ, শুষ্ক মুখ ও মলিন বেশে এই উজ্জ্বল দৃশ্যের পাশে সে যেন একটা বেদনার ছায়ার মতই দাঁড়াইয়াছিল। মাতার দৃষ্টি সহসা সেদিকে পড়িতেই তিনি ব্যথিত হইয়া জগতের চক্ষু হইতে এই তাঁহার অভাগা সন্তানটিকে সরাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিঃশব্দে শ্যামলীর নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত দিলেন। মায়ের স্পর্শ বুঝিয়াও শ্যামলী মুখ ফিরাইল না, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। স্পর্শের প্রশ্নেই মাতাকে জানাইল,—"এ কি মা—কেন মা? আর এ আনন্দমেলায় আমারই বা স্থান নেই কেন? আমিই বা এত দূরে কেন মা?" মাতা কন্যার স্পর্শেই প্রশ্ন বুঝিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কন্যাও ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ফিরিল।

"উহুঁ উহুঁ!" স্বামীর অস্পষ্ট নিষেধে সকচিত গৃহিণী চাহিলেন। স্বামী হস্তের ইঙ্গিতে পত্নীকে নিষেধ করিয়া আবার আরব্ধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তির জন্য ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া শেষে গৃহিণী অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "কি করবে ও এখানে থেকে? ঘরে যাক্ না।"

সজোরে আবার একটা 'উহুঁ' শব্দ করিয়া তিনি বিজলীর শুভগন্ধাধিবাস-ক্রিয়ায় মন দিলেন। গৃহিণীকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া দেখিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত—যিনি সমাজপতিদের নিষেধ ঠেলিয়া তাঁহার জাতি যাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও একার্য্য করিতে আসিয়াছেন—তিনি বলিলেন, "আহা থাক্‌না মা ও এইখানে বসে। ভগবানের মার না হলে আজ ত ওরই এই শুভকার্য্য আগে হত, তার পরে ত বিজলীর। যাই হোক, এমন দিনে ওকে অমন করে রেখেছ কেন গা? ছোটবোন্‌টি অত সেজেছে-গুজেছে, বালিকা ও, ওরও তো মনে কষ্ট হতে পারে! দে ত গা বাছা কে আছিস্, মেয়েটাকে একখানা ভাল কাপড় পরিয়ে।"

শ্যামলীর মাতা এইবার কন্যাকে প্রায় টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। ক'ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কন্যার হাতে খানকয়েক ছবি

গুঁজিয়া দিয়া তাহার মুখ ধরিয়া একটু আদর করিলেন। শ্যামলী তাঁহার আদর ও এই ছবি-দেখা ছাড়া জগতে আর কিছু তো জানিত না বা চাহিত না, কিন্তু আজ সে তাহাও তেমন সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার ভাষা-ভরা চোখ আজ নির্ব্বাকভাবে শুধু চাহিয়া র'হল। মাতা দাঁড়াইতে পারিলেন না, তখনি তাঁহাকে কর্ম্মান্তরে ছুটিতে হইল। শ্যামলী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গন্ধাধিবাস সমাধার পরে বিজলীও সেই ঘরে আসিয়া ভগিনীকে তদবস্থ দেখিয়া একটু যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাহার গায়ে-হলুদের তত্ত্বে শ্বশুরবাড়ী হইতে যত-রকমের কাপড় জামা আসিয়াছে, তাহার মধ্যের দুটি কাপড় জামা আনিয়া তাড়াতাড়ি ভগিনীকে পরাইতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিল খেলনারও কিছু অংশ শ্যামলীকে সে দিবে। বিজলী তাহাকে সর্ব্বদা বকিত বলিয়া শ্যামলীও তাহার হাত হইতে সহজে কিছু গ্রহণ করিত না—কিন্তু আজ সে ভগিনীকে বাধা দিল না। বিজলী ইঙ্গিত করিতেই উঠিয়া তাহার দত্ত বসনভূষণ পরিধান করিল এবং সাজিয়াই গম্ভীর মুখে একছুটে ছান্‌লাতলায় গিয়া বিজলীর পরিত্যক্ত পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। পুরোহিত তখন তাহার পিতার সঙ্গে মৃদুস্বরে কি কথোপকথন করিতে করিতে চাউল বস্ত্র তৈজসাদি দ্রব্যসম্ভার ঝাড়িয়া গুছাইয়া বাঁধিতেছিলেন। শ্যামলীকে ঐভাবে বসিতে দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া কেহ ছুটিয়া আসিল, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে-ছিল এবং কেহ বা একটু দুঃখসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিল। পুরোহিত বলিলেন, "আহা বসেছে ত বসুক না, দাও ত বাবা মেয়েটার কপালে একটা ফোঁটা দিয়ে, খুশী হয়ে চলে যাবে এখন।" পিতা বাক্যব্যয় না করিয়া দধি, চন্দন, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কন্যার ললাটে ছোঁয়াইয়া দিলেন। শ্যামলী এইবার হাসিমুখে উঠিয়া মায়ের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া গেল এবং মায়ের গলায় পড়িয়া তাহার তিলক ও বস্ত্রাদি দেখাইতে লাগিল। সকলের আহা আহা শব্দের মধ্যে মা আবার

তাহাকে হস্তে ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কিছু খাওয়াইয়া কতকগুলা ছবি দিয়া জানালায় বসাইয়া রাখিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে গিয়া দেখিলেন, জানালার উপরেই শ্যামলী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি ক্ষণেকের জন্য নিশ্চিন্তের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইতে তখন আর বড় দেরী নাই।

রাত্রি দশটার সময় বিবাহের লগ্ন। বিপুল বাদ্য এবং সমারোহের সহিত রাত্রির প্রথম প্রহরেই বর লইয়া বরযাত্রীর দল সমাগত হইলেন এবং বহিরাঙ্গণের চাঁদোয়ার নীচে আসর জাঁকাইয়া বসিলেন। বরের রূপ, গুণ এবং ধনের যশে তখন গ্রামখানি একেবারে নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজপতিদের স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইতে দেখিয়া কন্যার পিতা তাঁহাদের নিকটে গিয়া জোড়-হস্তে বলিলেন, "লগ্নের এখনো দেরী রয়েছে—আহারাদিগুলো সেরে নিলে হ'ত না?"

"অবশ্য অবশ্য, বরযাত্রীদের খাইয়ে দিতে হবে বই কি! যাও হে ছোক্‌রারা, তোমরা বরযাত্রীদের ভাল করে যত্ন করে খাইয়ে দাও, যেন গাঁয়ের না নিন্দে হয়। ভায়া তো যোগাড়ের কসুর করেনি, অমন জামাই বিনা-পয়সায় পাচ্ছে, খরচ করবার কথাই তো? চল, আমরাও তদারক করছি—বরযাত্রীদের খাইয়ে দিতে হবে বই কি আগেই!"

"আর আপনারা?"

"আমরা? হেঁ-হেঁ, আমরা হলাম ঘরের লোক—আমরা খেলেই বা কি, না খেলেই বা কি! সে তখন পরে যা হয় হবে, এখন বরযাত্রীদের তো—"

"আপনারা তাহলে আজও নিতান্তই খাবেন না? নিতান্তই আমায় একঘরে করবেন?"

"হেঁ-হেঁ, সে কি কথা! এখন কি ওকথা মুখে আনতে আছে? সুভালা-ভালি তোমার মেয়েটি পাত্রস্থ হয়ে যাক্‌, আমরা সে-রকম হিংসুক লোক নই যে

শুভকার্য্যে একটা বাগ্‌ড়া দেব! মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাক্‌, তারপর তুমিও আছ, আমরাও আছি, খাওয়া-না-খাওয়াও আছে।"

"বেশ! আমারও প্রতিজ্ঞা যে আপনাদের আজ পাতপেতে আমি আমার বাড়ীতে খাওয়াবই।" বলিতে বলিতে বিজলীর পিতার দুই চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। একজন যথার্থ শুভান্বেষী ব্যক্তি তাঁহাকে অন্য দিকে টানিয়া বলিলেন, "কর কি? এখন থেকে গোল তুল্লে যে বিয়ে পণ্ড হবে। বিয়েটা হয়ে যাক্‌, তারপরে ওরা খেলে-না-খেলে কি এমন বয়ে যাবে?"

"বয়ে যাবে না? তুমি রতন ভট্‌চায্যের কথা জান না কি? তাকে একঘরে করে রেখে, তার কেউ মরলে পর্য্যন্ত ফেলতে যেত না, বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হতে দিত না; শেষে ধোবানাপিত বন্ধ করে দেয়। ছেলেমেয়ের বিয়ে পর্য্যন্ত হয় না। যে তার ক্ষেত বা তার কাজে যোগ দিত তার পর্য্যন্ত জাত মারত। একঘরে হওয়া কি সোজা কথা!"

"কি করবে ভাই—এখন উপস্থিত কন্যাদায় থেকে তো খালাস পাও। সেটায় বাগ্‌ড়া না পড়ে!"

"আচ্ছা—আমিও—" অর্দ্ধস্ফুট ভাবে কি উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি একদিকে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে লগ্নকাল প্রায় অতীত হইতে চলিল, তথাপি কন্যাকর্ত্তার দেখা নাই। সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে কন্যার পিতা অন্তঃপুর হইতে আসিয়া কন্যার মাতার অত্যন্ত অসুস্থতার সংবাদ দিলেন এবং পাছে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হয় এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তিদের নিকটে জোড়হস্তে ত্রুটি স্বীকারান্তে বরকে লইয়া সম্প্রদানের স্থানে বসাইলেন। অন্তঃপুরের মধ্যে তখনো ঈষৎ কোলাহল চলিতেছে। কন্যার মাতা অধিক পরিশ্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, তাই স্ত্রী-আচার আদি কিছুই হইল না এবং কন্যার পিতার ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন ভাবের জন্য কন্যাকে কোন-রকমে সাতপাক মাত্র ঘুরাইয়া সম্প্রদানের স্থানে বসান

হইল। পুরোহিতদের "লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়" শব্দের তাগিদে শুভদৃষ্টিরও অবকাশ হইল না। বর ও কন্যা উভয়পক্ষীয় পুরোহিতই বলিলেন, "সম্প্রদানের পরে যে শুভদৃষ্টি, সেই আসল শুভদৃষ্টি—ওটা মেয়েলি আচার মাত্র।" সম্প্রদান-ক্রিয়াও তখন দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। লগ্ন শেষ হইয়া আসিল বলিয়া কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতেরও ব্যস্ততার সীমা নাই। ওদিকে গ্রামের দলপতিরা, কন্যাসম্প্রদানের পর কিপ্রকারে বরপক্ষীয় সম্ভ্রান্ত কুটুম্বদিগকেও কন্যার পিতার সঙ্গে নাকের জলে চোখের জলে করিবেন, সেই আশায় বরযাত্রীদের পরিপাটিরূপে ভোজন সমাধা করাইয়া কন্যাসম্প্রদান দেখিতে নিজেরা একে একে আসিতে লাগিলেন। গৃহিণীর সহসা মূর্চ্ছিতা হওয়ার সংবাদে তাঁহারা আরও খুশী হইয়া—"তবে ত ভারি বিভ্রাট!"—বলিয়া শেষ-মজার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

সম্প্রদান হইয়া গেল। কন্যার পিতার সমস্ত পূজার সহিত তাহার কন্যাটিও বর হস্ত পাতিয়া 'প্রতিগৃহ্লামি' বলিয়া ঈশ্বর সমাজ ধর্ম্ম এবং সমবেত লোকদের সাক্ষ্য রাখিয়া গ্রহণ করিলেন। অনিলও ইহাদের বিভ্রাটের সংবাদ শুনিতেছিল,—সেজন্য বিবাহের ছোটখাটো অনেকগুলি ত্রুটির দিকে তাহার মন ছিল না এবং সে বিষয়ে তাহার কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না। কিন্তু তাহার বিবাহিত বন্ধুবর্গ অসন্তোষ এবং মৃদু বাক্‌বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছে, "এ কি-রকম বিয়ে? এ যেন বলি উৎসর্গের মন্ত্র পড়া চল্‌ছে। না শুভদৃষ্টি, না স্ত্রী-আচার, না হাসিখুশি, এ কাণ্ডখানা কি?" শিশির এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহারই উপর সকলে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। "একি হে, এ কোন্ পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে অনিলের জন্যে কনে দেখতে এসেছিলে তুমি? এমন আঁধারে আঁধারে বিয়ে সারা তো কখনো দেখিনি!" কেহ বা বলিল, "কনে শুনেছি পরীর মত, আমাদের তো এই দেখবার সময়, কনেই দেখাও ছাই আমাদের! আর দেখবই বা কি, বাইরে অত আলো, আর বিয়ের জায়গায়ই এমন মিটমিটে প্রদীপ? এই ভূতুড়ে দেশে কিনা শেষে ভূতের মত অনিলের বিয়ে

হচ্ছে—ছ্যাঃ!"

"আলো আন, আলো আন" বলিয়া বরপক্ষীয়রা কোলাহল করায় সকলে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে উজ্জ্বল আলো আনাইয়া বিবাহমণ্ডপকে উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত করিল। বরের একজন বন্ধু পুরোহিতদের বলিলেন, "কি মশায়, আপনাদের লগ্নের কাজ তো সারা হ'ল? এইবার আমরা বরকনে নিয়ে ভাল করে মালাবদল শুভদৃষ্টি করাব। চল হে শিশির, অনিলকে নিয়ে আবার শিলের ওপর দাঁড় করাও। যে-সব আচার বাদ গেছে, তার আমোদ আমরা পুষিয়ে নেব। পিঁড়িসুদ্ধ কনে নিয়ে চল। লগ্নের দায়ে শুভদৃষ্টিটা পর্য্যন্ত ফাঁক্ গেল, আমাদের এ কি প্রাণে সয়? বল কি?" আমোদপ্রিয় বন্ধুবর্গ বর ও কন্যাকে টানিয়া তুলিবার জোগাড় করিবামাত্র বিবর্ণমুখ কম্পিতদেহ কন্যার পিতা তাহাদের সম্মুখে গিয়া জোড়হস্তে বলিলেন, "বাবাসকল, তোমরা আর একটু দেরী কর, ঘণ্টাখানেক পরেই আর-একটা লগ্ন আছে, সেই লগ্নে তোমাদের মনের মত আমোদ-আহ্লাদ করে বিয়ে হবে, আর সেই বিয়ের উপযুক্ত কনেও আমি দেব। যে-বিয়ে তোমরা দিতে এসেছ, এ সে বিয়ে নয়—সে কনেও এ নয়। এটি আমার বোবা কালা বড় মেয়ে। তার বিয়ে দিতে না পারায় গাঁয়ের মুরুব্বীরা বিজলীর বিয়ের আশীর্ব্বাদে পর্য্যন্ত আমার বাড়ীতে খান্‌নি। এখনো কুটুম্ব তোমাদের ও আমাকে একজোটে অপমান ও জাতিচ্যুত করবেন বলে প্রস্তুত হয়ে সব দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ এ কাজে আমার বাড়ীতে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি। আমি সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যই এই অভাগা জীবটাকে একবার গোটাকতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিলাম মাত্র। এর জন্য বাবা তোমরা আমায় মাপ কর, মনে কর যে এ কিছুই নয়। যে মেয়েকে দেখে ওঁরা পছন্দ করে গেছেন, সেই মেয়ের সঙ্গেই বাবাজীর আসল বিয়ে হবে, এ বিয়ে কেবল সমাজকে মুখভেঙ্গান মাত্র। রাত্রি দুটোয় যে শুভলগ্ন আছে, সেই লগ্নে আমি যথার্থ কন্যাসম্প্রদান করব।"

স্তম্ভিত বরপক্ষীয় এবং কন্যাপক্ষীয়গণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাহার পরেই বরযাত্রীদের কর্কশবাক্য কন্যাপক্ষীয়গণের বিস্মিত মৃদু কণ্ঠস্বরকে ছাপাইয়া গগন ভেদ করিয়া উঠিল—"জোচ্চোর, বদ্‌মাইস, বাটপাড়, জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? শালাদের মারো, মেরে পিষে দাও। এতবড় আস্পর্দ্ধা? সুন্দর মেয়ে দেখিয়ে কালা বোবা মেয়ে গছিয়ে দিতে এসেছে? মারো বদ্‌মাইসদের। বরপক্ষীয় যুবকবৃন্দ আস্তিন গুটাইতে লাগিল। কন্যাপক্ষীয় নিরপরাধ গ্রাম্য যুবকবৃন্দ প্রথমে হতভম্বই হইয়া ছিল, শেষে বরযাত্রীদের অপমানসূচক বাক্যে তাহারাও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—"মুখ সামলাও, ভদ্রলোকের মত কথা কও, নইলে আমরাও সহুরে লোক বলে রেয়াত করব না।" উত্তরে প্রত্যুত্তরে ভারতচন্দ্রের প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-বর্ণনার দৃশ্যের মত সমরে পশিয়া দুইদলে গালাগালির পর চতুর্থ দৃষ্টান্তের অনুসরণে "মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে" যুদ্ধাবতারণার উদ্যোগ হইল। যদিও এ বিবাহসজ্জায় অনেক 'ঘোড়া' 'গজ' এবং 'সোয়ার'ও ছিল, কিন্তু তাহারা কেহই 'পায়ে পায়ে' 'শুণ্ডে শুণ্ডে' এবং 'খর তরবারে' যুঝিতে অগ্রসর না হইয়া বন্য গ্রামের আম্রকাননের পত্র তৃণ এবং বিবাহবাড়ীর লুচিই একমনে ধ্বংস করিতেছিল। গ্রামের কর্ত্তারা বিবদমান উভয় দলের যুবকবৃন্দকে নিবৃত্ত না করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া জটলা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, "যত সব ছেলেছোকরার দল এসেছে, এর মধ্যে যদি একটা ভারিক্কি লোক থাক্‌ত, তাহলে কি এই-রকমে চোখে ধুলো দিতে পারত? নে এখন মজা ছাখ্, কিন্তু কি ফিচেল—অ্যাঁ! আমাদের পর্য্যন্ত চোখে ধুলো? নে, এখন এ মেয়ে নিয়ে কি করে জাত বাঁচে, তা ছাখ্! ছোঁড়ারা যে রেগেছে,

আর বিয়ে না হতে দিলেই ঠিক এর শাস্তিটা হয়ে যায়।”

কন্যাকর্ত্তার ক্ষীণস্বর যুবকবৃন্দের তর্জ্জন-গর্জ্জনে কোথায় ডুবিয়া গেল। তিনি যুদ্ধোন্মুখ উভয় দলের মধ্যে গিয়া পড়িয়া বরপক্ষীয়দের নিবৃত্ত করিতে বৃথা চেষ্টা পাইতে ছিলেন, কিন্তু কে তাঁহার কথা শোনে? ছাদ্‌লার মধ্যে বরাসনে বর তখনো স্তব্ধ নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া বসিয়া আছে, কন্যার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে। সেও একদৃষ্টে জমায়েৎ যুবকমণ্ডলীর রোষদিগ্ধ ভাবভঙ্গী দেখিতেছিল। সহসা দেখিল, তাহার পিতাকে কয়েকজন লোক ধাক্কা দিয়া এক পাশে সরাইয়া দিল। তিনি আবার জোড়হস্তে তাহাদের নিকটে গিয়া কি যেন ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা এবার ঘোরতর মুখভঙ্গীর সহিত তাঁহার স্কন্ধে হাত দিবামাত্র চকিতে শ্যামলী কন্যাসন হইতে উঠিয়া পড়িল। ছুটিয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইতে গেল, কিন্তু পশ্চাতে টান্ পড়ায় অগ্রসর হইতে না পারিয়া চাহিয়া দেখিল, বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে তাহার আঁচল বাঁধা। টানাটানি করিয়া আঁচল খুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে শ্যামলী অনুভব করিল, তাহার আঁচলে আর টান নাই, ইচ্ছা করিলেই সে বুঝি ছুটিতে পারে। অমনি শ্যামলী দ্রুতপদে অপমানিত উদ্‌ভ্রান্ত পিতার নিকটে গিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার ব্যথিত আর্ত্ত চক্ষু যেন সেই স্পর্শের দ্বারাই বলিতেছিল, “বাবা, বাবা, কেন তোমায় এমন করছে সবাই? কি করেছ তুমি ওদের? সরে এস, পালিয়ে এস ওদের কাছ থেকে।”

পিতা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পরেই সবেগে কন্যাকে এক ধারে ঠেলিয়া দিলেন—“সরে যা হতভাগি, সরে যা আপদ্, তুই কেন আবার এখানেও মরতে এলি, সর্।” বলার সঙ্গে-সঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন, সেই হতভাগীর অঞ্চলে অঞ্চলবদ্ধ স্কন্দপ্রতিমকান্তি যুবক অনিল, কোমল করুণ দৃষ্টিতে তাহাদের পিতাপুত্রীকে দেখিতেছে। যুবকের দৃষ্টি দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত

স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া শ্যামলীর পিতা উচ্চ স্বরে প্রায় কাঁদিয়া ডাকিলেন, "বাবা অনিল!" সেই দৃষ্টি যেন তাঁহাকে দেবতার মত বরাভয় দিতেই অগ্রসর হইয়াছিল।

অনিল তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বিবদমান উভয় দলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। স্বপক্ষীয় যুবকদের পানে চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "কি করছ তোমরা? পাগল হয়েছ?"

"পাগল হব না? এমন অপমানে কে না পাগল হয়? পাড়াগেঁয়েদের এতবড় বদ্‌মাইসি, আমাদের ওপরও এমন চাল চালা? আজ ব্যাটাদের তুলো ধুনে দেব, তবে ছাড়ব।"

"এস না, কারা কাদের তুলো ধোনে, দেখা যাক্! কত তেল-ঘি গায়ে আছে দেখি।"

উভয় পক্ষের এই উত্তরে এইবার বিরক্তি-তীব্রস্বরে অনিল বলিল, "থাম দেখি এইবার তোমরা। যথেষ্ট হয়েছে।"

বরযাত্রী যুবকেরা এইবার অবাক হইয়া যেন অনিলের পানে চাহিল। অনিলেরই মাথার ঠিক আছে কি না, তাহাই তাহারা যেন একযোগে ঠিক করিতে বিব্রত হইয়া পড়িল। একজন বলিয়াও ফেলিল, "বল কি অনিল? তোমারও মাথার ঠিক নেই দেখছি! তোমার এতবড় অপমান—"

বাধা দিয়া অনিল ডাকিল, "শিশির—শিশির, কি করছ—তুমিও ক্ষেপেছ না কি এদের সঙ্গে?"

একধার হইতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শিশির আসিয়া বরের নিকট দাঁড়াইল।

অনিল কন্যাযাত্রী যুবকদের পানে চাহিয়া বলিল, "আপনারা এঁদের অশিষ্টতা মাপ করুন, আমি এঁদের হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

অমনি তাহার দলের কয়েকজন যুবক রুদ্ধ রোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কি? অপমানিত হলাম আমরা, আবার আমরাই মাপ চাইব? অনিল তুমি—"

শান্তস্বরে অনিল বলিল, "হ্যাঁ আমরাই মাপ চাইব। আমরাই আগে অভদ্রের মতন ব্যবহার করেছি।"

"বটে? আর এই জাল বিয়ে দেওয়া? সুন্দর মেয়ে দেখিয়ে কালা বোবা—"

"চুপ কর তোমরা। আমি বলছি আমার কোন অপমান হয়নি। তোমরা কেন মিছে দাঙ্গা বাধাচ্ছ?"

যুবকবৃন্দ হতবুদ্ধি হইয়া স্তব্ধ নির্ব্বাক ভাবে এইবার অনিলের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কন্যাপক্ষীয়রাও একটু লজ্জিত বিনীত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। কন্যাকর্ত্তা এইবার জোড়হস্তে উভয় দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "দোষ আপনাদের কারই নয়, দোষ একা আমার। কিন্তু আমার অবস্থা বুঝে দয়া করে আপনারা মাপ করুন। দুটোর সময় আর একটা লগ্ন আছে, অনুগ্রহ করে আপনারা একটু স্থির হয়ে বসুন, আমি বাবাজীর শুভ বিবাহের এইবার যথার্থ উদ্যোগ করি। যে-মেয়ে আপনাদের দেখানো হয়েছে, সেই মেয়েই এনে বাবাজীর হাতে সমর্পণ করব। বলেন তো মেয়ে এনে দেখাই। অনুপায়ে আমার এই অশিষ্টতাটুকু মাপ করে আপনারা সেই শুভ বিবাহে যোগ দিন। এ বিয়ে বিয়েই নয়, এই কথাই আপনারা মনে করুন।" বলিতে বলিতে শ্যামলীর পিতা অগ্রসর হইয়া বিমূঢ়া কন্যার অঞ্চলগ্রন্থি হইতে অনিলের উত্তরীয় মুক্ত করিতে উদ্যত হইবামাত্র অনিল বাধা দিল—"কি করেন? আপনি ও-কি করছেন আবার?"

"বাবা, বলছি তো, তোমার এখনো তো শুভ বিবাহ হয়নি।"

"আপনি বলছেন কি? এইমাত্র আপনার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন না কি?"

"ওকি তোমার উপযুক্ত মেয়ে বাবা?"

"তা যাই হোক— কন্যা সম্প্রদান তো আপনি করেছেন, এতে তো কোন ভুল নেই। আর আমিও ওকেই বিবাহের মন্ত্র পড়েই গ্রহণও করেছি তো।—"

আবার অজ্ঞাত একটা বিপদের আভাসে সচকিত হইয়া উঠিয়া কন্যাকর্ত্তা বলিলেন—"না বাবা, এ সে-রকম সম্প্রদান বা গ্রহণ নয়। এ মেয়ে আমার ঘরেই থাকবে। তোমায় আমি—"

"কিন্তু দেখুন, আপনার মনে যাই থাক্, আপনি ত আমায় ঠিক সম্প্রদানের মন্ত্র পড়েই কন্যা দান করেছেন, আমিও বিবাহের মন্ত্র পড়ে একেই বিবাহ করেছি। একে নয় বল্লে তো চলতে পারে না!"

"আমায় অভয় দিয়ে আবার একি কথা বলছ বাবা? তবে কি আমার মেয়েকে গ্রহণ করবে না?"

"করেছি তো। এটিও তো আপনার মেয়ে!"

অনিল একবার অবগুণ্ঠনমুক্তা পার্শ্ববর্ত্তিনী নিস্তব্ধ জগতের প্রাণীটির পানে চাহিয়া চক্ষু নামাইল। শ্যামলীর পিতা এইবার ব্যথিত কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মেয়ে বটে, কিন্তু ও-কি তোমায় সম্প্রদান করবার উপযুক্ত মেয়ে? যেটি উপযুক্ত, সেইটির জন্যই যে তোমায় সাধনা করে এনেছি। আমার অপরাধ যদি ক্ষমা করে থাক, তাহলে বিজলীকে তোমায় সম্প্রদান করতে দাও। আমার সে আশায় নিরাশ করো না।"

অনিল বিনীত কণ্ঠে বলিল, "আপনি অন্যরকম কেন ভাবছেন? একজনকে দুই কন্যা সমর্পণ, সেটা কি ঠিক? আপনি তো বাপ, আপনি ভেবে দেখুন দেখি!"

"এ সে-রকম মেয়ে হলে আমি বাপ হয়ে একাজ কি করতে পারতাম? এ-যে কালা বোবা পাগল বুদ্ধিহীন জড়, এর কথা তুমি অতখানি ভাবছ? তোমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক হ'ল, কি বৃত্তান্ত, ও-যে কিছুই বুঝতে পারবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে বিজলীকে বিয়ে করে তাকেই ঘরে নিয়ে যাও,—ওর কথা তুমি আর মনে এনো না। ও একটা জড় মাত্র।"

অনিল স্তব্ধভাবে আবার একবার সেই অনির্দ্দিষ্ট-দৃষ্টি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ সজীব

প্রস্তরপ্রতিমার পানে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠেই যেন বলিয়া ফেলিল, "জড় ? না না, আপনি ভুল বলছেন।" পিতার বিপদ-সম্ভাবনায় শ্যামলীর ব্যাকুল ভাব অনিলের মনে তখনো উজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে।

"না বাবা, ভুল নয়। তুমি দুদিন পরীক্ষা করলেই—যাক্ একথা। এখন অনুমতি কর, আমি বিজলীকে তোমায় সম্প্রদান করি।"

"লগ্ন প্রায় হয়ে এল, আর দেরী করা নয়,"—কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত হাঁকিলেন।

বরযাত্রী কন্যাযাত্রী উভয় দলই স্তব্ধ কৌতূহলে বরের মুখের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অত কলরব নিমেষে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া অনিল উত্তর দিল, "আর হয় না। আপনার ছোট কন্যাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করবেন।"

শিশির এইবার অনিলের নিকটস্থ হইয়া তাহার কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিল, "ওকি অনিল ? না না, একি তোমার বিয়ে নাকি ? একটা হাবাকালার সঙ্গে ? তোমার মা কি বলবেন বল দেখি ? এই মেয়েটিকে যে তাঁর বড় পছন্দ। এ একটা ছেলেখেলার মতই হয়ে গেল ভাব না। এরপর তো ভাল মেয়ে বিয়ে করতেই হবে, এটিকে কেন ছাড়ছ ? রাজী হও, বুঝেছ ?"

অনিল উত্তর দিল না, কেবল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল মাত্র। তাহার অপমানিত বন্ধুবর্গও এইবার যেন এই অপমান-সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইল। সত্যই তো, আবার এই জালিয়াতের কন্যা গ্রহণ ? কেন ? কত সুন্দর মেয়ে অনিলের জুটিবে। ইহাদের ঘরে আর একাজ না করাই অনিলের কর্ত্তব্য। সকলে একবাক্যে শিশিরের মতে মত দিয়া সঝঙ্কারে এ সম্বন্ধে যাহার যাহা খুশী মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

"কি বাবা অনিল, নিতান্তই আমার মেয়েটিকে পায়ে স্থান দেবে না ?"

"আপনি তো কন্যা সম্প্রদান করেছেন। একজনকে দুবার দু'কন্যা সম্প্রদান হতে পারে না।"

"তাই বা কেন হবে না? আমাদের সমাজে তাও তো আকছার চলে।"

"চলে চলুক। আমি তার পক্ষপাতী নই।"

"তবে কি নিতান্তই আমায় সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হবে বাবা? যার জন্যে একাজ করলাম, তাই-ই আবার আমার কপালে ঘট্‌বে? তোমার মত জামাই পেয়েও আমার সে ফের ঘুচ্‌ল না?"

"কেন, আপনার বড় মেয়ের বিয়ে তো হয়ে গেছে, আবার জাতিচ্যুত কেন হবেন?"

"ছোট মেয়েরও যে আজ অধিবাস হয়েছে, বিয়ের সাজে সজ্জিতা মেয়ের যদি আজ বিয়ে না হয়, তাহলে আমার জাত কি করে থাকবে বাবা? এই রাত্রে আমি পাত্র কোথায় পাব?"

অনিল চিন্তিত হইয়া মাথা নামাইল। শিশির আবার তাহার কর্ণের নিকটে ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ছবিখানির কথা একবার মনে কর হে, রাজী হও, রাজী হও।"

ইহার পূর্ব্বের ব্যাপার শ্যামলী যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল—তাহার বাপের কোন বিপদ হইয়াছে, সকলে তাহার বাপকে অপমান করিতেছে; কিন্তু এখনকার কাণ্ড আর তাহার মাথায় প্রবেশ করিতেছিল না। সকলে এমন করিয়া তাল পাকাইয়া যে উহার পানে চাহিয়াই বা আছে কেন, আর মাঝে মাঝে ঠোঁটই বা নাড়িতেছে কেন? ঠোঁট তো সকলেই নাড়ে, তা নাড়ুক, কিন্তু তাহার বাবা এখনো অমন হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কেন? সে আবার পিতার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কি যেন প্রশ্ন করিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পিতা বিরক্ত-ইঙ্গিতে কেবল তাহাকে শীঘ্র ঘরে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন মাত্র। এই এত জনসংঘের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের অদ্ভুতভাবের

দৃষ্টিপাতে শ্যামলীও শ্রান্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তাই বিনা আপত্তিতে সে নিজের অঞ্চল বরের অঞ্চল হইতে এইবার খুলিয়া লইয়াই গৃহের পানে চলিয়া গেল। কেহ তাহাকে নিবারণও করিল না, সেও যেন তাহাদের সঙ্গ আর সহিতে পারিতেছিল না। দর্শকগণ শ্যামলীর এই ব্যবহারে মনে মনে হাসিয়া দৃষ্টির দ্বারা যেন অনিলকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিল, তোমার ভাগ্যে কি মিলিয়াছে ছাখো, কাহার জন্য তুমি এতখানি ভাবিতেছ! এ যে একটি জানোয়ার মাত্র! কিন্তু অনিলের যেন মনে হইল, তাহার নবপরিণীতা পত্নী স্বামীর দায়িত্ব হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়া বলিয়া গেল, "আমি তোমায় মুক্তি দিলাম, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই নাই। আমি এক জগতের জীব—তুমি আর-এক জগতের। তোমায় আমায় কোন সম্বন্ধে কেহই বাঁধিয়া দিতে পারে না। মানুষের বাঁধা গ্রন্থি এই আমি খুলিয়া দিলাম—তোমার আর ভয় নাই। তুমি যাহা ইচ্ছা এখন করিতে পার।"

শিশির বলিল, "অনিল কি ঠিক করলে?"

"ভগবান যা বিধান করলেন তাই ভাই।"

"তাহলে সত্যই আর বিয়ে করবে না?"

"না। কিন্তু ব্রাহ্মণের জাতও রাখতে হবে। বিশেষ উনি এখন আমাদের আত্মীয়।"

"তোমার শ্বশুরের? আর জ্বালিও না। মা যে মাথামুড় খুঁড়বেন। তাই আমি ভাবছি অনিল, ভাল মেয়েটিকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে একথা তাঁকে না বল্লেও চলত, বললেও গায়ে লাগত না।"

"যাক্, সে সব ভাবনা পরে। এখন উপস্থিত ওঁদের জাত বাঁচাতে হবে আমাদের।"

"কি করব আবার আমরা ওঁর?"

"তোমাকেই বিজলীকে বিয়ে করতে হবে। অমন সুন্দর মেয়েটি তাহলে

আমাদেরই ঘরে যাবে।”

“আমি? সে কি অনিল, তুমি ক্ষেপেছ? তোমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা, তাকে আমি—”

“তাতে কি হয়েছে? ভগবানের অচিন্ত্য ঘটনা ঘটাবার যে কত শক্তি তা তো দেখছ। তুমিও না হয় বরযাত্রী এসে বিয়ে করে যাবে।...আপনি উঠুন। এই শিশির সম্পর্কে আমার একরকম ভাই—বন্ধুত্বে ভাইয়ের চেয়েও বেশী, এও এম-এ পাশ, কুলশীল যতদূর ভাল হতে হয়। আমায় যদি সচ্চরিত্র ভেবে কন্যাদান করতে পারেন, শিশির তার চেয়েও সচ্চরিত্র। এঁরই হাতে আপনার ছোট কন্যাটিকে সম্প্রদান করুন। আমি বলছি, আপনার সে মেয়ে যেমন শুনেছি, তারই উপযুক্ত এ পাত্র।”

শিশির দুই-চারিবার বাধা দিতে গেল, কিন্তু অনিল নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া বিবাহের আসনে বসাইয়া দিয়া তাহাকে শীঘ্রই নীরব করিয়া দিল।

৬

চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিজলীর পিতা শিশিরের হস্তে বিজলীকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার জাতিও রক্ষা পাইল। প্রভাতের অব্যবহিত পূর্বে গ্রামস্থ প্রবীণেরা গাণ্ডেপিণ্ডে ঠাসিয়া তাঁহার বাড়ীতে ভোজন করিলেন এবং নানারকম আমোদজনক কথায় তাঁহার মনোরঞ্জনেরও চেষ্টা পাইলেন, “আরে, আমাদের কপালে নাকি আজ বিধাতাপুরুষ এই ফলার মাপিয়েছেন, কার সাধ্য তা রোধ করে? ভায়া, তোমার ঘাড়ে আজ তিনিই চেপে এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে আমাদের

খাওয়ালেন তবে ছাড়লেন। তোমার খুব ভালই হ'ল হে ভায়া, দুটি জামাই-ই তুল্যমূল্য, তবে বড় বাবাজী জমিদারের ছেলে এই যা! উনি কি আর আমাদের শ্যামলীকে নিয়ে ঘর করবেন? উনি অবিশ্যি কাল বাড়ী গিয়েই আবার চতুর্দ্দোলে চড়বেন। যাক্, তবু তো তোমার জামাই হতে হয়েছে—এই তোমার ভাগ্যি। উনি কি আর বিজলীকে বিয়ে করতে পারেন? অমন ছেলে কি মেলে? তোমার হয়েছিল বামন হয়ে চাঁদে হাত! তা যা হ'ল বেশ হ'ল, এখন আমোদ-আহ্লাদ কর এই রাতটা অন্ততঃ জামাই দুটি নিয়ে। কাল বিজলী শ্বশুরবাড়ী যাবে—শ্যামলী আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে, তার জন্যে আর কি!" ইত্যাদি। কন্যাদের পিতা নীরবে তাঁহাদের ভোজন সমাধ করাইয়া একটা কক্ষে গিয়া খিল বন্ধ করিলেন। হায় জাতিরক্ষার আনন্দ আজ তাঁহার কোথায়?

পরদিন বরকন্যা বিদায়। অনিল শিশিরের পিতা-মাতাকে টেলিগ্রাম করিয়া কতক ব্যাপার জানাইল এবং নিজের বিবাহসজ্জায় তাহাদের সজ্জিত করিয়া কয়েকজন বন্ধুর সহিত সস্ত্রীক শিশিরকে তাহার নিজগৃহে পাঠাইবার উদ্যোগ করিল। নিজের মাতার আঘাতের কথা ভাবিয়া শিশিরকে নববধূসহ প্রথমে নিজের বাড়ী লইয়া যাওয়া অনিল যুক্তিযুক্ত মনে করিল না এবং শিশিরও রাজী হইল না।

বিবাহের পরদিনের যথাকর্ত্তব্য সমাপনান্তে আহারাদির পর বরপক্ষীয়গণ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। অন্যতর কার্য্যে বাটীর কাহারো উৎসাহ ছিল না, এতগুলি লোকের চেষ্টাতেও যেন সব কাজই শ্রীভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল। গৃহের উপর দিয়া যেন গতরাত্রিতে একটা অকল্যাণের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, মঙ্গলচিহ্নসকল যেন অমঙ্গলের মতই সকলের মনের উপর একটা শোকস্মৃতি আনিয়া দিতেছিল। কন্যাদের পিতা কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদানের পর সেই যে গিয়া শয্যাগত হইয়াছেন আর উঠেন নাই। কিন্তু পাড়ার মাতব্বরেরা সমবেত হইয়া

সেদিনের ব্যাপার একরূপ সারিয়া তুলিলেন। অনিলের কাণ্ডে তাহার স্বজন ও বন্ধুবর্গের যেন বাঙ্‌নিষ্পত্তিরও ক্ষমতা ছিল না। অনিল যদি শিশিরের সঙ্গে বিজলীর বিবাহ না দিয়া এবং নিজেও তাহাকে গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলেই এ ব্যাপারের একটা যাহোক কিছু প্রতিশোধ হইত। এ অনিল করিল কি? নিজে না হয় এর পর অন্যত্র বিবাহ করিবে, কিন্তু শিশিরের সঙ্গে ইহাদের কন্যার বিবাহ দিয়া অনিল যে ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধও স্বীকার করিল! শিশির যে তাহার ভ্রাতার মতই তাহা সকলেই জানিত। তাই অনিলের এতখানি ঔদার্য্যকে তাহারা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না, এমন কি শিশিরের উপরও তাহাদের রাগের সীমা ছিল না। কিন্তু অনিলের ভয়ে কেহ কিছু প্রকাশও করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও আবার শিশিরের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুতও হইতে হইল।

মাতব্বরেরা কন্যাকর্ত্তাকে কোন রকমেই এতক্ষণ দ্বার খোলাইতে পারেন নাই, আবার গিয়া বৃথা ডাকাডাকি করিলেন—"বলি কি হে, এইবার যে জামাই-বাবাজীরা চল্লেন। এখনো কি গিয়ে তাঁদের পায়ে হাতে ধরে অন্ততঃ ছোট মেয়েটাকেও গছিয়ে দেবে না? সেটাও কি ঘাড়ে থাকবে তোমার চির-কাল? যাহোক মেয়ের বিয়ে দিলে কিন্তু। বরযাত্রীদের আজ একটা সম্মানও করলে না অত কাণ্ডর পরে, তাদের যে করে হাতে পায়ে ধরে আমরা খাইয়েছি, তা আমরাই জানি। বেরিয়ে দ্যাখো একবার, কুটুম্বদের ভোজেরই কি, আর বাবাজীদের কুশণ্ডিকারই বা কি, এতটুকু অঙ্গহানি আমরা হতে দিই নি। সে যাহোক একরকম চুকে গেছে। এখন জামাইদের বিদায় দেবার সময়েও দুটো হাত জোড় করে ছোট মেয়েটার একটু উপায় কর। আমরা অনেক করে বলায় বিজলীকে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন বটে, কিন্তু দুই জামাই-ই আবার বিয়ে করলো বলে, এ জেনে রাখ।"

কন্যাকর্ত্তা নিঃশব্দেই রহিলেন।

অনিল আসিয়া যখন দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল, "আপনি বেরিয়ে আসুন —আমরা এইবার যাব—আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।" তখন বিজলীর পিতা রুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে গৃহমধ্য হইতেই উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 'বাবা অনিল' ছাড়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর কোন শব্দই বাহির হইল না।

অনিল দ্বারে আঘাত করিয়া আবার বলিল, "দোর খুলুন।"

অগত্যা দ্বার খুলিয়া কর্ত্তা একপাশে দাঁড়াইলেন। অপরাধের ভয়ে তিনি আর জামাতার দিকে চাহিতেও পারিতেছিলেন না। অনিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আপনি কেন অত শোকাকুল হচ্ছেন? এসব ভগবানের হাতের কাজ, এতে মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই। আপনার ছোটকন্যা অপাত্রে পড়েনি, ক্রমে জানবেন শিশিরের মত পাত্র জগতে খুব সুলভ নয়। আপনার কন্যা চির-সুখিনী হবে।"

"বাবা, শিশির যেমনই হোক্—বিজলী যত সুখীই হোক, তোমায় যে আমি পেয়েও হারালাম, ছার জাতের ভয়ে তোমার মত সন্তানকে যে আপনার করতে পেলাম না—এ ক্ষতি কি " শোকে কর্ত্তার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অনিল একটু থামিয়া বিনীত ভাবে বলিল, "এও আপনি ভুল বুঝছেন। আমি তো আপনাদের সঙ্গে এই নতুন সম্বন্ধ অস্বীকার করছি না।"

"বাবা, তুমি দেবতা, তা কালই বুঝেছি। কিন্তু তোমার মহত্বে তুমি নিজে যাই বল আমি কোন্ প্রাণে এ সম্বন্ধ স্বীকার করব অনিল? আমার ঐ ত মেয়ে! তার স্বামী বলে, আমার জামাই বলে, কোন্ মুখে তোমায় চাইতে পারব? লোকে যা বলবে সে কথা দূরে থাক্, আমার মনই যে আমায় পুড়িয়ে মারছে বাবা। যদি বিজলীকে নিতে, তবুও বুঝি সান্ত্বনা পেতাম কিছু—"

"আপনি বুঝে দেখুন, সে কাজ একেবারেই ভাল হ'ত না। আপনার বড় মেয়েকে জড় বলছেন, কিন্তু আমি যদি ওদের দুই বোনকেই বিয়ে করতাম, তাহলে কে বলতে পারে যে, সে তার ভগিনীর সঙ্গে ও আমার সঙ্গে তার কি

সম্বন্ধ, তা কখনই বুঝতে পারত না বা সেজন্য কোন তাপও অনুভব করত না! আপনার একটি সন্তানের সৌভাগ্যে আর-একটি নিজেকে তার অধিকারী জেনেও যে বঞ্চিত থাকত—তার অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই আর-এক দুর্ভাগ্য যে তার চোখের ওপর সর্ব্বদা জ্বল্‌জ্বল্ করত, সেটা কি ঠিক হত? ভেবে দেখুন।"

কর্ত্তা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুমি দেবতা, তাই দেবতার মতই বিচার করেছ বাবা—কিন্তু বাপ হয়েও আমি একথা একবার ভাবতে পারিনি, পারলে বুঝি এ কাজ করতে যেতাম না। যাক্, আমার কাজের শাস্তি আমিও পেলাম। এখন এ ঘটনা তুমি মন থেকে শীগ্‌গিরই মুছে ফেলো, ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কোরো—সুখী হয়ো, এই আমার তোমায় আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।"

"শিশিরদের আশীর্ব্বাদ করবেন চলুন।"

দ্বিতীয় কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া দেখিলেন, শ্যামলীও ভগিনীর নিকটে পট্টবস্ত্র পরিয়া বসিয়া আছে—তাহারও ললাটে সিন্দুরচিহ্ন, ভগিনীর দেখাদেখি সেও মস্তকে কাপড় দিয়াছে। তিনি অনিলকে নিকটে দেখিয়া আর কোন বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না বা কোন প্রশ্নও অনিলকে করিলেন না, কেবল সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শিশির ও বিজলীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

একজন রমণী আসিয়া সসঙ্কোচে অনিলকে ডাকিল,—"আপনার শাশুড়ী আপনাকে ডাকছেন।"

অনিল বুঝিল—এখানের কেহই তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বিবাহ, তথাপি শিশিরকে যেন সকলে তাহার চেয়ে সম্ভ্রম কম করিতেছে; রমণীরা শিশিরকে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতেছে, ক্বচিৎ কেহবা একটু একটু ঠাট্টা তামাসাও করিতেছে এবং ইহার পরে যে শিশিরের নিকটে নিজেদের প্রাপ্য সমস্তই একে একে আদায় করিবে,

তাহার জন্য শাসাইয়াও রাখিতেছে—কিন্তু তাহার নিকটে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। যদি বা বিশেষ প্রয়োজনে বয়স্থরা কেহ কিছু বলিতেছেন, তাহাও অতি সম্ভ্রমে, অতি ভয়ে ভয়ে। যেন কোন একটা মহৎ ব্যক্তিকে বিষম একটা ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, সেই অপরাধে এখানের প্রত্যেক প্রাণীটি তাহার নিকটে নতশির।

যে রমণী অনিলকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে অনিল একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—মলিনবসনা একজন রমণী যেন ছায়ার সঙ্গেই মিশাইয়া সেই গৃহকোণে বসিয়া আছেন। অনিল তাঁহাকে প্রণাম করিতেই সে রমণী অঞ্চল লইয়া মুখে চাপা দিলেন এবং তাঁহার ক্ষীণ শরীর অত্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অনিল নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরে তিনি যেন অতি কষ্টে সম্বৃতা হইয়া কয়েকবারের চেষ্টায় কেবল উচ্চারণ করিলেন, "শ্যামলীকে সেখানে নিয়ে যেও না—"

অনিলও এই সংক্ষিপ্তভাষিণী সংযতবেদনা জননীর আদেশের উপরে অধিক কিছু বলিতে সাহস করিল না, কেবল মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি জানেন, সেখানে মা আছেন। আমার জীবনের সব ব্যাপারই তাঁর পায়ে পৌঁছে দিতে আমি বাধ্য।"

শ্যামলীর মাতা এইবার আর-একটু সবল স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর জন্যই আমি বারণ করছি। তুমি আমাদের হাতে এ অপমান সয়েছ, কিন্তু তোমার মা সইতে পারবেন না।"

"ভগবানের হাতের বিধান মানুষকে সইতেই হবে। একেবারে না পারে, মানুষ ক্রমে ক্রমে তাকে সয়।"

এইবারে ঈষৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে শ্যামলীর মাতা বলিলেন, "ভগবানের হাতের বিধান আমরা সয়েছি, কিন্তু তোমার মা এই মানুষের হাতের বিধান কখনই সইতে পারবেন না বাবা, এ যে কেউই সইতে পারে না।"

"সবই ভগবানের কাজ মা, মানুষ উপলক্ষ মাত্র।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্যামলীর মাতা বলিলেন, "তবু তাঁর চোখের ওপরে এখনি ওকে নিয়ে যেও না, তিনি বড় আঘাত পাবেন। আর ও-ও—হয়ত···, ওকে আমার কাছই ফেলে যাও বাবা।" বলিতে বলিতে রুদ্ধ বেদনায় তিনি আবার কাঁপিয়া উঠিলেন।

অনিল এইবার নানা ব্যথা এবং লজ্জায় কম্পিতা এই মহিলার কথায় বেদনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অভাগা সন্তানের জন্য শঙ্কার যে চিহ্ন প্রকাশ পাইতে দেখিল, অপরিচিত স্থানের শত আঘাত-সংঘাতের মধ্যে তাঁহার দুর্ভাগ্য কন্যাটিকে পাঠাইতে সঙ্কোচের সঙ্গে যে আশঙ্কার বেদনাও তাঁহার মুখে চক্ষে ফুটিয়া উঠিতে দেখিল, তাহাতে সে অপ্রীত হইল না। দৃঢ়কণ্ঠে তখন সে বলিল, "আপনি নিষেধ করবেন না। মা আঘাত পাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই সময়েই তাঁকে একেবারে সইয়েও নিতে হবে। আর অন্য আশঙ্কাও আপনি বেশী করবেন না, আমি ওকে দেখব।"

শ্যামলীর মাতা আর যেন তাঁহার মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না—উচ্ছ্বসিত অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে, "বাবা, কি বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করব—" এইটুকু মাত্র উচ্চারণ করিয়া অম্‌নি তখনি থামিয়া গেলেন। নিজের কাছেই নিজেকে যেন তাঁহার অত্যন্ত অপরাধী ও স্বার্থপর বলিয়া মনে হইল। একটু পরে স্থিরভাবে আবার বলিলেন, "তোমার মত ছেলেকে বারে বারে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই, কিন্তু বাবা, আমার একটি অনুরোধ—এই হতভাগাদের জন্যে যেন তোমার সোনার জীবনে অশান্তি এনো না। মার অবাধ্য হয়ো না—তিনি যা বলবেন তাই কোরো। আমাদের জন্যে যা তুমি করলে, এ সাধারণ মানুষে পারে না। বিজলীকেও উপযুক্ত পাত্রে দিলে, আমাদের জাতকুল বাঁচালে। সবচেয়ে বড়, আমাদের ঐ হতভাগাটার জন্যেও তোমার করুণার শেষ দেখছি না! কিন্তু বাবা, এর চেয়েও অমানুষিক আর কিছু কোরো

না—তাতে আমরাও সুখী হব না। মাকে একবার দেখাতে চাচ্ছ, কি দেখাবে বাবা? না নিয়ে গেলেই সব দিকে ভাল করতে, এখনো বুঝে ছাখো।"

অনিল এ কথায় যে সম্মতি দিল না, অনিলের অটল ভাবে তাহা বুঝিয়া অগত্যা শ্যামলীর মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে নিয়েই যাও, কিন্তু এর পরে আমার কাছেই দিয়ে যেও ওকে। তোমরাও ওর জন্যে কষ্ট না পাও, ও-ও যেন—" বলিতে বলিতে আবার তিনি থামিলেন।

অনিল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। শ্যামলীর মাতা আবার গৃহকোণে লুকাইয়া পড়িলেন। বিধাতা যদি শ্যামলীর ভাগ্যে এমন স্বামীই লিখিয়াছিলেন, তবে তাহাকে অমন করিলেন কেন? সেই দুর্ভাগ্য মাতা-কন্যার অদৃষ্টে এমন রত্নেরই বা কেন সংযোগ হইল? যা তাহাদের ভোগের নয়, তেমন জিনিস দেখাইয়া ভগবান কেন তাহাদের এই দুরদৃষ্টের উপর দ্বিগুণ বিড়ম্বিত করিলেন? অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! একি নিদারুণ ব্যঙ্গ! কি দুর্ল্লভ স্বামীই যে বিধাতা তাকে দিয়েছেন, একি শ্যামলীর বুঝিবারও ক্ষমতা আছে? হায়, শ্যামলীর পিতা এমন কাজ কেন করিলেন? নিজের অভাগা সন্তানের চেয়েও, আজ বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, দয়ায় ও শৌর্য্যে মণ্ডিত অনুপম সুন্দর আর-একখানি মুখ শ্যামলীর মাতার বক্ষ জুড়িয়া বসিয়াছে। সে মুখের দিকে চাহিয়া তিনি যে আজ নিজের হতভাগ্য সন্তানের দুঃখ ভুলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু সে মুখখানিকে 'আমার সন্তান' বলিয়া মনের বক্ষে লইবারও যে তাঁহার সাধ্য নাই। সে মুখ তো তাঁহাদের স্পর্শক্ষম রত্ন নয়—সে মুখ যে দেবত্বমণ্ডিত অগ্নি! তাঁহারা যে পতিত! পতিতদের এই যে স্পর্দ্ধা, ইহাতেই ভগবানের নিকটে কত না জানি অপরাধী হইতে হইয়াছে। কিন্তু সেই বা কেন এখনো তাঁহাদের সঙ্গে এই নিতান্ত অনুপযুক্ত সম্বন্ধও রাখিতেছে? কেন সে শ্যামলীকে ত্যাগ করিয়া গেল না? শ্যামলীর পিতা যে পাপ করিয়াছে, তাহার শাস্তি কেন সে একটুও দিল না? তবে কি······ভগবান—ভগবান এই নিতান্ত অন্ধ

স্বার্থপরতা হইতে রক্ষা কর। সেই দেবকুমার যেন অসুখী না হয়। শ্যামলীকে যেন সে শীঘ্র তাঁহার কাছে রাখিয়া গিয়া আবার বিবাহ করে। উপযুক্ত বধূ গ্রহণ করিয়া যেন সে জীবনের সার্থকতা পায়। কোন অন্যায় খেয়ালে যেন সে শ্যামলীর মাতা-পিতাকে পাপের ভাগী না করে।

শ্যামলী মায়ের কোল ছাড়িয়া এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং কেনই বা আসিয়াছে, ভাবিয়া তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা পাইতেছিল না। বিজলীর দেখাদেখি সে সেদিন অনেক কাজই করিয়াছে, মায় মাথায় কাপড় দিয়া একখানা পাল্কীর মধ্যেও বসিয়াছিল, কিন্তু তাহাব পরে একি হইল! কতকগুলা অপরিচিত লোকে মিলিয়া তাহাকে এ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে! এত বড় বাড়ী এবং এমন সব গৃহসজ্জা, এমন সব লোক সে জীবনে কখনো দেখে নাই। কিন্তু সেদিকে তাহার মন বা দৃষ্টি কিছুই ছিল না। আজ তিন দিন তিন রাত সে তাহার মাকে দেখে নাই। তাহার মা কোথায় গেল, তাহার মা? ইহারা কেনই বা তাহাকে ভোগা দিয়া তাহার আজন্মের নীড় সেই বাড়ী, সেই গ্রাম হইতে এই দূর দেশে আনিয়া ফেলিয়াছে? ইহার কারণই বা কি? শ্যামলী ইহাদের বিরক্তি ও ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবভঙ্গীতে বুঝিতেছিল, তাহার উপরে ইহাদের বিদ্বেষের সীমা নাই। তাহার মাতার মতই একজন গৃহিণী, কিন্তু উঃ, তাঁহার মুখভাব কি ভয়ানক! শ্যামলীকে এই বাড়ীতে ইহারা নামাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহার ভীষণ মুখকান্তি শ্যামলীকে আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারই ইঙ্গিতে কয়েকজন স্ত্রীলোক একটা ঘরে সেই যে শ্যামলীকে আনিয়া পুরিয়াছে,

সেই হইতে শ্যামলী সেই ঘরেই বন্দীর মত আছে। শ্যামলী বুঝিতে পারিতে-ছিল, তাহাকে লইয়াই এ বাড়ীতে কি যেন একটা চলিতেছে। তাহাদের বাড়ীতে সেই রাত্রে তাহার পিতাকে কতকগুলা অপরিচিত লোক আসিয়া যেমন লাঞ্ছনা করিয়াছিল, ইহাদেরও মুখে চোখে সেই পরুষ ভাব। সেই রকম ভঙ্গীতে কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইহারা যেরকম হাত পা নাড়িতেছে, মুখভাব মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চিত বিস্ফারিত করিতেছে, ওষ্ঠাধরকে অশ্রান্ত দ্রুতভাবে কম্পিত করিয়া চলিয়াছে, ঘৃণায় রাগে বিদ্বেষে তাহাদের দুই চক্ষু যেরূপ জ্বলিতেছে, তাহাতে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে নিকটে পাইলে তাহারা যেন টিপিয়াই মারিবে, শ্যামলীর এই রকম বোধ হইতেছিল। একবার একবার তাহার মনে হইতেছিল, তাহারই উপর তাহাদের এরূপ ক্রুদ্ধ ভাব; কিন্তু সে তো তাহাদের হাতের মধ্যেই রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই তাহারা এখনি তো তাহাকে মারিতে পারে—এই কথা ভাবিতেই শ্যামলী আতঙ্কে দ্বিগুণ জড়প্রায় হইয়া ঘরের এককোণে বসিয়া বিস্ফারিত চক্ষে ইহাদের পানে চাহিতেছিল। কিন্তু শ্যামলী ক্রমে বুঝিল, তাহার সহিত তাহাদের ক্রোধের সম্পর্ক থাকিলেও তাহাদের প্রধান ক্রোধের পাত্র সে নয়,—যাহাকে পাইলে তাহারা টিপিয়া মারিতে প্রস্তুত, সে তাহাদের নিকটে নাই। শ্যামলীর তখন আশঙ্কা হইল, তবে কি তাহার পিতার উদ্দেশ্যেই তাহাদের এরকম ভঙ্গী চলিতেছে?—তাঁহাকেও যদি ইহারা শ্যামলীর মত পাল্কীতে করিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়া থাকে! তিনি কোথায় আছেন, কত দূরে? গবাক্ষ দিয়া শ্যামলী বাহিরে চাহিয়া দ্বিগুণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এ কি, এ কোথায় সে আসিয়াছে? তাহাদের সে গ্রাম কই? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় রাস্তা, তাতে অগণ্য লোকজন, কত চলমান অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু, এ কোন্ দেশ? এখানে গাছপালার শ্যাম শোভা নাই, এখানকার আকাশ চক্ষে নীলাঞ্জন বুলাইয়া দেয় না। এখান হইতে তাহার সে গ্রাম—তাহাদের সে বাড়ী কতদূর? তার মা কোথায়? সে যে আর এমন করিয়া ভয়ে

জমাট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এ ঘর হইতেও যে তাহার বাহির হইবার উপায় নাই। একবার বাহির হইয়া সেই গৃহিণীর মত স্ত্রীলোকটির সামনে পড়িবামাত্র তিনি এমনিভাবে মুখ ফিরাইলেন যে তাঁহার মুখ চোখ দেখিয়া শ্যামলীর বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি দারুণ ঘৃণার ভাবে একজনকে শ্যামলীর দিকে দেখাইয়া তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্যই যেন সঙ্কেত করিলেন। অমনি সে লোকটি হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আবার সেই গৃহে তাহাকে পুরিয়া দিল। সেই ঘরটি ছাড়া ইহারা তাহাকে অন্য কোথাও একটু বাহির হইতে দিতেও রাজী নয়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, এমন করিয়া তো সে জীবনে কখনো থাকে নাই। সে যে মুক্ত প্রকৃতির জীব, এমন বদ্ধ ঘরে তাহার তো একদিনেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। প্রথম প্রথম কতক-গুলা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, তাহার মত বিজলীর মত বয়সের কতকগুলা বৌ ঝি, তাহার কাছে আসিয়া বসিত এবং কি রকম এক অদ্ভুতভাবে তাহার পানে চাহিয়া নানারকম মুখভঙ্গী ও হস্তের ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। তাহারা যে শ্যামলীকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিত তাহা শ্যামলীর বুঝিতে বাকী থাকিত না, তাহাদের সেই অস্বস্তিকর সঙ্গে তখন শ্যামলীর কষ্টেরও সীমা থাকিত না। সে তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য এক কোণে গিয়া বসিত, কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার ছিল?—তাহারা টানাটানি করিয়াও তাহাকে সমান জ্বালাতন করিত। তখন সেই নিরুপায় মূক জীবের হৃদয় হইতে বড় আর্ত্তভাবেই যেন 'মা' শব্দ ফুটিয়া উঠিয়া বাহির হইতে চাহিত। মাগো—কোথায় তুমি? এ আমি কোথায় আসিলাম মা? ইহারা আমাকে তোমার কাছ ছাড়াইয়া এ কোথায় লইয়া আসিল? এখানে যে আমি আর একদণ্ডও বাঁচিতে পারিতেছি না। কোথায় আছ তুমি? তোমার মত দৃষ্টি যে আমি ইহাদের কাহারো চোখে দেখিতে পাই না।

তাহার ভাষাহীন মূক হৃদয় বুঝি এমনি ভাবের আন্দোলনেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া

উঠিত। কি যেন তাহার হৃদয় ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়, কিন্তু কোথা দিয়া বাহির হইবে? হায়, প্রকাশের পথই যে তাহার অনুভবের মধ্যে নাই। কেবল একটা পথ তাহার জীবনে সহসা এমন নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এত দিন এ-পথের কথাও সে জানিত না। ইহাদের নিষ্ঠুর মুখভাব এবং ব্যবহারে যখন শ্যামলীর হৃদয় তাহার মাতাকে স্মরণ করিয়া ফাটিয়া যাইবার মত হইত, তখন সে দেখিত তাহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া কতকগুলা জল পড়িয়া পড়িয়া ক্রমে বুকের সে যন্ত্রণা লাঘব হইয়া আসিতেছে। তাই যখনি মার জন্য কষ্ট হইত, তখনি কাঁদিবার জন্য সে এককোণে লুটাইয়া পড়িত।

একদিন যখন এরকমে তাহাকে কতকগুলা ছেলেমেয়ে মুখ ভ্যাঙাইয়া ভ্যাঙাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং সে কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে একজন যুবা সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের উপর মুখ চোখ রাঙাইয়া তাহাদের বাহির হইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল আর তখনি দলকে-দল ছেলে মেয়ে জড়সড় হইয়া সেই যে দৌড় দিল -- আড়াল হইতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিলেও সেই অবধি আর তাহারা শ্যামলীর সেই নির্দ্দিষ্ট কারাগারের মধ্যে পদার্পণ করিতে সাহস করিত না। সেই হইতে শ্যামলী একাই সেই ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি একভাবে কাটাইতেছে। মাঝে মাঝে কেবল একজন বর্ষীয়সী আসিয়া তাহাকে খাইবার জিনিস দিয়া যাইত এবং তাহার কিছু চাই কি না তাহার জন্য এক একবার ইঙ্গিত করিত। মাঝে মাঝে আসিয়া তাহারও কোন ইঙ্গিতের অপেক্ষায় তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু শ্যামলী লোক দেখিলেই মুখ ফিরাইয়া দেওয়ালের পানে চাহিয়া বসে। তাহাদের কি একরকম দৃষ্টি, শ্যামলীর গায়ে তাহা মোটে সহিত না। এই বর্ষীয়সী রাত্রেও আসিয়া শয্যার একধারে শুইয়া থাকে, কিন্তু শ্যামলী তাহাতে অসহিষ্ণু বই সুখী হয় না। তাহার মায়ের জায়গায় ইহাকে শুইতে দেখিয়া তাহার একটা অব্যক্ত কষ্ট হইতে থাকে। ইহার দত্ত খাবার জিনিসও সে প্রথম দিন মুখে তোলে নাই,

শেষে যেমন অনুপায় হইয়া খাইয়াছে তেমনি এখন অনুপায় ভাবে তাহার শয্যার একপাশে শুইয়া চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে ক্রমে ঘুমাইয়াও পড়ে। এই লোকটা যে একজন কাহারো আজ্ঞাবাহী মাত্র, ইহার যে শ্যামলীর উপরে ঘৃণা ও বিরক্তি ছাড়া বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই, তাহা শ্যামলীও বেশ বুঝিতে পারিল।

প্রথম দুই চারি দিন একটু বিমূঢ়ভাবে থাকিয়া শ্যামলীর দুর্দ্দম স্বভাব ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। নূতনত্বের বিস্ময় এবং স্তব্ধ সঙ্কোচ ক্রমেই সরিয়া গেল। সে আর কিছুতেই এখানে থাকিবে না, তাহার মার কাছে যাইবে। সে যে এমন করিয়া মা ছাড়া হইয়া এই একটা ঘরে কোথায় কোন্‌খানে বন্দী হইয়া আছে, একি তাহার মা জানিতে পারিতেছেন না? কেন তবে মা তাহাকে আজও খুঁজিতে আসিলেন না? সে যে একদণ্ড মার কাছছাড়া হইয়া থাকে না; আর মাও যে তাহাকে নিজের ঘরে বসাইয়া রাখিয়াও স্বস্তি পান না, সাতবার আসিয়া দেখিয়া যান। সেই মা আর সেই শ্যামলী আজ কদিনই দুজনে দুজনার কাছছাড়া। মাকেও বুঝি এরা এমনি করিয়া কোথাও পুরিয়া রাখিয়াছে। কোথায় তাহার মা? মার কাছে যাইতে না পাইলে সে আজ কিছুতেই ছাড়িবে না। এ ঘরে কিছুতেই আর থাকিবে না। মা যেইখানেই থাকুক না কেন, সেই-খানেই আজ সে যাইবে। শ্যামলী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র চারিদিক হইতে কতকগুলা রমণী আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল, হাস্য বিদ্রূপ এবং পরুষভাবের সহিত নানা রকম ভঙ্গীতে শ্যামলীকে কি একটা ভয়ের আভাস জানাইয়া পুনঃপুনঃ তাহাকে সেই ঘরে ঢুকিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু শ্যামলী তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া একদিকে পলাইবার জন্যই যে আজ সে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সে আর কিছুতেই থাকিবে না। তাহারাও এই বোবা মেয়েটির বিষম রোখ্‌ দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষণপরেই যাঁহার মুখভাবে শ্যামলী সবচেয়ে বেশীরকম শঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া শ্যামলীর সেই

উত্তেজিতভাব সহসা দমিয়া গেল। উজ্জ্বল দিবালোকে শ্যামলী তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিল, সত্যই তাঁহার মুখের চেহারায় ভয়ের মত তো এমন কিছু নাই। এই যে সব স্ত্রীলোক এবং তাহাদের গ্রামে যে সব রমণীদের দেখিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা ইঁহাতে কি একটা বিশিষ্টতা আছে, যাহাতে সকলেরই মন সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই উজ্জ্বল সুন্দর মুখের বিশাল চক্ষু যেমন শ্যামলীর মুখের উপর পড়িল, অমনি তাহা যেন আগুনের মত ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া তাহা হইলে জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে লাগিল। সেই মহীয়সীর মুখকান্তি মুহূর্ত্তে এম্‌নি পরুষ কঠিন হইয়া উঠিল.যে ভয়ে শ্যামলী আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তিনিও শ্যামলীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তীব্রতম ভাবে সকলকে এমন একটা ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন যে, সকলে একযোগে শ্যামলীকে ধরিয়া প্রায় টানিতে টানিতে ঠেলিতে ঠেলিতে সেই ঘরের মধ্যে পুরিয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

শ্যামলী বুঝিল, তাহার মার কাছে তাহাকে ইহারা যাইতে দিবে না। সেইজন্যই তাহাদের এ শাসন। এমনি করিয়া চিরকাল তাহাকে ইহারা এই ঘরে বন্দী রাখিবে, এই ষড়যন্ত্রই ইহারা করিয়াছে। শ্যামলী ক্ষোভে ক্রোধে উত্তেজিত জন্তুর মত নিঃশব্দে গজরাইতে লাগিল। যদি তাহার কোন সাধ্য থাকিত তাহা হইলে উহাদের এই ঘরটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া এবং যাহারা তাহাকে এই ঘরে পুরিয়াছে তাহাদিগকেও সেইরকম একটা কিছু প্রতিফল দিয়া সে মায়ের উদ্দেশ্যে ছুটিত। কিন্তু হায়, তাহার ক্ষীণশক্তি ঐ রুদ্ধ দ্বারটাই যে টানিয়া খুলিতে পারিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্যামলী একভাবে বসিয়া ছিল, তারপরে দেখিল, সেই স্ত্রীলোকটা ঘরের শিকল খুলিয়া তাহার আহার্য্য আনিয়া সম্মুখে ধরিল। শ্যামলী এতক্ষণে এমন একটা জিনিস হাতের কাছে পাইল, যাহা লইয়া সে যাহা খুশী করিতে পারে। সমস্ত খাবারগুলা ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত-

ভাবে সেই রমণীটির পানে চহিল। স্ত্রীলোকটি তখন তাহার কাণ্ডে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র শ্যামলী তাহার কক্ষের দ্বার এবার নিজেই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল এবং তখন গৃহতলে পড়িয়া নির্ব্বাক ভাষায় কাঁদিতে লাগিল, মা ওমা মাগো!

দিনের পর রাত এবং তারপরে আবার দিন হইল, কিন্তু শ্যামলী সে ঘরের দরজা খুলিল না। কেহ তাহার দ্বারও একবার ঠেলিল না। ক্রমে শ্যামলীর ক্ষুধায় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তথাপি সে দ্বার খুলিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয় ক্লান্ত হতাশাচ্ছন্ন বুক পেট পাতিয়া পড়িয়া পড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ক্রমে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল, যেন তাহার মা আসিয়া তাহার শিয়রে বসিয়াছেন এবং কত খাবার লইয়া কত আদরে শ্যামলীর ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সত্যই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, কে একজন তাহার শিয়রে বসিয়া আছে বটে, কিন্তু এ তো তাহার মা নয়। মা যদি নয়, তবে এ কেন এমন করিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতেছে?

শ্যামলী চোখ মেলিয়া দেখিল, তাহার কাছে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ফল, কি কি খাবার, আরও নানারকম জিনিস। বিজলীকে যেমন একদিন সে পাইতে দেখিয়াছিল, তেমনি সুন্দর সুন্দর কতকগুলা খেলনা, কয়টা ছবি। কিন্তু এসব কেন এরা আনিয়াছে? আর এই লোকটা, এ বাড়ীর মধ্যে ইহাকেই সে একটু চিনিতে পারিতেছে। সেই রাত্রে তাহার পিতা ইহারই সঙ্গে তাহাকে লইয়া কি সব করিয়াছিলেন এবং শেষে কাপড়ে কাপড়ে বাঁধিয়া ইহারই পাশে বসাইয়া দিয়াছিলেন, মনে হইতেছে। কিন্তু তাহার ফলে সেই রাত্রে তাহার পিতার কি লাঞ্ছনাই না হইয়াছিল! এই লোকটাই তাহাকে তাহাদের বাড়ী হইতে নিশ্চয় এখানে আনিয়াছে। এইই তাহার যত জ্বালা-যন্ত্রণার এবং তাহার মা হারাইবার কারণ। এ আবার কিসের জন্য বন্ধ দুয়ার খুলিয়া এমন করিয়া

এইসব লইয়া তাহার কাছে আসিয়াছে ? তাহাকে ভোগা দিয়া যেমন পাল্কীতে চড়াইয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে, আবার তেমনি করিয়া, বুঝি মার কাছেও যাইতে না দিবারই ইহার মতলব। তাই এই সব খেলনা, এই সব ছবি। মুহূর্ত্তে শ্যামলী দীপ্ত ভাবে উঠিয়া বসিল এবং দুই হাতে মাথার শিয়রের জিনিসগুলা তছ্‌নচ্‌ করিয়া ছিটাইয়া ছড়াইয়া দিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি তাহার কোন বিরক্তির কারণ ঘটিল না দেখিয়া অসহিষ্ণুভাবে শ্যামলী অগত্যা সেই লোকটার পানে ফিরিল। দেখিল, সে একই ভাবে বসিয়া আছে। চক্ষু নত, মুখ একান্ত বিষণ্ণ। কি শ্যামলীর দিকে, কি ছড়ানো জিনিসগুলার দিকে, কোন দিকেই তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার এই নিশ্চেষ্টতা যখন শ্যামলীকে ক্রমে বিরক্তি ও চাঞ্চল্যের শেষ সীমায় আনিয়াছে, তখন সেই লোকটা চোখ তুলিয়া শ্যামলীর পানে চাহিল। এমন বিষণ্ণ দৃষ্টি শ্যামলী আর যেন কাহারও চোখে দেখে নাই। শ্যামলী অনুসন্ধিৎসু ভাবে তাহার মতলবটা বুঝিবার জন্যই রোখের সহিত তাহার দিকে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার এই বিষণ্ণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে বাধিয়া সহসা তাহার চক্ষু আপনিই নত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে শ্যামলী আবার যখন দৃষ্টি তুলিল, তখন শ্যামলীর দৃষ্টি কোমল এবং অপরাধীর মত ভীত হইয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখের দ্বার খুলিয়া গৃহিণী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শ্যামলী দেখিল, ইহাকে দেখিয়া কেবল সেই মাত্র যে ভীত হয় তাহা নয়—যে এতক্ষণ সম্মুখে বসিয়াছিল, তাহারও মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত দোষীর মত সেও তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু সেই গৃহিণী সে সব দিকে লক্ষ্য করিলেন না। একেবারে আসিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত ধরিয়া সেস্থান হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন এবং সেই রকম জ্বলন্ত চক্ষে একবার শ্যামলীর পানে চাহিয়া আবার যুবকের দিকে ফিরিয়া ঘৃণায় বিদ্বেষে ওষ্ঠাধর মুহুর্মুহুঃ

কম্পিত করিতে লাগিলেন। যুবকও তাঁহার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অনুনয়ের সহিত মাঝে মাঝে কি যেন প্রার্থনা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁর ক্রুদ্ধ ভাবের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি যেন কিছুতেই তাহাকে সেখানে থাকিতে দিবেন না, এই ভাবে পুনঃ পুনঃ যুবককে আকর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং মাঝে মাঝে নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া ক্রমে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্যামলী এইবার দ্বিগুণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ইহারা কেন তাহার ঘরে ঢুকিয়া এমন করিতেছে। ঐ লোকটা না আসিলে তো ইঁনও এ ঘরে পা দিতেন না। যত নষ্টের মূল ঐ লোকটা! শ্যামলী সশঙ্ক বিরক্তিতে ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া দেওয়ালের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

আবার কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে স্কন্ধদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া শ্যামলী ঈষৎ ফিরিয়া দেখিল, ঘরে সেই যুবক ছাড়া আর কেহ নাই। সে-ই তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কি ইঙ্গিত করিতেছে, তাহার হস্তে আরও ফল ও খাবার। আহার্য্যগুলা শ্যামলীর সম্মুখে অত্যন্ত নিকটে রাখিয়া যুবক দ্বারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একবার আবার একটু তাহার পানে চাহিয়া দ্বারপথে অপসৃত হইল। সেই করুণ অনুকম্পার বেদনাভরা দৃষ্টি দেখিয়া শ্যামলী আবার বিমূঢ় হইয়া রহিল। এত দুঃখের সঙ্গে কেহ তো কখনো তাহার পানে চাহে নাই, মা ছাড়া আর কাহারও চক্ষে সে এমন দৃষ্টি তো দেখে নাই!

অনিলের মাতা আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। অনিলের বিবাহের ফল যে এমন হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। কত কত দরিদ্র অক্ষম মূর্খও বিবাহ করিয়া সুন্দর সুন্দর বউ ঘরে আনিতেছে, আর তাঁহার বিদ্বান বুদ্ধিমান স্কন্দোপমকান্তি লক্ষপতি যুবা সন্তানের এ কিসের সহিত বিবাহ হইল? তাঁহার এত বড় সাধে এমন বাদ কে সাধিল? কে আর? ঐ জন্তুটার সেই জুয়াচোর পিতা! একটা সুন্দর মেয়ে দেখাইয়া তাঁহার ছেলের সঙ্গে নিজের একটি কালা বোবা মেয়ের বিবাহ দেয়, এতবড় তাহার আস্পর্দ্ধা! কিন্তু অনিল কি বলিয়া তাহাকে রেহাই দিয়া আসিয়াছে? তাহার সে সুন্দর মেয়ে যে অনিল বিবাহ করে নাই, সে ভালই করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রতারকের ঘরের মেয়েকে কি বলিয়া সে শিশিরের সঙ্গেই বা বিবাহ দিল এবং মিথ্যাবাদী জুয়া-চোরকে জেলে না দিয়া, তাহার জাতি মান নষ্ট না করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তির পরিবর্ত্তে সে তাহাকে ক্ষমা করিয়া আসিল? শুধু কি তাই? না হয় তুই খুব হৃদয়বান ক্ষমাশীল আছিস্ - চিরকালই তোর এমনি স্বভাব। বড় বড় অন্যায় করিয়াও যদি কেহ তোর কাছে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায়, তুই অমনি গলিয়া যাস্, এ তো চিরকাল দেখিয়া এবং সহিয়া আসিতেছি—কিন্তু তাই বলিয়া কি এতদূরই করিতে হয়? কুকুরকে স্পর্দ্ধা দেওয়া—এও যে রক্তমাংসের শরীরে সহে না। বিবাহের স্থলে তোকে যে এতবড় উপহাস করিল—তাহাকে ক্ষমা করিলি বেশ, কিন্তু সেই জন্তুটাকে আবার সঙ্গে করিয়া কোন্ মুখে বাড়ী আনিলি? ওটাকে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিতে তোর কি একটু লজ্জাও হইল না? সকলে যে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। মিত্রতে কত দুঃখ করিতেছে, শত্রুতে কত

হাসিতেছে। আর তোর মা? তার কথাও কি অনিল তোর একবার মনে হইল না? কত কত লক্ষপতির শিক্ষিতা সুন্দরী গুণবতী দুহিতাকেও সে যে নিজের ছেলের উপযুক্ত মনে করে নাই। কত কত ধনী ও দরিদ্রের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া সে যে তোর মতের অপেক্ষাতেই এতদিন বিবাহ দেয় নাই। তোর বৌকে সাজাইয়া আদর করিয়া কত সুখে যে সংসার পাতাইবার আশায় সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বুকে এমন শেল বিঁধিতে বিধাতা বা মানুষ কাহারই দয়া হইল না বটে, কিন্তু তুই যে তাহার বুকের ধন। ওরে তোরও কি মনে হইল না যে, মা এ কি-রকমে সহিবে? তোর মত ছেলের পাশে ঐ একটা জন্তু! মায়ের প্রাণে একি কেহ সহ্য করিতে পারে, না কেহ কখনো সহিয়াছে? যা হবার তা হইয়াছিল, কিন্তু ওটাকে আবার ঘাড়ে করিয়া কেন আনিলি? এখনো ওটাকে কি বলিয়া বাড়ীতে রাখিতেছিস্! সে খাইতেছে কি না, কাঁদিতেছে কি না, একা আছে কি না, এইসব তত্ত্ব লইতেছিস্! ওটাকে যতশীঘ্র সম্ভব বিদায় করিয়া দিয়া এই অপমানের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার উদ্যোগও কি শীঘ্র করিতে হইবে না?—এ অপমান ও লজ্জার বস্তুকে এমন করিয়া চোখের উপর বুকের উপর রাখার উদ্দেশ্য কি তোর? তুই কি ভাবিয়াছিস্—ওরে বাপ্‌রে, সে কথা যে মনের কোণেও আনিতে গেলে এখনি আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। তোর মা বাঁচিয়া থাকিতে এই দয়ার খেয়ালে তুই যে তোর অমন জীবনটার একটা দিনও নষ্ট করিবি, মার প্রাণে তা কিছুতেই সহিবে না! মা যেমন করিয়া পারে, তোর এ দুর্গ্রহকে তোর চোখের সামনে হইতে—জীবনের পাশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তোর বিবাহ দিবার আগে তোর মা যে জগতের অজস্র প্রমাণে কত সাধের সঙ্গে সুখের বেদনায় কাঁদিয়াছিল যে, এইবার তুই মা ছাড়া জগতে একে একে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি আরও অনেককে ক্রমশঃ জানিবি; একা মায়ের আছিস্, আরও অনেকের হইবি, কিন্তু ভগবান একি করিলেন। ভগবান নয় মানুষে! মানুষাধম দানবে তাঁহার সেই

আশার সাজানো বাগানে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি ক্ষমতা থাকিতে সে আগুন নিভাইতে হইবে না? অনিল কি করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে তাহার মাতার বুকের এই প্রধূমিত অগ্নিশিখার জ্বালা, এই অবিরল অশ্রুজল দেখিতেছে? ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইতেছে না? মাতা যা সাধ করিয়াছিলেন, তেমন করিয়া ছেলে পর হইলে তিনি আজ চরিতার্থ হইতেন। তাহা হইল না, কিন্তু মাঝ হইতে একি একটা আপদ জুটিয়া তাঁহার সেই অনিলকে এমন করিয়া দিল? যে অনিল মাতার ম্লানমুখ একদণ্ড সহিতে পারে না, সে আজ তাঁর এ যন্ত্রণার কি অনুভবও পাইতেছে না? পাইতেছে নিশ্চয়, কেননা তাহার মুখে সে হাসি নাই, তাঁহার ফুলের মত কোমল শিশু এই আকস্মিক অভাবনীয় বিপৎপাতে যে কতখানি শুকাইয়া উঠিয়াছে, তাহাও তো তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। সে মা বলিয়া ডাকিতে আসিলে তিনি ঘরের কোণে লুকাইতেছেন, আর সে যে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া যাইতেছে—সে দৃষ্টিতে, সে মুখের ছবিতে, কষ্টের কথা মায়ের বুঝিতে তো বাকী থাকিতেছে না। কিন্তু তবু অনিল কি যেন একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মন বাঁধিয়াছে—যাহার জন্য সে সবই সহিবে, এই যেন তাহার পণ; আর তাহার মাও ছেলের মুখে সেই প্রতিজ্ঞার ছায়া দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন—বুক ভরিয়া কাঁদিতেছেন এবং নিজের প্রাণান্ত পণেই যে অনিলের এ ঝোঁক দূর করিতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া মেয়েটাকে দূর করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্রের ও তাঁহার মধ্যে এই সহসা জাগরিত বিচ্ছেদকে আর তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না।

অনিলের মাতার আহ্বানে শিশির সেখানে আসিল বটে, কিন্তু তাঁহার ভাব বুঝিয়া সভয়ে সঙ্কোচে দূরেদূরেই রহিল। অনিল ম্লান হাসিয়া বন্ধুকে বলিল, "মার কাছে তোমায়ও ত্যাজ্য পুত্র করে দিলাম দেখছি আমি।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শিশিরকে মাতা অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনিল এইবার তাঁহার

উদ্দেশ্য বুঝিল।

ঘণ্টা দুই পরে শিশির ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মাতা কি বলিযাছেন সে কথার উচ্চবাচ্য না করিয়া সে আশপাশের কথা পাড়িতেছে দেখিয়া অনিল হাসিয়া বলিল, "কি হে, আমায় তুমিও ত্যাগ করবার ফন্দীতে আছ দেখছি যে! মা তো করেছেনই!"

অন্তরালে মাতার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, হায়, তাঁর এমন ছেলের কেন এমন কুগ্রহ জুটিল। শিশির এইবার গম্ভীর মুখে বলিল, "সৃষ্টিছাড়া কাজ করলেই তাকে সৃষ্টির বাইরে যেতে হয়।"

"কি সৃষ্টিছাড়া কাজটা আমার দেখলে?"

"সবই। আমায়ও নিজের সঙ্গে জুটিয়ে জগতের কাছে তেমনি করে তুলেছ।"

"বটে! বন্ধু বন্ধুর, ভাই ভাইয়ের বিভ্রাটে সাহায্য করে না, এইই তোমার নতুন মত, না?"

"আঃ—আমার দিক থেকে কি বলছি? আমি তাহলে কি রাজী হতাম? সংসারের দিক থেকে দ্যাখো।"

"তোমার মা-বাপও অসন্তুষ্ট হন্‌নি শুনেছি। তোমায়ও এমন বিপদে ফেলিনি যাতে ভবিষ্যতে তুমি—"

"ওহে না না, আমার দিকের কথা বলছি নাকি? কিন্তু তোমার বাড়ীও কি আমার বাড়ী বলে জানতাম না? সেখানের সকলের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না যে!"

"আমি যখন পারছি তখন তুমিও নিশ্চয় পারবে। সকলেই এ জানে যে আমার দায়েই তুমি বিপন্ন লোকের সাহায্যরূপ এত বড় দুষ্কর্ম্মটা করেছ। যাক্, মা সত্যই আমার মুখ দ্যাখেন না, জানো?"

অন্তরালস্থিতা মাতার চক্ষু আবার সজল হইল।

শিশির উত্তর দিল—"কিন্তু তাঁর মনস্তাপের কথা তুমি কেন একবারও ভাবছ না?"

"কেন ভাবব না? কিন্তু ভগবানের হাতের কাজের ওপর মানুষে কি ভেবে কিছু করতে পারে ভাই?"

মাতা আর অন্তরালে থাকিতে পারিলেন না—"ভগবানের কাজ!—মানুষের অধম চামারের কাজ! জুয়াচোর ধাপ্পাবাজের কাজ!"—বলিতে বলিতে তিনি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। অনিল তাঁহাকে দেখিয়া সবেগে "মা" বলিয়া নিকটস্থ হইয়া পায়ের নিকট বসিয়া পড়িল এবং ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল। মা যে এমন করিয়া এতদিন একবারও তাহার কাছে আসেন নাই। মাতাও কতদিন পরে পুত্রকে এমনভাবে কোলের মধ্যে মুখ লুকাইতে দেখিয়া গত কয়দিনের দুঃখে বেদনায় অভিমানে দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠিলেন। শিশিরও যেন নিজেকে মহা অপরাধী জ্ঞানে নতমস্তকে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতা কিছু শান্ত হইলে শিশিরই প্রথমে কথা কহিল। কণ্ঠের জড়তা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর কেন?—ওকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।"

অনিল একভাবে মাতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়াই রহিল। পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া মাতা তখন ডাকিলেন—"অনিল!"

"মা?"

"আর আমায় তুই কষ্ট দিস্‌নে অনিল! শিশির কি বলছে শুন্‌ছিস্‌?"

"শিশির তো বলছে না মা—ও তুমিই বলছ।"

আচ্ছা, আমিই বলছি। আমার কথা কি আজ তোর কাছে তুচ্ছ হ'ল রে?"

"না মা, তুচ্ছ হলে কি এত ভাবি? ভগবানের বিধান সেই রাত্রেই মাথায়

নিয়েছি ; কিন্তু তোমার কষ্ট হবে, হচ্ছে, এই ভাবনাতেই তো আমার এত—"

"আমার কষ্টের কথা তুই ভাবছিস্? ওরে তা যদি ভাবতিস্, তাহলে আর ওকে বাড়ী আনতিস্ না!"

অনিল তাহার মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শান্তস্বরে বলিল, "কি করব মা! আগে ত কিছু জানা যায়নি। বিয়ের মন্তর সব পড়া হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রদান আর গ্রহণের কিছুই বাকি ছিল না।"

"হ'লই বা! তুই কি অঙ্গহীন মেয়ে জেনে বিয়ে করছিলি? তুই যাকে জান্‌ছিলি, সে যখন নয়, তখন কিসের বিয়ে—কিসেরই বা সম্প্রদান, আর কিসেরই বা গ্রহণ? এ বিয়ে বিয়েই নয়। ওই কি বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে? ওর কি বিয়ে হয় কখনো?"

"ও-ও কি একটা মানুষ নয় মা? ওর কি আত্মা নেই? অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হলেও ঐ মন্ত্রেই তো ওর সম্প্রদান হ'ত। আমরা যদি ওকে ঠিক জানিনি বলে এ গ্রহণকে গ্রহণ না বলি, তবু ওর সম্প্রদান ঠিকই হয়ে গেছে। ও-ও সে মন্ত্রের যা না বুঝেছে, আমাদের ঘরের মেয়েরা কেউই তা বোঝে না—কিন্তু তাতেও যখন তাদের বিয়ে হয়, তখন ওরও হয়েছে। আর আমরাই বা গ্রহণ করিনি বলব কি বলে? ধর্ম্ম ঈশ্বর সমাজ সকলকে সাক্ষী করে—একটা ভাল মেয়ে বিয়ে করতেও যা যা শপথ উচ্চারণ করতে হয়, যা যা দায়িত্ব নিতে হয়, যে যে কথা বলতে হয়, সবই বলেছি করেছি।"

"আচ্ছা, তা যা হয়েছে হয়েছে, তুই ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে এলি কেন?"

"ভগবান ওকে আমার ঘাড়ে দিলেন কেন মা? ওর মতই একটা কালা বোবা কি কানা খোঁড়ার সঙ্গে ওর ঐ রকম মন্ত্র-পড়া সিঁদুর দেওয়া ঘটে গেল না কেন মা? তোমার ছেলের মত একটু লেখা-পড়া-জানা একটু পয়সাওয়ালা একটা লোকের হাতেই ভগবান ওকে এমন কাণ্ড করে ফেলে দিলেন কেন?"

"ভগবান ভগবান বকিস্‌নে অনিল—এ সেই বদমাস বাটপাড়—জুয়াচোর—"

"আমার কথাগুলো আগে শোন মা একটু। ভগবান এই ভেবে দিলেন যে,—এই একটা হতভাগ্য জীবের ভাগ্যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে দূরদৃষ্টিবশতঃ কিম্বা জড়প্রকৃতিরই অপূর্ণতার দরুণ, যাই বলি আমরা, এইরকম পাশা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ওগো একটি পূর্ণমনুষ্যত্বাভিমানী জীব, তুমি কি তোমার জ্ঞান দয়া বিদ্যা বুদ্ধি এবং মনুষ্যত্বের সার মায়া মমতা দিয়ে একটা প্রাণীর এই দারুণ অভাব যথাসাধ্য কিছু মোচন করতে পার না? যদি পার, তা হলে চেষ্টা ছাখো। তোমার হাতে সেই রকম একটি জীব আমি দিচ্ছি। দেখি তুমি এর ওপর কতখানি মনুষ্যত্ব দেখাতে পার। ভগবানের এই ইচ্ছা ভিন্ন এতে আর কিছু আমি দেখছি না। তাই আমি কেবল ভাবছি মা যে আমি ওর কি করতে পারি।"

শিশির স্তব্ধ ভাবে বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিল। মাতাও ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কি করবি তুই ওকে নিয়ে, এর আবার ভাবনাই বা কি?"

"কেন মা, করতে পারলে তো অনেকই করবার আছে। মূক-বধির বিদ্যালয়ের কথা তো জান। যদিও ওর একটু বয়স হয়েছে, তা হলেও যদি একটা কৃতবিদ্য মানুষ আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে ওর সঙ্গে সর্ব্বদা থেকে ওকে কথার উচ্চারণ শেখায়, উচ্চারণের ইঙ্গিত দেখায়, ভাবপ্রকাশের উপায় বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর পরিচয় করায়, তাহলে কালে ক্রমশঃ ওকে বেশ লেখাপড়া শিখিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়ে দিতে পারে, কিছু কিছু কথা কইতেও শেখাতে পারে। তাহলেই ওর অর্দ্ধেক অভাব কমিয়ে দিতে পারা যায়।"

"তুই বুঝি মতলব করেছিস্‌ অমনি করে ওকে সব শেখাবি? ওরে, এই-জন্যে আমি তোকে এত লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম? আমার প্রাণ থাকতে আমি তোকে এ কালা বোবা জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ার হয়ে ফিরতে দেব

না, এ তুই জেনে রাখিস্।"

অনিল মৃদুস্বরে বলিল, "মা, তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর অগৌরব হ'ত না এতে।"

"রেখে দে ও গৌরবের কথা। আর যদি এমন হবার কথা মনেও আন্‌বি, তাহলে তোর সামনে আমি গলায় দড়ি দেব। ওকে আমি তোর পাশে এক-দিনও এ চক্ষে দেখতে পারব না। ভগবান, আমি কি পাপ করেছিলাম যে, আমার এমন চাঁদের পাশে রাহু জুটিয়ে দিলে? শিশির, যদি মা বলে এখনো আমায় মনে করিস্, বলছি আজই ওকে ওর বাপের বাড়ী নিয়ে যা—আর একদিনও যদি ঐ বৌ আমার ঘরে থাকে, তাহলে আমিই পাগল হয়ে ঘর ছাড়ব।

শিশির অনিলের পানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার টাকার অভাব নেই, একটা জীবের দুর্ভাগ্যে তোমার কষ্ট হয়েছে, বিশেষ যখন সে এমনভাবে তোমার হাতে এসে পড়েছে, তখন ওর জন্য কিছু টাকা খরচই না হয় কর। ওঁরা সহরে এসে থেকে তাঁদের মেয়েটিকে মূক-বধির বিদ্যালয়ে পড়ান।"

"ছেলেমানুষের মত কথা বলছ কেন শিশির? ওর মা বাপ কি ঐ একটি সন্তানের জন্যে আর সব সন্তান আর বাসভূমি ছাড়বেন? তাতে আবার তাঁরা পাড়াগাঁয়ের হিন্দু—মেয়েটি তাঁদের বয়স্থা, তাতে বিবাহিতা, তাকে অপরিচিত পুরুষদের মধ্যে দিলে সমাজে তাঁদের জাতই কি থাকবে? তা দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া বলেছি তো, অত অল্প চেষ্টায় তো ফল পাবার সময় এখন নেই। যদি কেউ আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে কিছুকাল ধরে চেষ্টা করতে পারে, তবেই যদি কিছু ফললাভ ঘটে। একটা জীবনের অভাব দূর করতে হলে আর একটা জীবনকেও কিছু আত্মদান করতে হবে বইকি।"

"সেই চেষ্টায় তুই নিজের জীবনটা উৎসর্গ করবি? আর যদি তুই এ কথা বলবি বা ওর কথা মনেও ভাববি, জানিস্ তোর মাতৃহত্যার পাতক হবে।"

শিশির স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া মাতার পানে চাহিল। অনিল ধীরে ধীরে "কি করলে মা" বলিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিল। মাতা কোন দিকে গ্রাহ্য না করিয়া শিশিরকে কঠিন স্বরে বলিলেন, "যথার্থ বন্ধুর উপকার শুধু তার কথা শুনে সুন্দর মেয়ে বিয়ে করলেই হয় না বাপু, সে যদি না বুঝে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে বসে, তাতে একটু শক্ত হয়ে বাধা দিতে হয়। আজই যদি তুমি সেটাকে সে গ্রামে না নিয়ে যাবে, তাহলে পাগল ত হয়েছি, আরও হব; আজ থেকে আমি হত্যা দেব অনিলের ওপর। যতদিন না তাকে এ বাড়ী থেকে নিয়ে যায় ততদিন—"

অনিল মাতার পায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "একটা ভিক্ষা দাও মা শুধু আমায়। এর পরে—যা দিব্যি দিয়েছ, তাই মেনে চলব। আমি ওকে রেখে আসি, একদিনের জন্যে। এইটুকু শুধু—তারপরে কোন সম্বন্ধ থাকবে না—"

মাতা পুত্রের অবশ স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া একটু যেন থমকিয়া গেলেন, আবার তখনি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, মনে রেখো, একটি দিন মাত্র, পৌঁছে দিয়ে সেই দিনই—"

"হ্যাঁ, তাই হবে মা।"

৯

শ্যামলী ও বিজলীর বিবাহ লইয়া তাহাদের গ্রামে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন থামিয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারে গ্রামের লোক যাহা যাহা আশা করিয়াছিল, তাহার একটাও সফল হয় নাই। ধনীর সন্তান অনিল বিজলীকে গ্রহণ না করিলেও শিশিরের মত পাত্র যে জগতে বড় সুলভ নয়, তাহা তাহারা

বুঝিয়াছে। অষ্টমঙ্গলায় বিজলীর সঙ্গে শিশিরও সে গ্রামে আসিয়া দুই চারিদিন থাকিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাবে শ্বশুরালয়ের সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছে। তেমন ধনবানের হস্তে না পড়িলেও বিজলীর ভবিষ্যৎ ভাগ্য যে অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিয়াছে। বাকী এখন শ্যামলী, তা তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহার একটাও অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্য্যের কিছু ত হইবে না! এই যে অনিল তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছে, ইহাই বরং আশ্চর্য্যের কথা! যাক, বড়লোকের ছেলের সখ! তার আর-একটা বিবাহ করিতেই বা কতক্ষণ আর কালা-বোবাটাকেও দুটা ভাতকাপড় দিতেও কি সে অক্ষম? মাঝে হতে বাপ-মায়ের একটা মহাভার মস্তক হইতে নামিয়া গিয়াছে, ভালই। যা শত্রু পরে পরে। শ্যামলীর জন্য চিন্তার বাজে খরচ করিতে কেহই আর রাজী নয়। বিজলীর সৌভাগ্যেই সকলে সন্তুষ্ট। এমন কি তাহাদের পিতারও মুখ এবং মস্তক এখন প্রায় চিন্তামুক্ত। অনিলের মহত্ত্বে তাঁহার মনে যে অনুতাপ এবং লজ্জা জাগিয়া উঠিয়াছিল, অনিলের সে দেবোপম মুখের দিকে চাহিয়া নিজের কার্য্য স্মরণে তাঁহার যে বেদনা আসিতেছিল, তাহা এখন নিজের নিশ্চিন্ততার সুযোগে মন হইতে একরকম সরিয়াই গিয়াছে। তাঁহার জাতি কুল মান সব বজায় রহিয়াছে, বিজলীও সৎপাত্রে পড়িয়াছে; তবে অনিল দয়া করিয়া শ্যামলীকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেও তাহাকে জামাই বলিয়া মনে ভাবিতেও অন্তর একটু পীড়িত হইয়া উঠে বটে। এ সম্বন্ধ সে চিরদিন কখনই রাখিতে পারিবে না এবং তা আশা করাও অন্যায়; দুঃখ এই যে, অমন ছেলেটিকে তেমন আপনার জন করিতে পারা গেল না। যাক্, তাহার জন্য আর এখন দুঃখ করিয়া কি হইবে? জাতি মান সম্ভ্রমের জন্য জীবনে এমন কতই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর লোক্সানের চেয়ে লাভই ত তাহার বেশী হইয়াছে।

দিন যাইতেছিল না কেবল শ্যামলীর মার। ইহা অপেক্ষা যদি অনিল

শ্যামলীকে সেখানে ফেলিয়া যাইত, তাহা হইলে বুঝি তাঁহার এমন হইত না। স্বামীর কুলমান রক্ষা করিয়াছে স্মরণ করিয়া সেই বালক দেবতাটির উদ্দেশ্যে দিনান্তে সকৃতজ্ঞ মস্তক নত করিয়া একরকমে তাঁহারও নিশ্চিন্ততা আসিত। কিন্তু সেই অসীমসাহসী বালক এ করিল কি? তাহার মত সর্ব্ববিষয়ে উন্নত জীবনের পাশে শ্যামলীকে স্থান দেওয়া—একি জগতে সম্ভব—না এ কেহ কখনো পারিয়াছে? কেন সে শ্যামলীকে সঙ্গে লইয়া গেল? ইহার ফলে না জানি তাহাকে কতখানিই সহিতে হইতেছে! এমন অনুপযুক্ত সাহস সে কেন করিল? কেন সে বাড়ী গিয়া এতদিন উপযুক্ত বধূ ঘরে আনিল না? যে জন্য সে শ্যামলীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, তাহা যে ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। একি জগতে সম্ভব? বিশেষতঃ তাহার মত ধনে মানে কুলে শীলে অগ্রণী, বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে অত্যুন্নত যুবকদের পক্ষে। সেও যদি এতবড় উদারতা দেখাইতে চাহে, তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহা করিতে দিবে কেন? না, অমন তরুণজীবন, অমন দেবোপম যুবকের যেন এমন বিধিলিপি না হয়। সে যেন তাঁহার হতভাগিনী কন্যাকে শীঘ্র তাঁহার কাছে রাখিয়া গিয়া আবার বিবাহ করে। এই অভাগিনীদের জন্য তাহাব জীবন যেন অসুখী না হয়, বিধাতা এমন যেন না করেন। তুদিনে যেন তাহার এ খেয়াল মিটিয়া যায়। কিন্তু লোকে যাহা বলিতেছে, যদি তাহাই ঘটে? পিতা-মাতার কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ যদি সে শ্যামলীকে গৃহের কোণে তুই মুঠা খাইতে ও পরিতে দিয়া ফেলিয়া রাখিয়া নিজের যথোপযুক্ত জীবনযাত্রা গ্রহণ করে, এবং তাঁহাদের প্রতিফল দিবার জন্য শ্যামলীকে আর তাহার বাপমায়ের কাছে না পাঠায়, যদি এই উদ্দেশ্যেই শ্যামলীকে সে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু মন তো এ কথা মানিতে চাহে না। তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে শিশিরের সঙ্গে বিজলীর বিবাহ না দিয়া তাহারা সেই রাত্রে চলিয়া গেলেই সে এ কার্য্যের চূড়ান্ত প্রতিফল ফলিতে পারিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে কি তাহার উপর এ সন্দেহ করা চলে?

কিন্তু তবু শ্যামলীকে সে না লইয়া গেলে সব দিকেই ভাল করিত। সেই হতভাগীটা যে কচি শিশুর মত মা ভিন্ন জানে না। তার সেই অর্দ্ধমাত্রিক মানব-জীবন লইয়া পরের ঘরে নিতান্ত অপরিচিতগণের সংস্পর্শে কি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে? যতই যা হউক, এই কার্য্যের কিছু না কিছু প্রতিফল নিশ্চয় তাহারই উপর গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সে যে একান্ত শিশুর মত, তাহাকে যে লোকে পাগল বলে, সে কি করিয়া সে তাপ সহ্য করিতেছে? শুনিতে না পাইলেও সে তো দেখিতে পায়; স্নেহ অস্নেহ, দয়া অনুকম্পা, বা ক্রূরতা নির্দ্দয়তা—ইহার প্রভেদ তো একটু একটু সে বুঝিতে পারে। মায়ের কোল নহিলে, মায়ের হাত নহিলে যে তাহার শোওয়া খাওয়া হয় না। সে কি করিয়া খাইতেছে, ঘুমাইতেছে, কি করিয়া তার দিন যাইতেছে? সে কি কিছু বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার মা কেন তাহাকে এমন করিয়া কোথায় পাঠাইয়াছে? অনিলের সহিত তাহার সম্বন্ধ, অনিলের দেবত্ব, মহত্ত্ব, হায়, তাহার বুঝি বুঝিবারও শক্তি নাই। ভগবান যে তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের খর্ব্বতা করিয়া মনের গঠন এবং গ্রহণ-শক্তিকেও অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। যে জগতের সব পায় না, সব দিতেও যে সে জানে না। কেবল জানে সে মাকে। মারই সব সে পাইয়াছে এবং তাই তাঁহাকে তাহার সবটুকু দিতেও সে পারে। সেই মা ছাড়া হইয়া সে কেমন করিয়া আছে? হায়, সে যে মা বলিয়া কাঁদিতেও জানে না, অভাব যে সে প্রকাশ করিবার পথ পায় নাই। অধিকারে এমন বঞ্চিত যে হতভাগ্য, তাহার কি মা ছাড়া বাঁচার উপায় আছে? অনিল, তুমি দেবতা, কিন্তু মানুষের সব ব্যথা সব কথা বুঝি জান না—তাই এমন ভুল করিয়া ফেলিলে।

এমনি চিন্তায় যখন শ্যামলীর মাতার দিন আর কাটিতেছে না, স্বামী ও বিজলীর কখনো প্রবোধ কখনো তিরস্কারেও তাঁহার দেহ আর খাড়া করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে একদিন শ্যামলী শিবিকা হইতে নামিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াই য়াধরিল। জগতে যাহার আর কোথাও স্থান

নাই, যাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই সকলে বাঁচে, যাহার স্থান কেবল প্রিয়জনের হৃদয়ের ভিতরেই, সে যদি এমনি অতর্কিতে আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরে, তাহাকে যেমন সেই আত্মজন সচকিতে সানন্দে সশঙ্কায় হৃদয়ের ভিতরেই চাপিয়া ধরিতে চায়, তেমনি করিয়া শ্যামলীর মা শ্যামলীকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। যেন আর কেহ দেখিতে না পায়, তাহার বাপ নয়, আত্মীয় স্বজন নয়, কেহ নয়, সে যেন এমনি করিয়া তাঁহার বুকের মধ্যেই লুকাইয়া থাকে।

শ্যামলী তাঁহার বুকের উপর হাসিয়া কাঁদিয়া গলা জড়াইয়া চুমো খাইয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে আর মাতা ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছেন, কৃশ মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, তাঁহারও চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রু ঝরিতেছে। এমন সময়ে স্বামী আসিয়া নতমুখে সংবাদ দিলেন, "জামাই এসেছেন।" শ্যামলীকে একটু পাশের দিকে আড়াল করিয়া মাতা তাঁহার পানে চাহিলেন, "জামাই ? শিশির ?"

"না—অনিল বাবাজী।" কর্ত্তা কষ্টের সহিত উচ্চারণ করিলেন। মাতা তখন চেষ্টার সহিত শ্যামলীকে বিজলীর নিকটে বসাইয়া দিলেন, সে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না, মাতা তাহাকে বিজলীকে দেখাইয়া দু-একটা সস্নেহ সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্যামলী কত দিনের পরে বিজলীকেও যে দেখিল। অন্যের পক্ষে এমন বেশী দিন না হইলেও শ্যামলীর পক্ষে যে কত যুগ! সে হাসিমুখে তখন বিজলীরও গলা জড়াইয়া ধরিল।

যাহার মুখ, যাহার চিন্তা, তাঁহার সন্তানের ভাবনারও অগ্রস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাকে সন্তানের মত করিয়া জল খাওয়াইতে বা অভ্যর্থনা করিতে শ্যামলীর মাতার সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। হায়, একি অনুপযুক্ত সৌভাগ্য তাঁর, আর এই দেবোপম যুবকের কি অভাগ্য! যাহাকে সন্তান বলিয়া ভাবিতে, 'বাছা' বলিয়া ডাকিতে, সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া

উঠিতেছে, কিন্তু হায়, তাহার পক্ষে ইহা কেবল অপমান মাত্র। যাহা পাইবার নয়, এমন স্বপ্ন ঈশ্বর কেন তবে দেখাইলেন ?

জল খাইয়া উঠিয়া অনিল পুনশ্চ তাঁহাকে প্রণাম করায় তিনি বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। অনিল মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে এখনি যেতে হবে।"

"এখনি ?" অতিকষ্টে শ্যামলীর মাতা উচ্চারণ করিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি অনিলের সঙ্গে একটি কথাও কহিতে পারেন নাই। বলিবার কিইবা তাঁহার আছে ?

"এখনি না গেলে পরের ট্রেন ধরতে পারব না।" অনিল তেমনি নত মুখে উত্তর করিল।

"আর খানিকক্ষণ মাত্র থেকে দুটি খেয়ে যাও।" অতি কষ্টে শ্যামলীর মাতা উচ্চারণ করিলেন।

অনিল একটু ভাবিয়া, একটু থামিয়া শেষে সম্মতির ভাবে নিকটস্থ এক-খানা আসন টানিয়া বসিয়া পড়িল।

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকার পরে মাতা সহসা ঈষৎ উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিলেন, "তুমি আবার কেন এলে বাবা ? কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হ'ত।"

অনিল তেমনি ভাবে কেবল উত্তর দিল—"না।"

মাত্র দুটি খাইয়া যাও, এর বেশী অনুরোধ করিবার শ্যামলীর মাতার কি আর আছে ? 'একটি দিন থাকিয়া যাও,' এ কথা কোন্ মুখে তিনি বলিবেন ? এই যুবকের মুখ দেখিয়া পুত্রস্নেহে বুক উথলিয়া উঠিলেও ইহার ও তাঁহাদের মধ্যে যে এক ভাষাহীন শব্দহীন অতল অপার সমুদ্রের ব্যবধান !

অনিল যখন আসিয়াছিল, তখন বেলা বেশী ছিল না, তাই খাওয়া সারা হইতেই বিকাল হইয়া আসিল। যতক্ষণ অনিল আহার করিতেছিল, শ্যামলীর মাতা একপাশে দাঁড়াইয়া অপলকনেত্রে জামাতাকে দেখিতেছিলেন, আবশ্যক মত সম্মুখে আসিয়া পরিবেশনও করিতেছিলেন। কি এক লজ্জায় বিজলী ভগ্নী-

পতির সম্মুখে আসিতে পারিল না। অনিলকে জামাতা ভাবিয়া আনন্দের সঙ্গে নিজের সন্তানকেও সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে যে বিজলীদের মাতার উৎসাহ ছিল না, তাই তিনি একাই যথাকর্ত্তব্য সমস্ত করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতেছিলেন, শ্যামলীকে এই রাখিয়া গিয়াই অনিল এইবার এই বিসদৃশ সম্বন্ধের শেষ করিবে। কেনই বা না করিবে? এতদিন যে করে নাই—এই মূক-বধিরকেই পরিণীতা স্ত্রী বলিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া আবার নিজেই যে রাখিতে আসিয়াছে, এ যে পরম আশ্চর্য্যেরই বিষয়! যাহা হওয়া একান্ত উচিত, তাহাই এইবার হইবে, ইহাতে ক্ষোভের বা দুঃখের তো কিছুই নাই। যে ইহাতে বেদনা বোধ করিবে, তাহাকে ভগবান দণ্ড দিবেন, মাতা হইলেও সে অন্যায়-দাবীদারকে তিনি ক্ষমা করিবেন না। শ্যামলীর মাতা মনে মনে অনিলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এইবার যেন তুমি উপযুক্ত স্ত্রী লাভ কর। এ অপমানের স্মৃতিও তোমার এর পরে ভগবান আর রাখিবেন না। কিন্তু যাহাকে, যে অভিশপ্ত হতভাগ্য জীবটিকে এত বড় সম্পদ ভগবান দুদিনের জন্যও দিয়াছিলেন, সে যেন, এই কদিনের স্মৃতি ইহজীবনে না ভোলে! তাহার গভীর দুর্ভাগ্যের অন্ধকারের উপর এই সহসা সমুদিত সমুজ্জ্বল অরুণ—ইহার রশ্মি, ইহার মহিমা, যেন তাহার জড়-জীবনকেও জীবন্ত করে, আলোকিত করে, যদিও এ সূর্য্য তাহার জীবন-পথ হইতে চকিতেই অপসৃত হইতেছে, তবু ইহাকে মনে করিতে পারা, মনে রাখিতে পারার সৌভাগ্য যেন শ্যামলী লাভ করে। এ স্মৃতির দুঃখও তাহার জীবনকে যে শ্লাঘনীয় করিবে। কিন্তু শ্যামলীর মাতার সন্দেহ হইতেছিল, হতভাগিনী শ্যামলী ইহাকে জানিয়াছে কি একটুও? একটু কিছু পাইয়াছে কি? বুঝিয়াছে কি যে, ভগবান যে লোকটির সহিত অতর্কিতে তাহার এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দিয়াছেন, সে কত বড় বস্তু? সে তাহাদের পাইবার ছুঁইবার নয়। ইহাতে শ্যামলী পরে বেদনা পাইবে বটে, কিন্তু তাহার সেই অন্ধকারময় জীবনযাত্রার সম্বল এ বেদনাটুকুও শ্যামলীর মাতা তাহার জন্য প্রার্থনা

করিতেছিলেন। হায়, নহিলে তাহার জীবন কি লইয়া কাটিবে!

আহারান্তে বিদায়ের জন্য অনিল উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্যামলীর মাতা রুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিলেন, "বাবা!"

অনিল তাঁহার স্বর শুনিয়া মুখ নামাইয়া মনের ভিতর যেন চোখ বুজিল।

"আর কি কখনো তোমায় আমরা দেখতে পাব?"

"ভগবান জানেন মা।" অতি মৃদুস্বরে অনিল উত্তর দিল।

"এতদিন নিজেদেরই দোষী করে এসেছি, কিন্তু আজ বলছি, এ ভগবানেরই কাজ বটে। তিনি যখন ঐ হতভাগীর সঙ্গে সম্বন্ধ ধরিয়ে দিয়েও তোমায় আবার আমাদের দেখালেন—তুমি যখন এই বাড়ীতে যতটুকুর জন্যই হোক্, আবারও পা দিলে, তখন আর আমার এ কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না। ভগবান করুন, এইবার যেন তুমি সুখী হও—আত্মীয়-স্বজনকেও সুখী কর। কিন্তু যার জন্যে তুমি এত সহ্য করলে, তার জন্যে আরও একটু কিছু তোমায় করতে হবে।"

"আমার আর যে কিছু করবার সাধ্য নেই মা,—আমার মা···" বলিতে বলিতে অনিল থামিল।

"বেশী কিছু নয় বাবা, এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না—সামান্য একটু দয়া মাত্র।"

"বলুন, কিন্তু আমায় আজই ফিরতে হবে।"

"তাই যেও—কিন্তু ওকে এমন একটা কিছু দিয়ো, যাতে সে চিরকাল তার এ সৌভাগ্য মনে রাখতে পারে। তুমি তোমার এ দুর্ভাগ্য ভুলে যেও—কিন্তু তার ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বনের জন্য—" বলিতে বলিতে তিনি ক্রমে থামিয়া গেলেন।

অনিলও কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া শেষে ভগ্নস্বরে বলিল, "তার আর দরকার কি বলুন? থাকৃত—যদি আমি তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে পেতাম।

যখন আমিই তা পাব না, তখন তারই বা এ কথা মনে থাকার আর দরকার কি? আর তা হয়ত মনে থাকবে না; এ ব্যাপারের পর হতে তার পক্ষে যে কেবল কষ্টের কারণই ঘটেছে।"

"তা ঘটুক—তবু একটু পরিচয়ও কি তোমার সে পায়নি বাবা?"

"না মা, তার সঙ্গে আগন্তুকের পরিচয় তো সহজে হবার নয়।"

শ্যামলীর মাতা কিছুক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু বাধবাধ ভাবে বলিলেন, "তোমার কোনো ছবি আছে কি বাবা?"

অনিল এইবার তাহার দুই আর্দ্রদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া বলিল, "কি আমি করতে পারলাম তার জন্যে যে আপনার এ চেষ্টা? ভেবেছিলাম—অনেক কথাই,—কিন্তু তার যখন একটিও করতে পারলাম না—তখন কিসের জন্যে আর আপনি এত কথা ভাবছেন?"

"তার জন্যে অনেক কথা ভাবা—এও যে আজ পর্য্যন্ত জগতে কেউ করেনি। তোমার এই দয়ার কথাই আমি তাকে চিরজীবন ধরে বোঝাবো। সে যেন জানে যে, এমন একজন লোকও এ জগতে আছে যে তার জন্যে একদিনও ভেবেছে।"

"কি দরকার তার বলুন? আমি যখন আর তার কিছু করতেই পারব না—কোন চিন্তা পর্য্যন্ত না—তখন আমার কথা আর তার জীবনের সঙ্গে কেন জড়াবেন? তার জীবনে হয়ত এ-সবের কোন দরকারও হবে না কখনো।"

"এখনো সমস্ত জীবনই পড়ে আছে যে তার। এমন হয়ে যে চিরদিনই থাকবে—এ যে মনে করতে পারি না। ভগবানই যে তাকে তোমার সঙ্গে জড়িয়েছেন। তুমি মনে করো না আর তার কথা, কিন্তু সে যদি কখনো মনে করতে পারে—আমি মা, আমার সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকাই উচিত। তাই তো বলছিলাম—যদি একটা ছবি—"

"আচ্ছা, পারি তো দেখব।" অগত্যা অনিল এইটুকু মাত্র উচ্চারণ করিল—কিন্তু তাহার মন এ কথায় সায় দিল না। সে-ই যখন এই হতভাগ্যের

সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারিবে, তখন শ্যামলীরই বা তাহার সঙ্গে কিসের যোগ থাকিল? সমাজ পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিবে, আর স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা খাটিবে না, সেই জন্যই কি এ ব্যবস্থা? এই অর্দ্ধমনুষ্য প্রাণীটির পক্ষেও কি এই নিয়ম? অনিলের যদি এ বিবাহও অসিদ্ধ হয়, তাহারই বা কেন না হইবে? তাহাকে আর কেহ বিবাহও করিবে না এবং যাহার সহিত বিবাহ হইল, তাহারও গ্রহণযোগ্য সে হইবে না? তবু অনিলকে মনে মনে স্বামী বলিয়া তাহাকে চিরদিন জানিতে হইবে? তাহার বিবাহের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্য ভয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, সেই জন্য তাহার জানিতে হইবে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার স্বামী আছে, অমুক তাহার স্বামী। আর অনিলকে সকলে বলিবে, সে তোমার স্ত্রী নয়, তাহার জন্য তোমার কোন কর্ত্তব্য নাই, অন্য স্ত্রী গ্রহণই তোমার কর্ত্তব্য। মানুষের এ রহস্য বড় মন্দ নয়। শ্যামলীর অপরাধ কি? না, ভগবান তাহার সহিত এক নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া মানুষ করিয়াও তাহাকে মানুষের ভোগের সর্ব্ববস্তু ভোগ করিতে দেন নাই, তাই সে মানুষের কাছেও তাহার প্রাপ্য অধিকারে চিরবঞ্চিত থাকিতে বাধ্য। আর যাহাদের ভগবান সর্ব্বভোগে তুষ্ট ও পুষ্ট করিয়াছেন, তাহাদের পান হইতে চুন খসিলেই তাহারা সহ্য করিতে স্বীকৃত নয়। হায়রে মানুষ, তোমার মনুষ্যত্বের মহা অভিমানের মূল্য এই!

শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া অনিল সিঁড়ির নিকটে আসিয়া অন্যমনে সম্মুখের খোলা ছাতের পানে চাহিতেই দেখিল, সম্মুখে আসন্নবর্ষণ মেঘভারসজ্জিত আকাশের কি অপরূপ শোভা! অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আভায় সেই পেঁজাতুলার মত লঘু, হেমন্তের মেঘগুলা হরিদ্রোজ্জ্বল সুবর্ণজ্যোতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেন কাহার মাথার সুবর্ণের গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার কে যেন প্রকাণ্ড একখানা চিরুণী দিয়া অতি সুবিন্যস্ত ভাবে পাত্‌লা পাত্‌লা করিয়া আঁচড়াইয়া দিগন্তর ঢাকিয়া এলাইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার সেই অপরূপ আভায় পৃথিবী পর্য্যন্ত

উদ্ভাসিত। তাহারই মধ্যে সেই ছোট ছাতের এককোণে দাঁড়াইয়া শ্যামলীর ক্ষীণ শরীরটি একেবারে স্তব্ধ হইয়া আলিসার গায়ে অবশ ভাবে বিন্যস্ত, অথচ দুই চক্ষে সম্মুখের সেই স্বর্গাভার দীপ্ত জ্যোতিচ্ছুরিত মুখকান্তি আনন্দে অত্যধিক রক্তিম, যেন সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপরাশিকে পান করিতেছে।

অনিল একটু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এমন করিয়া দেখা যেন সে কখনো দেখে নাই। যে এমন করিয়া দেখিতে জানে,—দেখিবার আনন্দকে অনুভব করিবার শক্তি যার এত তীব্র, তার একটা ইন্দ্রিয় অচেতন থাকিলেও বাকী-গুলার দ্বারা তাহার মনও কি ক্রমে প্রস্তুত হইবে না? সাধারণ মানুষের অপেক্ষা বিলম্বে হইলেও তাহার মন কি একদিন আপনিই অন্য সমস্ত প্রাণীর মতই স্নেহ-ভালবাসা আদর-যত্ন পাইতে বা কাহাকেও দিতে উন্মুখ হইয়া উঠিবে না? হায়, চেষ্টা করিলে কি এ-কে আরও শীঘ্র আরও ভালরূপে একটা মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা যাইত না? ইহার অভাব কিছুও কি পূরাইতে পারা যাইত না? নিশ্চয়ই যাইত। বিশেষ যার মনের এতখানি অনুভব, তন্ময়তা—তাহাকে তো খুবই পারা যাইত। কিন্তু তাহা হইল না। সে যেমন অবহেলে সেদিন তাহার সহিত অনিলের বিবাহগ্রন্থি খুলিয়া দিয়াছিল, অনিলও আজ তাহাই করিতেছে।

শ্যামলীর একা সে শোভা দেখিয়া আশ মিটিতেছিল না। মাতা বা ভগ্নীর প্রত্যাশায় মুখ ফিরাইতে যেমন অনিলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, অমনি তাহার মুখের সে আনন্দজ্যোতি যেন মিলাইয়া গেল। দারুণ বিরক্তি ও অসন্তোষচিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। এ সেই লোকটা—যে তাহাকে ধরিয়া কোথায় লইয়া গিয়া এতদিন আটকাইয়া রাখিয়াছিল। আবার এখানেও সে কেন আসিয়াছে? মা কেন তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছেন না? শ্যামলীর মনে হইল, লোকটা যেন তাহার নিকটে আসিতেছে। অমনি বিরক্তিতে ক্রোধে তাহার

দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া শ্যামলী তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এখানে মা আছেন —এখান হইতে তো জোর করিয়া সে লইয়া যাইতে পারিবে না, এখনি মা'র কাছে সে ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। সাহসে ও ক্রোধের বেগে শ্যামলী উত্তেজিত ভাবে আগন্তুকের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু লোকটার ধরিয়া লইয়া যাইবার মত অভিপ্রায় তো দেখিল না। শুদ্ধভাবে লোকটা তাহারই চক্ষের পানে মুখের দিকে চাহিয়া আছে মাত্র এবং চোখে কি এক রকমের দৃষ্টি। শ্যামলীর মনে পড়িল, এই দৃষ্টি সে আরও ক'বার দেখিয়াছে, কিন্তু আজিকার মত এমন করুণ, এমন প্রাণভরা বুঝি আর কোন দিনই দেখে নাই। বেদনায় আর্দ্র, স্নেহে কোমল, সহানুভূতিতে বিস্ফারিত, আরও, আরও কত কি যাহা শ্যামলী বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।—কেবল তাহার মনে হইল, তাহার মায়ের চোখের দৃষ্টির সঙ্গেও ইহার যেন কোথায় সাদৃশ্য আছে। অমনি শ্যামলীর বিদ্রোহী মন ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল।

শেষ হেমন্তের মেঘ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সন্ধ্যার আঁধারে একটা বৃষ্টির সূচনা করিল। সেই মেঘ ও অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে অনিল স্টেশনের দিকে চলিয়া গেলে শ্যামলীর মাতা গৃহকোণে পড়িয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন, আর শ্যামলী অবাক্ হইয়া মার কাছে বসিয়া শিশুর মত মাঝে মাঝে মার মুখ তুলিয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল। মায়ের চোখের জলে ক্রমে তাহারও চোখে যেন একটা মেঘ ঘনাইতেছিল।

একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের হাত হইতে নিস্তার পাইলে মানুষ যেমন ঘুমভাঙার পর "আঃ" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে, অনিলের মাতা শ্যামলীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া তেমনি ভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার ছেলে আপাততঃ তাহার এই একটা নূতন খেয়ালে বাধা পাইয়া দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসিবে, যেদিন সে বুঝিবে যে তাহার মাতা তাহাকেও কি একটা বিষম দুঃস্বপ্নের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া চিরকালের জন্য বাঁচাইয়া দিয়াছেন। এই বিপন্মুক্তির কথা মনে পড়িলে সেও তখন অমনি "আঃ" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিবে। এখনও সে তাহার এ খেয়ালকে ভুলিতে পারিতেছে না বটে—তাই সেটাকে বাপের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া পর্য্যন্ত আর কাহারো সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে না, —ঘরের বাহিরই প্রায় হয় না—নিজের পড়িবার ঘরেই দিনরাত কাটাইতেছে। মা এখন তাহার নিকটস্থ হইবার জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ছেলে তাঁহাকে সে স্থযোগ দিতেছে না। পাঠাগারের মধ্যে এককোণে সেই যে মুখের কাছে বই ধরিয়া সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছে—তাহাতে আর তাহার বিরক্তি নাই। কিন্তু মা চিরদিন জানেন, দু' তিন ঘণ্টা পড়ার পরই সে একবার ছুটিয়া মায়ের কাছে আসে—শিশিরের সহিত বা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে খানিক গল্প করে, নয়ত বাহিরেও খানিকটা বেড়াইয়া লয়। একভাবে দীর্ঘকাল থাকা একেবারে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন—এই যে অনিল ও তাঁহাদের মধ্যে একটা মূক-বধির জড়ের প্রাচীর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাকে সরাইতে না জানি তাঁহার কতদিন লাগিবে। তাঁহার যে

আর একদিনও বিলম্ব সহিতেছে না। কিন্তু হায়, এ দুঃস্বপ্ন যে কাটিয়াও কাটিতে চাহে না। অনিল ও তাঁহার মধ্যের এই অভিমানের দূরত্ব যে-উপায়ে শীঘ্র কাটিতে পারে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে, তাহারও উদ্যোগ করিতে যে তাঁহার মনে আর বল নাই। তিনি যদি অনিলের জানিত কোন ঘরে পুত্রের বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে এমন বুঝি হইত না। তাঁহার ব্যস্ততাতেই এ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এবার অনিলের পছন্দমত স্থান হইতেই কন্যা আনিতে হইবে, কিন্তু সে পছন্দ করিতে যে অনিল উদ্যোগী হইবে, তাহা ভাবিয়া মাতা যে কূল পাইতেছেন না।

শিশিরেরও অনিলের এ ব্যবহারকে ক্রমে বাড়াবাড়ি বলিয়া লাগিতেছিল। শ্যামলীর সঙ্গে তাহারও একটু সম্বন্ধ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু অনিলের সঙ্গে তাহার যে চিরন্তর সম্বন্ধ, তাহার উপরে তো কেহ নয়। বড় সাধের বিবাহে একটা এমন বিপৎপাত ঘটিলে কিছুদিন সে সংসার এম্‌নি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায় বটে এবং অনিলের মত আশৈশব হৃদয়বান কোমলমনা তরুণ যুবকের পক্ষেও ইহাতে একটু আঘাত লাগিতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি চিরদিন এমনি ভাবে কাটাইতে হইবে? শ্যামলীর উপর দয়া করিয়া, শ্যামলীকে কাছে রাখিলেও অনিলকে একটি উপযুক্ত পাত্রী তো বিবাহ করিতেই হইত, শ্যামলীকে লইয়া তো তাহার এমন জীবন কাটিতে পারিত না। মায়ের কঠিন দিব্যে অনিল শ্যামলীর সঙ্গে সেই দয়ার সম্বন্ধটুকু যে রাখিতে পাইল না, ইহা তাহার পক্ষে একটু ক্ষোভের কারণ হইলেও তাহা লইয়া এত মুহ্যমান হওয়া কিসের জন্য? লোকে প্রথম জীবনে তো কত উচ্চ সঙ্কল্প, কত মহৎ আদর্শ মনে লইয়াই সংসারে পদার্পণ করে, কিন্তু কয়টা লোকের সে সব কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে? শ্যামলীর সঙ্গে তাহার একটু করুণার সম্পর্ক ছাড়া হৃদয়ের তো কোন যোগ সম্ভব হইতে পারে না। এমন কত অনাথ হতভাগ্য অন্ধ বধির আতুর জগতে আছে। অনিলের সঙ্গে ঘটনাক্রমে সে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই কি তাহার জন্য

অনিলকে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে? এ যে দয়ার অতি বাড়াবাড়ি-রকম আব্দার! মা তাহার না হয় একটু বেশী রকম কঠিন ও অসহিষ্ণু হইয়া অনিলকে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তা কি এত অন্যায় হইয়াছে? অনিলের দয়ার এই অতি বাড়াবাড়ির ভয়েই তিনি অত শক্ত হইয়া উঠিয়া সে হতভাগা মেয়েটার কথা আর ভাবিতে পারেন নাই। অনিলের অনিষ্টের আশঙ্কাতেই না তাঁহার এ কাঠিন্য? সেই আজন্ম-শুভার্থিনী পরম স্নেহময়ী মা ঘরে ঘরে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন, ইহাতে অনিলের মত মায়ের আঁচলধরা ছেলের দৃক্পাত নাই। এর চেয়ে অনিলের আর কি অন্যায় হইতে পারে? আর সে? শিশির না তাহার বুকের আধখানা? শিশির যে মর্ম্মান্তিক লজ্জায় তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকটে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না; বিজলীর মত স্ত্রী এমন অতর্কিত সৌভাগ্যে লাভ করিযাও সে সৌভাগ্য এ বাড়ীতে আসিলে আর যেন সহ্য করিতে সাধ্য হয় না,—এ কথাও কি অনিল একবার ভাবিতেছে না? অনিল এমন করিবে জানিলে হয়ত শিশির এ প্রলোভনও ত্যাগ করিত। শিশিরকে এ লজ্জা হইতে মুক্তি দিবার কথাও কি একবার তাহার মনে হয় না? অনিলকে এ কি খেয়ালে পাইয়া বসিল?

সজোর পদবিক্ষেপে অনিলের পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া শিশির তাহাকে আলমারীকুঞ্জের এক নিভৃত স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিল এবং হাতের বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "তোমার মতলবটা কি স্পষ্ট করে বলো দেখি আমাদের?"

"মতলব? বইখানার দিকে কষ্ট করে একটু নজর দিলেই বুঝতে পারবে। পি-আর-এস্‌টা যদি—"

"একসঙ্গে ছাত্রবৃত্তি থেকে আরম্ভ করে এম-এ পর্য্যন্ত চলেছি দুজনে, আর আজ আমি কি করেছি অনিল, যে তুমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার হতে চাইছ,

অথচ আমি তার খবরটাও জানি না ?"

"জান না কি বলছ শিশির ? এ কি আমাদের বহুদিনের স্থির করা বিষয় নয় ?"

"হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু মাঝের এই কাণ্ডগুলোর পর এ কথা তো আর হয়নি আমাদের মধ্যে।"

"মাঝের কাণ্ড মাঝেই মিলিয়ে গেছে—এখন আবার তার আগের সূত্র টেনে জীবনকে গাঁথ্‌তে হবে ত ?"

"আর আমি ? তোমারি আদেশে আমার মাঝের ব্যাপারটা সকলের চোখে জ্বলজ্বলেই হ'ল, অথচ সেই তুমিই আমায় এম্‌নি করে ছাড়ছ ! একবারও ভাবছ না যে কার কথায় আমি—"

শিশিরের কাঁধে হাত দিয়া অনিল বলিল, "সে কি ভাই ? এমন কথা কেন ভাবছ ?"

"কেন ভাব্‌ব না ? কি দোষ করেছি তোমার কাছে যে মাকে আর আমাকে এমন করে ত্যাগ করছ ?"

সবিষাদনেত্রে বন্ধুর পানে চাহিয়া অনিল বলিল, "তোমরা তো দোষী নও শিশির—দোষী আমি। তোমাদের মনের ভাবের সঙ্গে মতের সঙ্গে আজ আমার মন যে সায় দিচ্ছে না, এ কি আমারই দোষ নয় ভাই ? আর তুমি ? তুমি আমার জন্যে যা সইবে বইবে, তাও কি আমায় মুখে বলে তোমায় ধন্যবাদ দিতে হবে ?"

শিশির লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা বলছি না,—আমার কথা নয়, মার বিষয়ে কেন তুমি একটু ভাবছ না অনিল ? তুমি মার কাছে যাও না—চেয়ে থাও না—এই ঘরে সর্ব্বদা এমনি করে রয়েছ, এতে মা যে কষ্ট পাচ্ছেন।"

"আমার কি দোষে তিনি এত রাগ করলেন ? সে ব্যাপার কি আমার ইচ্ছাকৃত ?"

"না, সে তো ইচ্ছাকৃত নয় বটেই। বাদ্‌বাকী যাতে তাঁর তোমার ওপরে অভিমান হয়েছিল, তাও তো তুমি মিটিয়ে দিয়েছ। কিন্তু ভেবে ছাখো একবার, তিনি যা করেছেন, তা কি জগতের পক্ষে এত বেশী বিরল ঘটনা ?"

"না, কিন্তু আমার মাকে যে আমি জগতের চেয়ে অনেক উঁচু বলে জানতাম।"

"অবুঝের মত কথা বলো না। তিনি স্ত্রীলোক, তিনি মা। তুমি যে কত সময়ে নিজে মা হয়ে তাঁর পক্ষের কত কথার অনুমোদন করতে—আর আজ তাঁর কষ্ট বুঝতে পারছ না ? এ কষ্ট কি কেবল তাঁর নিজের জন্যেই ? তোমার মত ছেলের পাশে ঐ রকম স্ত্রী—এ কি—"

অনিল একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আঃ শিশির—সে যে বিজলীর বোন ভুলে যাচ্ছ বুঝি ? আত্মীয়-স্বজনের হতভাগ্যের কথা আত্মীয়ের কি অমন নিষ্ঠুর ভাবে উচ্চারণ করতে আছে ?"

শিশির লজ্জা পাইয়া নীরব হইল। অনিল বলিল, "না, আমি যে মাকে খুব বেশী দোষী করছি—তা ভেবো না। সাধারণ মায়ে যা করেন, তিনিও তাই করেছেন।"

"তুমিই বা তাঁর পেটে হয়ে এত অসাধারণ কেন হবে ?"

অনিল তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "কই তা হলাম ? আমিও তো জগতের রীতিতেই চলছি।"

"আচ্ছা কিসে তোমার মন এত অন্যায় বলছে আমায় বোঝাও আগে। যার সঙ্গে বিয়ের কথা, তার সঙ্গে না দিয়ে তোমায় লুকিয়ে একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে ; তুমি কি তাকে স্ত্রী বলতে, গ্রহণ করতে বাধ্য ?"

"নিজের কথায় নিজেই হারলে যে! ধর, যদি শ্যামলী কালা বোবা না হয়ে খুব কুৎসিতা হ'ত—আর তার বাপ কুৎসিত মেয়ে পার করবার জন্যে এইরকম কাজ করত, তাতে কি সে আমার স্ত্রী বলে গণ্য হ'ত না ? আমি না হয়

তাকেও ত্যাগ করে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে পারি—যেমন আমাদের দেশে আকছার ঘটে থাকে—যা তুমিও বলছ—ধর্ম্মের কথাও যদি ছেড়ে দাও,- কিন্তু মনের সঙ্গে বলো দেখি; সেই কালো স্ত্রীরও আমায় স্বামী বলে জানতে বা পেতে অধিকার থাকত কি না ?"

"কিন্তু এ যে তা নয় অনিল—এ যে—"

"কালা এবং বোবা, কিন্তু তবু আত্মা আছে, মন আছে। একটা ইন্দ্রিয় না থাকলে আরও এমন সব বস্তু তাতে নিশ্চয়ই আছে—যার দ্বারা প্রত্যেক মানুষের মতই সুখ দুঃখ বেদনা অভাব আনন্দ তৃষ্ণা সে অনুভব করে। তার উপরে সে নারীস্বভাবা, যে নারী একদিন স্বামীর স্ত্রী, প্রণয়ীর প্রণয়িনী, সন্তানের মাতা হবার জন্যে আপনা হতেই লালায়িতা হয়ে উঠে। কালা বোবা বলে কি শ্যামলীর মনে কখনো নারীত্বের এসব বৃত্তি জাগ্‌বে না ভাবো ?"

"মানি,—কিন্তু তবু তোমাকে স্বামীরূপে সে কি পেতে পারত—যদি না তার বাপ—"

"আমিও মানি এ কথা,—কিন্তু যখন বিধির চক্রে এই রকমই হয়েছে, তখন একটা আত্মাকে—বিশেষ যাকে ধর্ম্ম ঈশ্বর সমাজকে সাক্ষী করে বিয়ে করতে হয়েছে, তাকে···"

"কিসের বিয়ে ? তুমি কি জানতে, তুমি ঐ রকম মেয়ে বিয়ে করছ, তা-হলে কি করতে ?"

"না। কিন্তু—কিসের বিয়ে কি করে বলছ শিশির ? তুমিও তো তখনি বিজলীকে না চিনেই অনিচ্ছাতেই মন্ত্রগুলো পড়েছ ! বল দেখি কোন সভ্যতম জাতিতে, কোন দেশে, কোন সমাজে, এমনি কেবল কথা বলে স্ত্রী-গ্রহণ চলে ? আমাদের দেশে স্ত্রী বা স্বামী ত্যাগ কোনমতেই হতে পারে না। অন্য দেশের কথা এ ক্ষেত্রে চলে না।"

"স্বামী ত্যাগ স্ত্রীদের ক্ষমতায় নেই বটে, কিন্তু উপযুক্ত স্ত্রী ত্যাগই দেশে

কত বলো দেখি? এ তো তোমার—”

“জানি, সেটা দেশের মহা পাপের মধ্যেই গণ্য জেনো। নানা পাপ না জড়ালে কি সে দেশের সে জাতের এত অধঃপতন হয়? কিন্তু যদি এ কাজ কেউ পাপ বলে বোঝে, সেও কি তাই করবে? ভগবান সাক্ষী করে যার সমস্ত দায়িত্ব এমন করে নিলাম, তারপরে যেই জানলাম—যা ভেবে তাকে গ্রহণ করেছি, সে তার চেয়ে শতগুণে দুর্ভাগা, মহা অভাবগ্রস্ত, অমনি তাকে আমায় ত্যাগ করতে হবে? যদি আমার সাহায্যে তার ঐ দুর্ভাগ্যের একটুও কমে, আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে, আমার মন দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে যদি তার সে অভাবের কিছুও পূরণ হয়, তা আমি একটুও করব না? আমার হৃদয় তোমার হোক, আমার ধর্ম্মকর্ম্ম পাপপুণ্য সমস্তের তুমি অংশভাগিনী হও, আমার কুলে প্রতিষ্ঠিত হও—এসব কথা কি তুমি আমিও অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কতকগুলো শব্দমাত্র মনে করব শিশির?”

“তোমার আমার চেয়ে কত বড় বড় লোকেরা তা মনে করে গেছেন এবং এখনো করছেন—”

“করুন—তাঁরা অন্য সবদিকে বড়লোক হতে পারেন, এখানে নন!”

“কেন, আমাদের শাস্ত্রেও এ রকম স্ত্রী ত্যাগ করবার বিধি আছে।”

“শুধু স্ত্রী কেন বলছ—সে রকম স্বামী ত্যাগেরও তো ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা কেন সমাজে চলে না?”

“আমরা তো সমাজ সংস্কার করতে বসিনি—আমরা যা চলে, তাই কেবল মেনে চলতে চাই।”

“না, আমি নিজেকে অত হীন মনে করি না শিশির, তোমার আমার সমাজ সংস্কার করবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। সমাজকে দৃষ্টান্ত দিয়েই সংশোধন করতে হয়। স্ত্রীদের দ্বারা যাকে সনাতনধর্ম্ম বলে মানিয়ে নেওয়া হচ্ছে—পুরুষদেরও সেই ধর্ম্ম পালন করতে হবে। তারা যখন ক্লীব পতিত জড় অন্ধ

স্বামী ত্যাগ করতে পারে না, তখন পুরুষও তা পারে না।”

“তোমার এ সাম্যবাদের ফাঁকে ফাঁকে এমন গলদ বেরুবে অনিল, যাতে সমাজ তো পরের কথা, জাতেরই চিহ্ন থাকবে না। স্ত্রীলোকেরা এ সমাজে দ্বিতীয় বিয়ের অধিকার পায় না বলে পুরুষেরও যদি বারণ হয় তাহলে দুই দিকের ব্রহ্মচর্য্যে এ জাতকে আর ধরাধামে একশ বছরও টিকতে হবে না। তুমি বলবে জানি—তাহলে স্ত্রীকেও সেই অধিকার দাও, কিন্তু সে কথা তোমার এখনকার হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনার কথা মাত্র হবে। তুমিও জান এবং আমিও জানি যে, স্ত্রীপুরুষের এ সাম্যবাদের নীতি বহু দেশে বহু তর্কের সঙ্গে চললেও সমত্ব কখনই মানুষে তাদের দিতে পারবে না। কিসে পারবে—প্রকৃতিই যে তাদের দুর্ব্বল করে রেখেছে! হয়ত তুমি এখনি সব দেশের সব কালের জোট করে গণ্ডাকতক নারীর দৃষ্টান্ত সকলের সাম্‌নে ধরবে—কিন্তু সব শস্য বা সব গাছের ফলের মধ্যেই অমন গোটাদুচ্চার বড় হয়ে যায়, তাদের নিয়ে সমস্ত ফলের বিচার চলে না। হাজার শিক্ষা দাও, সুবিধা দাও, স্বাধীনতা দাও, ভগবান তাদের নীড় বাঁধবার জন্যেই তৈরী করেছে। তর্ক মীমাংসা শ্রুতি স্মৃতি ঘাঁটবার জন্যে বা বা যুদ্ধ করবার জন্যে নয়। এদের মধ্যে যারা তা করেছে বা এখনো করবে, আমাদের দেশের কি অন্য দেশের সেই প্রাতঃস্মরণীয়াদের আমি অমান্য করি না, তাও তো জানো। কিন্তু তাঁরা হলেন সহস্রের মধ্যের বৃহত্তম কটিমাত্র। তাঁদের কোন দেশে কোন কালের নিয়মে কেউ বাঁধতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ নারীদের ভগবান স্নেহদুর্ব্বল স্বভাবদুর্ব্বল করে যে সৃষ্টিই করেছেন। তাদের স্বভাব অতিক্রম করাবার চেষ্টা—তারই নাম সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ করা। একটি সন্তান পালন করতে কি রকম একমনা হতে হয় স্ত্রীলোককে, দেখেছ তো? তা না করে সে স্ত্রী যদি পুরুষের সঙ্গে সকল অধিকারের দাবী করত, তাহলে না হ'ত তার সন্তানপালন, না হ'ত তার গৃহধর্ম্ম। বলবে, পশুপাখীরা তো সমান অধিকারে স্ত্রী-পুরুষেই সন্তানপালন করে—কিন্তু মানবের এই যে গৃহধর্ম্ম, যে গৃহে

বাস করে (তা সে তপোবনের কুটীরেই কি রাজপ্রাসাদেই হোক), যে গৃহাশ্রয়ী মানুষ মনুষ্যত্বে জগতের সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য করছে, সেই গৃহের মেরুদণ্ড স্বরূপেই ভগবান স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা শিক্ষাদীক্ষা বা অন্যান্য সব অধিকারে পুরুষের তুল্য হোক্ ক্ষতি নেই, কিন্তু তারা এই গৃহকে না অতিক্রম করে, তাদের নারীত্ব না ভুলে যায়! তা হলেই ধর্ম্মনাশ হবে। যাক্ —কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম,—তর্কের এই বড় দোষ। তুমি কি তাহলে তারও আবার যদি বিয়ে দিতে পার, তবেই বিয়ে করবে এই মনে করেছ ?"

অনিল সবিষাদে হাসিয়া বলিল, "তর্কে মানুষকে এমনি করে বটে! আমি পুরুষেরই স্বেচ্ছাচার পছন্দ করি না, তা স্ত্রীলোকের, যারা মায়ের জাত! একি তুমিও চিরদিন জান না? কিন্তু যাকে নিয়ে আমাদের এ তর্ক, তার এই নারীত্বই যে কতটুকু আছে, তাই যে সন্দেহ! ধর যদি তার বিয়ে দেওয়াও সম্ভব হ'ত, স্বেচ্ছায় কে তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করত শিশির ?"

"ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অসাধারণ হৃদয়বান শ্রীমান অনিলচন্দ্র !"

"হাঁ শিশির, ঠাট্টা করলেও সত্যই বলেছ। শিক্ষার অভিমান, হৃদয়ের অভিমান যার আছে, সেই তার ভার নিতে পারে—তা ছাড়া আর কেউ নয়। আমায় যদি ভগবান যথার্থ ই শিক্ষিত এবং হৃদয়বান করে থাকেন, তাহলে তাকে ত্যাগ করা নিশ্চয়ই আমার অধর্ম্ম।"

"আচ্ছা, তুমি তোমার হৃদয়নীতিও মান—দেশরীতি শাস্ত্রনীতিও মেনে চলো', আমি মাকে বুঝিয়ে শ্যামলীকে আবার এখানে আনাই। তুমি তাকেও ত্যাগ করো না—আবার উপযুক্ত স্ত্রীও গ্রহণ করো একটি।"

"আহা সে হতভাগী আমাদের কাছে এমন কি দোষ করেছে যে, তাকে তার মার কোল ছাড়িয়ে এই সহায়-সহানুভূতিহীন এখানে এনে আছ্‌ড়ে মারব ?

বিধাতা তাকে যা মেরেছেন সেই যথেষ্ট—আর কেন ?"

"কেন, তুমি থাকবে—তোমার যা করা কর্ত্তব্য মনে করছ তাই করবে।"

"আর একটি উপযুক্ত স্ত্রীও গ্রহণ করব (অবশ্য সে তো রূপেগুণে চমৎকারা হবেই), আবার শ্যামলীর উপরও কর্ত্তব্য পালন করব! কর্ত্তব্য এত সোজা নয় শিশির। কি শ্যামলী, কি যে-বেচারাকে আবার বিয়ে করব, দুজনার উপরেই তাহলে অতি চমৎকার রকম কর্ত্তব্যই পালন হবে। তার ওপরে নিজেকে এত মহাপুরুষ বলে আমার ধারণা নেই, যাতে তখনো আমার শ্যামলীর উপরে উচিত কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান এখনকার মতই থাকতে পারে ভাবতে পারি।"

"তাহলে, তোমার কথা এই যে, শ্যামলীকে ত্যাগ করো, আর গ্রহণই করো, বিয়ে আর করছ না কেমন ?"

"যে একটা স্ত্রীর উপরই যথাকর্ত্তব্য পালন করতে পারলে না, তার আবারও কি বিয়ে করা উচিত ? তুমিও বল দেখি ? ধর যদি সে স্ত্রীটিও অন্ধ কিম্বা কোন গুরুতর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে ? তখনো আমার আরো একটা বিয়ে করা কর্ত্তব্য হবে তো ? তাই মনে করছি যে এই করব আর এই করব না, এ সঙ্কল্পও আর করব না শিশির। যা করব না ভেবেছিলাম, তাও যখন করতে হ'ল—তখন আরও যে কিছু করতে হবে না, তাই বা কে বলতে পারে ?"

"অতদূর না ভেবে সম্মুখে উপস্থিত যে কর্ত্তব্য, তারই সমাধান করো আগে। কুতর্ক ছেড়ে মনে করো যে, এ বংশের প্রথম সন্তান তুমি। তার দায়িত্বজ্ঞানটুকু মনে রেখো, শুধু নিজের হৃদয়কেই সব চেয়ে বড় করো না!"

"বংশের দায়িত্ব ত্যাগ এক যদি বংশরক্ষা নিয়েই বল—তাহলে সলিলের উপর সেইটুকু মাত্র থাক্, বাদবাকী সব আমারই।"

"মায়ের কথাও একবার ভাববে না ? তাঁর যে তুমি সবচেয়ে বড় অনিল!"

"তাঁর তো আমিই থাকলাম। এ শরীর তাঁরই তো। তিনি ইচ্ছে করলে, জোর করলে, এর দ্বারাই সবই তো করাতে পারবেন। একটিকে ত্যাগ করলাম—

আবারও একটিকে অমনি ধর্ম্মসাক্ষী করে গ্রহণও করাতে পারবেন ইচ্ছে করলে। কিন্তু সে অধর্ম্মের ভাগী একা আমিই হ'ব না, এবারে তাঁকেও হতে হবে।"

শিশির কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া শেষে বন্ধুর মুখে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আজীবন তোমার কাছে কাছে আছি, তোমার হৃদয়ের বন্ধু বলেই নিজেকে জানি, কিন্তু আজ বুঝছি—তোমাকে আমিও কিছু জানি না। তাই ভেবে পাচ্ছি না, যেখানে ভালবাসারও কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে মাত্র কর্ত্তব্য আর দয়া কি করে তোমার হৃদয়কে এত বিগলিত করতে পেরেছে?"

"শিশির, ভালবাসার জন্ম যেখানে—সেই হৃদয়েই দয়ারও তো জন্ম! তবে তাকে তোমার ও ভালবাসা থেকে নিকৃষ্ট কিসে ভাবছ? দয়া, স্নেহ, ভালবাসা, একই জিনিসের তারতম্য অবস্থা বই তো নয়! ওর মধ্যে যার উপরে যত অনুশীলন চালাবে, সেইই কি মনের কাছে সব চেয়ে বড হয়ে দাঁডাবে না? আর কর্ত্তব্য যদি তার সঙ্গে থাকে, তার উপরে কেউ তো দাঁড়াতে পারে না ভাই!"

১১

মহা অভিমানিনী অনিলের মাতা শিশিরের নিকটে এবং নিজেও স্বকর্ণে অনিলের বক্তব্য শুনিয়া দারুণ অভিমানে পাথরের মত জমাট হইতে লাগিলেন। ছেলে এই সামান্য ঘটনায় তাঁহার উপর যখন এতখানি অবিচার করিতেছে, যাহাকে সুখী করিবার জন্য মায়ের এ জেদ, তাহা সেই যখন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেই গ্রহণ করিতেছে, তখন তাঁহারই বা কেন এত ঘৃণা? যাক্, অনিলেরও যদি আজ মা না হইলে চলে, তাঁহারও কি চলিবে না? এতখানি বয়সে কোন্

ছেলে আর মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়ায় ? আজ অনিল যদি মায়ের মনঃকষ্টের উপরও তাহার নিজের কর্ত্তব্যকে এত বড় বুঝিয়া থাকে—তাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই সে করুক, মা আর তাহাকে কিছুই বলিবেন না। বিবাহ আর না করে না করুক,—সেই জন্ত স্ত্রীকে আনিয়া ঘর করিতে চায় তাহাই করুক—তিনি আর অনিলের কোন কথায়ই থাকিবেন না। শুধু কথায় কেন—অনিলের সংসারেই আর তিনি থাকিবেন না—তীর্থবাসে চলিয়া যাইবেন।

মহা সোর্‌গোলের সহিত তাঁহার তীর্থ-যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অনিলের কর্ণেও এ কথা প্রবেশ করিল। সে একদিন বাড়ীর সরকারকে সত্য-সত্যই কতকগুলা লগেজ চালান করিতে দেখিয়া বই রাখিয়া মায়ের সন্ধানে গিয়া দেখিল—মা তখন কি একটা কাজ করিতেছেন। তাঁহার রুক্ষ কেশ, শীর্ণ শরীর, বিবর্ণ মুখ দেখিয়া অনিল চম্‌কিয়া উঠিল। এই কি তাহার জগদ্ধাত্রীর মত তেজস্বিনী সদাহাস্যময়ী মা ? অনিল বুঝিল, কোন্ অভিমানের বেদনায় মা এমন হইয়াছেন। অপরাধীর মত অনিল তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা!"

মা চম্‌কিয়া উঠিলেন। অনিলের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র রুদ্ধ বেদনায় তাঁহার মন একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠায় তিনি ত্রস্তে সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র অনিল দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মা, আমি না হয় দোষী, সলিল তো কোন দোষ করেনি ? এ সংসার কেন ছাড়ছ, তাকে কেন ছেড়ে যাচ্ছ ?"

মা সবেগে পা টানিয়া লইয়া অন্য ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সংসারের জন্য, সলিলের জন্য, অনিল তাঁহাকে নিবারণ করিতে আসিয়াছে—নিজের জন্য নয়। মাকে তাহার আর কোনই দরকার নাই!

যাত্রার দিন প্রভাতে সকলে দেখিল—গৃহিণী প্রবল জ্বরে একেবারে শয্যা-গতা। কয়েক দিন-রাত্রি ধরিয়া যে তিনি অনাহারে অনিদ্রায় প্রত্যেক ঘরে

ঘরে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহা কেহ কেহ জানিত। তাই তাহারা গৃহিণীর এই জ্বর আসায় যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গৃহিণী কিন্তু তাহাতেও নিরস্ত হইতে চাহিলেন না,—"আসুক্ জ্বর, আমি যাব। শিশির ঠিক্ হয়ে এসেছে তো?" বলিয়া গৃহিণী শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিবামাত্র একটি চিরপরিচিত স্পর্শ তাঁহাকে সজোরে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বুকে মাথা রাখিয়া ডাকিল—"মা—মা!"

মার সমস্ত শরীর সবেগে নড়িয়া উঠিল, তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "শিশির, শিশির, আমায় নিয়ে চ'—আমায় এখান থেকে নিয়ে চ'—"

"আমাকে ফেলে কোথায় যাবে মা? আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে যাব।"

কিছুক্ষণ পরে মায়ের নিস্পন্দ ভাব বুঝিয়া উদ্বিগ্ন অনিল তাঁহার বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, উত্তেজনার আধিক্যে মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যস্তে-সমস্তে অনিল শিশিরকে ডাকিল—শিশির আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনিল উদ্বিগ্নকাতর দৃষ্টিতে কেবল মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মা যে তাহার অত্যন্ত অভিমানিনী। এ সংসারের এবং পুত্রদের সর্ব্ব বিষয়ে তিনিই যে সর্ব্বেশ্বরী। বিশেষ অনিলকে তিনি যে চিরদিন শিশুর মতই লালন-পালন ও তাড়নাও করিয়া আসিয়াছেন। এত-খানি বয়স এবং শিক্ষা দীক্ষা হইলেও অনিলও তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু জানিত না, তাই মাও তাহাকে এতকাল কোলের ছেলের মতই যেন কোলে কোলে আঁচলের পাশে পাশে রাখিয়াছিলেন। আজ সেই মার উপরে অভিমান করিয়া অনিল যে তাঁহাকে হত্যা করিবারই উদ্যোগ করিয়া বসিয়াছে। অনিলের এই উপেক্ষা তাঁহার এতই বাজিয়াছে যে, তাঁহার অন্য একটি পুত্র কাঁদিয়া অস্থির হইলেও, তাঁহার এত দিনের সাধের গৃহস্থালী একেবারে উচ্ছন্ন যাইবে বুঝিলেও, তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু এতবড় ধাক্কা আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। মায়ের দারুণ অভিমান এবং বিষম

জেদী স্বভাবের কথা অনিল এত দিন কি বলিয়া ভুলিয়া তাঁহাকে এত ব্যথা দিতেছিল ?

কিছুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু মেলিতেই পুত্রের ব্যথিত ব্যগ্র দৃষ্টি মায়ের চক্ষে পড়িল। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন। কাতরকণ্ঠে অনিল ডাকিতে লাগিল, "মা—ও মা—মাগো !" এতক্ষণে মাতার সমস্ত অভিমানাগ্নির উপর যেন কোথা হইতে স্নিগ্ধধারা ঝরিয়া পড়িয়া সে আগুনকে নিভাইয়া দিতে লাগিল। তাঁহারও মুদিত চক্ষু হইতে হৃদয়ের সেই ধারা ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া ত্রস্তে তিনি মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। তখনো কষ্টের স্মৃতি সব ধুইয়া যায় নাই তো !

অনিল জোর করিয়া মাতার মুখের আবরণ খুলিয়া দিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইল। এইবার আর কোন বাধা রহিল না। মায়ের উষ্ণ অশ্রুস্রোতে পুত্রের মস্তক নিঃশব্দে ভিজিতে লাগিল।

পুত্রের যত্ন এবং সেবায় মাতা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অনিল কাশী-যাত্রার সব মোটঘাট খুলিয়া ছড়াইয়া তছ্‌নচ্‌ করিয়া দিল—মাতা নিঃশব্দহাস্যে আবার সে-সব সংসারের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

সলিলকে অনিল বলিল, "তুই কি কোন কর্ম্মের নস ? আগে ভাবতাম, তুই আমার চেয়ে খুব কাজের লোক হবি। এখন দেখ্‌ছি, ফুটবলে কিক্ করা ছাড়া আর তোর কিছুরই যোগ্যতা নেই। মার কাশী যাবার সাজগোছ এতদিন এম্‌নি করে ভেঙে ছড়িয়ে দিতে পারিস্‌নি ?"

"হুঁ—আমি দিলে বুঝি মা আমায় রক্ষে রাখতেন ? তুমি বলে তাই হাসছেন, আমি হলে এতক্ষণ 'সলিল !' বলে এম্‌নি চোখ রাঙা কত্তেন যে আমি কোন্ দিকে পালাব, খুঁজে পেতাম না। তার চেয়ে আমার 'প্লে-গ্রাউণ্ড'ই ভাল, সেখানে যা ইচ্ছে তাই স্বচ্ছন্দে করতে পারি।"

"তাহলে সংসার দেখ্‌বি কি করে রে ? বিষয়কর্ম্ম চালাবি কি করে ?"

"এমনি করেই। এতে বুঝি তুমি আমার বড় কম বুদ্ধি দেখলে!" শিশিরদা তো আমার বুদ্ধির তারিফই করছেন। আমি এক্ষেত্রে মাথা দিলে তোমারও হুঁস্ আস্‌ত না, মারও রাগ পড়ত না, সব গোল হয়ে যেত, তা জান?"

অনিল সলজ্জে হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, যা, তোর খুব বুদ্ধি বোঝা গেছে, আর বেশী বক্‌তে হবে না।"

"আচ্ছা মা-ই বলুন তো, তোমার চেয়ে আমার এক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রকাশ হয়েছে কি না,—মা, ধর্ম্মতঃ বলো কিন্তু।"

মাতা হাসি চাপিয়া কৃত্রিম তাড়নার ছলে বলিলেন, "আবার বক্‌ছিস তোর না সাম্‌নে এক্‌জামিন,—যা পড়তে বস্‌গে, কেবল খেলা আর খেলা!"

সলিল পলাইল। সস্নেহনেত্রে গমনশীল পুত্রের পানে চাহিয়া মা বলিলেন, "সলিল হতেই যদি এ বংশের মান-সম্ভ্রম নামধাম থাকে। চিরদিন ওর উপরই আমার যা ভরসা। ছোট থেকেই ওর সবদিকে সমান বুদ্ধি।"

অনিল কিন্তু ভাল রকমেই জানিত, মায়ের এতদিন ইহাতে মোটেই বিশ্বাস ছিল না। এক অনিল ছাড়া এবং তাহারই বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব ভিন্ন আর তিনি এতদিন কিছুই জানিতেন না। সলিলের নামে—"ও তো এক ফোঁটা ছেলে, ওটা তো পাগ্‌লা, ওর আবার জ্ঞানবুদ্ধি হবে কখনো"—এই রকমই বলিতেন। আজ অনিলের স্বেচ্ছাচারিতাই যে তাঁহাকে সলিলের উপরে আস্থা স্থাপন করাইতেছে, তাহা বুঝিয়া অনিল মাথা নামাইল।

আবার এতদিন যেমন ছিল, তেম্‌নি করিয়া অনিল মাতার অঞ্চল আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু মাতাও বুঝিলেন, ছেলেও বুঝিল, যেমনটি ছিল, তেমন যেন আর হইতেছে না। কোথায় যেন একটা চিড় খাইয়া গিয়াছে, সে ফাঁক আর কোন মতেই মিলিতেছে না।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে এতখানি ফাঁক থাকিলে তো তাহাদের মাতা-পুত্রের

কাহারই চলিবে না। নিজের কর্ত্তব্যবোধ লইয়া অনিলের মায়ের উপর অভিমানে এতখানি দূরে যাওয়া যে উচিত হইতেছে না, তাহা অনিল ক্রমে বেশ বুঝিতেছিল। মাকে বাদ দিলে জীবনে তাহার কি থাকিবে? জগতে যে উভয়েরই আর অন্য আশ্রয় নাই। তাই অনিল একদিন কথা পাড়িল, "মা, তুমি যে তীর্থে যাচ্ছিলে, আমি তা নষ্ট করে দিলাম, এতে কি আমার পাপ হ'ল না?"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "হয়েছে বৈ কি! তোরা কি পাপ-পুণ্য মানিস্?"

"একটু একটু মানি বৈ কি মা! তাই বলছিলাম চলো না, তুমি আমি শিশির একবার বেরোই। তীর্থের কাছে অপরাধটাও খণ্ডন হয়, বেড়িয়ে আসাও হয়।"

মার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, বলিলেন, "তীর্থের কথা মিথ্যে, বেড়াতে চাস্ তাই বল্, কিন্তু সামনে সলিলের একজামিন, এই সময়ে তাকে একা রেখে কি করে দু'জনেই যাব? তার চেয়ে তুই-ই যা বরং শিশিরকে নিয়ে—"

অনিল তাড়াতাড়ি কথা উল্টাইয়া লইল, "বাঃ, তা কি হয়? শিশিরও যে পড়া আরম্ভ করবে। জান মা, আমরা রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পড়তে আরম্ভ করলাম। শিশির এখন আর কিছুকাল বাড়ী যাবে না বলে তাই একবার সকলের সঙ্গে দেখা করতে বাড়ী গেল যে!"

"কি করে জানব—কেউ তো বলনি আমায়! তোমাদের সব কথা এখন আমার তো জানবার উপায় নেই। কোথায় গেল শিশির? শুধু নিজের বাড়ী?"

অনিল একটু অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসির সঙ্গে বলিল, "এই তো সবে আমরা পরামর্শ ঠিক করছি মা। শিশির আগে বাড়ীই গেল—তারপরে অন্যত্রও যাবে।"

মাতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে সনিশ্বাসে বলিলেন, "সে আমাকে মায়ের বেশী বলে জানে, যখনি যা বলি অমনি নিজের সব ছেড়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ায়। সে শ্বশুরবাড়ী যাবে জানলে তার বৌকে আমার কাছে এনে দিতে বল্‌তাম। শিশিরের বৌকে তো আমার দেখা হয়নি, সে কাজ যে আমায় করতেই হবে।"

অনিল একটু থম্‌কিয়া ভাবিয়া বলিল, "তুমি বলো যদি শিশিরকে এ কথা লিখে দিতে পারি।" মুখে এ কথা বলিলেও মনে কিন্তু অনিল ইহার অনুমোদন করিতে পারিল না, কেন-না বিজলীকে দেখিলে মাতা নিশ্চয়ই দ্বিগুণ অশান্ত হইয়া উঠিবেন। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া মাতাও সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ—আমার ওতে কাজ নেই, এ অন্ধকার পুরী এম্‌নি থাক্—এখানে ওসব সাধ-আহ্লাদ সইবে না। সঙ্গী নেই, সাথী নেই, সে ছেলেমানুষ কোথায় আস্‌বে?"

"আমিও তাই ভাবছি মা। আচ্ছা মা, আমাদের সলিলও তো বড় হ'ল, তারও তো এইবার বিয়ে দিতে হবে!"

মাতা মুখ দ্বিগুণ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই অনিল তাঁহার ক্রোড়ের উপর শুইয়া পড়িল। কোলে মুখ লুকাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "সব কথাতেই এমন করে উঠে পালাতে পাবে না তুমি। তোমার যা বলবার আছে, তাও আমায় শুনতে হবে—আমার যা বলবার আছে, তাও তোমায় শুনতে হবে, নইলে এমন করে আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না মা।"

পুত্রের এই কাতরোক্তি মাতার প্রাণে সহসা ছুরির মতই গিয়া বিঁধিল। কি তুচ্ছ অভিমানে তিনি তাঁহার অন্তরের ধনকে এমন পর করিয়া দিতেছেন? ছেলে না হয় একটা খেয়ালই লইয়াছে, তাহার দয়ার্দ্র মন যে ছোট হইতেই এমন কত অস্বাভাবিক রকম ঝোঁক ধরে। পথে কোথায় কোন অন্ধকে, কোন আতুর ভিখারীকে কাঁদিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিয়া শিশু অনিল কাঁদিতে

কাঁদিতে বাড়ী আসিয়াছে, আর একান্ত অসময় হইলেও মাতা পুত্রকে অন্য কোন প্রকারেই সান্ত্বনা দিতে না পারিয়া, অগত্যা সেই ভিখারীকে ভৃত্যের দ্বারা সাহায্য পাঠাইয়াছেন, তবে অনিলের সে কান্না থামিয়াছে। শীতকালে কতদিন সে গায়ের জামা বা শীতবস্ত্র শীতার্ত্ত ভিখারীকে দান করিয়া ভ্রমণ হইতে গৃহে ফিরিয়াছে। চিরকালই তো অনিলের এইসব ঝোঁক তিনি সহিয়া আসিতেছেন। আজ যদি সেই ছেলে আর একটু বেশী কিছু ধরিয়া বসে, মায়ের কি তাহাতে এতখানি রাগ করা উচিত? এতদিন তো অবিবাহিত পুত্র লইয়াই তাঁহার দিন কাটিয়াছে—না হয় আরও কিছুকাল এইভাবে কাটিবে, তারপরে ভগবান যা করেন। কিন্তু সে পরের কথা পরে। তাঁহার কপালে অনিলের স্ত্রীপুত্র লইয়া যদি সংসারসুখ-ভোগ থাকে, তবেই তো তিনি পাইবেন। কিন্তু তাহা পাইতেছেন না বলিয়া সেই ক্ষোভে কি নিজের ছেলেটি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবেন? অনিল ও সলিলকে লইয়া তাঁহার কোন দুঃখই তো এতদিন ছিল না। ইহার অপেক্ষা অধিক সুখের আশায় তিনি এ কি করিতেছেন? একটা বড় সাধের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটায় তাঁহার মনঃপ্রধানস্বভাব পুত্রের মন যদি এখন কিছুদিন বিচলিত থাকে—সেই সময়ে মায়েরও কি উচিত সেই সন্তানকে ত্যাগ করা? তাহাকে মনস্থির করিতে কিছুদিন সময়ও কি দেওয়া মায়ের কর্ত্তব্য নয়? তাঁহার এক ইচ্ছা তো সে পালনও করিয়াছে, না হয় একটু অভিমানই করিয়াছিল, তাঁহাকে তো অমান্য করে নাই?

মাতা এইবার প্রকৃতিস্থ ভাবে বসিয়া পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কি বল্‌বি বল্‌ তুই। মানতে না পারি, সইতে না পারি—পারব না;—তবে কানে শুনব এই পর্য্যন্ত।"

"আমি তো আজ কিছু বলতে চাইছি না মা,—তুমি যা বলবে, আমি তাই কেবল শুন্‌তে চাইছি।"

"কি আমায় আর বলতে বলিস্‌ অনিল? আমার বলবার আর কি আছে?"

"তুমি যাতে সুখী হবে মা, তাই আমায় বলো,—তাই করাও আমায় দিয়ে।"

মাতা যাহাতে সুখী হইবেন অনিল তাহাই করিবে! কিন্তু এ কথা একবার সে ভাবিতে পারিতেছে না যে, মাতার আবার স্বতন্ত্র সুখ কি? অনিলকে সুখী করিতে পারিলেই যে তাঁহার পূর্ণ সুখ। কিন্তু অনিল নিজে হইতে মাতাকে আজ স্বতন্ত্র করিয়াছে বলিয়াই তাহার এ ভ্রম হইতেছে। অভিমানিনী জননী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমার সুখের জন্য তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না অনিল। তুমি যাতে ভাল থাকো, তাই করো।"

মাতার ক্রোড়ের মধ্যে আবার মুখ লুকাইয়া ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে পুত্র বলিল— "আমায় মাপ করো মা,—আর অমন কথা বলো না—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

জননী আবার অনুতাপিতা ও ঈষৎ যেন লজ্জিত হইয়া অনিলের মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মায়ের সেই আদর ভোগ করিয়া অনিল আবার ডাকিল—"মা!"

মা গাঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "অনি!"

"বলো!"

"কি বলব রে?"

"কি করব আমি?"

"আমি বললে তবে তা তুই বুঝবি?"

"হ্যাঁ মা।"

"কেন অনি! এ তো সকলেই সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে পারে।"

"আমার যে বুদ্ধি কম মা, তুমি তো চিরদিনই জানো।"

"তোকে সুখী করা ছাড়া আমার আবার আলাদা সুখ আছে কি কিছু?"

"আমাকে সুখী? কি রকম দেখলে আমায় তোমার সুখী বোধ হবে?"

"সকল ছেলের মা নিজের ছেলেকে যেমন দেখলে সুখ বোধ করে।"

"মা, এ কি তোমার মতন মার ঠিক কথা হচ্ছে? তুমি তো আমাদের

দেশের সেকালের মা'দের মত জগতের কিছু জাননা, তা নয়! কোন মা নিজের ছেলের খুব ধন হলে ছেলে সুখী হবে মনে করে, কেউ বা ছেলেকে দশের মধ্যে একজন হয়ে সুখী দেখতে চায়। এমনি কেউ বিদ্বান, কেউ ধার্ম্মিক, কেউ জ্ঞানী ছেলে চায়। কেউ ভাবে যে, আমার ছেলে দশের দুঃখ দূর করুক, আবার কেউ চায় যে, ছেলেটি মাত্র আত্মসুখপরায়ণ হোক। সকল মার মন তো সমান নয়। তুমিই এতদিন নিজের ছেলেকে কি চেয়েছ মনে করে ছাখো। যাক্ সে কথা— আজ তুমি তোমার ছেলেকে কি রকমে সুখী দেখতে চাও মা—তাই মাত্র আমায় স্পষ্ট করে বলো।"

মাতা এইবার অধোবদন হইলেন। তাঁহাকে বহুক্ষণ নিরুত্তর দেখিয়া অনিল স্নিগ্ধনেত্রে মাতার পানে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল—"মা, বলো, তোমার ছেলেকে আজ কি রকম চাও তুমি?"

"বলি" বলিয়া তিনি পুত্রের চক্ষের পানে স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া আবার বলিলেন—"আমি যেমন চাইব তেমনি হতে পারবি তো? ঠিক করে ভেবে ছাখ্।"

পুত্র ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিয়া একখানি হস্তে মাতার একখানি পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ করো যেন পারি।"

পুত্রের হস্ত পায়ে ঠেকিতেই আস্তেব্যস্তে মা "ওকি ষাট" বলিয়া হাতখানি টানিয়া সরাইয়া লইলেন এবং মুখ নত করিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "এমন পাগলও আমি পেটে ধরেছি!"

"হ্যাঁ মা,—সেই পাগলকে আবার আশীর্ব্বাদ করো, যেন চিরদিনের নির্ভর তার আর না হারায়!"

মাতা অপলকনেত্রে সেই মুদিতচক্ষু পুত্রের উদার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার জঠর হইতে জন্মগ্রহণের পরই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত অরুবাণ অনিল যেমন ভাবে তাঁহার ক্রোড়ে শুইয়া থাকিত,—এই দীর্ঘ

চব্বিশ বৎসর সে যেমন করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকে—তেমনি মুখে তেমনি ভাবে আজও রহিয়াছে। সেই ললাটে তাহার জ্ঞানের ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রসারতা-চিহ্ন, দেবশিশু-তুল্য মুখশ্রীতে উদার উন্নত স্বভাবের পরিচয়, ওষ্ঠাধরের পার্শ্বে দয়াস্নেহের কমনীয় ভঙ্গী, বিস্তৃত বক্ষে মহৎহৃদয়ের প্রসারতা,—সেই অনিল তাঁহার সেই সন্তান—যাহার জন্য সকলে তাঁহাকে রত্নগর্ভা নাম দিয়াছে—সেই পুত্র তার আজ, মায়ের তৃপ্তির জন্য নিজের উন্নত-হৃদয়ের বিবেকবাণীকেও খর্ব্ব করিয়া মা যাহা বলেন, সেই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। আজ সে সন্তানকে তাহার মাতা কি বলিবেন? মায়ের অন্তর আজ যাহা চাহিতেছে, মাযের স্নেহের চক্ষে এবং সাধারণ ন্যায়ের চক্ষে তাহা হয়ত অকর্ত্তব্য নয়; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ পুত্রটি, যাহার গর্ব্বে তিনি সকলের কাছে বিশেষভাবেই গর্ব্বিত, সেই পুত্রকে আজ সাধারণের দলে ফেলিয়া তিনি কোন্ প্রাণে খর্ব্ব করিবেন? তাঁহার মাতৃত্বের গর্ব্বও কি আজ এ ছেলের কাছে তাহাতে খণ্ডিত হইবে না? ছেলে যে জানে, তাহার মা সাধারণ মায়ের মত স্নেহান্ধ মা নয়। তাহার মা জানেন, তাঁহার ছেলেকে তুচ্ছ সাংসারিক সুখের অপেক্ষা তাহার হৃদয়বাণী পালন করার সুখ দিলেই তাহাকে যথার্থ সুখী করা হইবে। ছেলের সুখেই মা যে সুখী হয়, অনিলের সুখ ছাড়া তাঁহার সুখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—তিনি না এখনি অনিলকে বলিয়াছেন! কিন্তু তিনি যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কি অনিলের হৃদয় সায় দিবে, না তাহাতে এখন সে স্বেচ্ছায় সম্মত হইবে? সত্যই যদি অনিলের সুখে তাঁহার সুখ হয়, তাহা হইলে তিনি সে ছেলেকে কর্ত্তব্যহীনতার অসুখে কেন ফেলিতেছেন? এ কি তাঁহার নিজেরই স্বতন্ত্র সুখ খোঁজা হইতেছে না? ছেলের মাথা কোলে লইয়া নিজের মনের কাছে তিনি একি মিথ্যাচারণ করিতেছেন? বহুক্ষণ পরে তিনি সহসা পুত্রকে বলিলেন, "তুই কিসে যথার্থ সুখী হ'স তাই আগে আমায় বল্ আজ।"

ম্লান হাসি হাসিয়া অনিল বলিল, "তুমি আজ তা আমায় জিজ্ঞাসা করে জানবে মা ?—কিন্তু সে কথা নয়, আমি যে বলছি—তুমিই আজ ঠিক্ করে দেবে, কি হলে আমি সুখী হবো।"

অনায়াসে তিনি এখন পুত্রকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন! কিন্তু মায়ের মুখে এখন আর কিছুই ফুটিতে চাহিল না।

বহুক্ষণ পরে—"মা—কি ঠিক করলে ?"—পুত্রের এই প্রশ্নে সংজ্ঞা পাইয়া মাতা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তুই যেমন আছিস্, তেমনি এখন থাক্ তো আমার কোলে,—পরে দেখা যাবে।"

ছেলে একটু যেন সানন্দোচ্ছ্বাসে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে একটু ঘুমোই—মা ? ঘুম পাচ্ছে।"

মা বলিলেন, "ঘুমো।"

১২

সমুদ্রের গভীর তলে যাহার বাস, সে যদি প্রবাল-কাননের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মাঝে চিরকাল স্থান পায়, তথাপি সময়ে সময়ে নিজের তেমন বাসও ত্যাগ করিতে সে উৎসুক হইয়া উঠে কেন ? কারণ, সেও কখনো কখনো নূতনত্ব চায়। কেবল মাত্র একরকম দৃশ্য দেখিয়া ও একস্থানে বাস করিয়া তাহার চোখ ও প্রাণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই নিকৃষ্টতর জীবের চেয়েও যাহার অবস্থা শোচনীয়, যেখানেই থাক্, যাহার চারিদিকে শব্দহীন অনন্ত নিস্তরঙ্গ সর্ব্ব জন্য গম্ভীরতম তলের নিস্তব্ধতা ঘিরিয়া আছে, তাহাকে সেই নূতনত্বটুকু শ-বাতাসের

সাধ্য প্রকৃতির কোথায়! কিন্তু হায়, তবু যে মানুষ হইয়াই জন্মিয়াছে তাহার মানুষের মন যে কোন না কোন সময়ে নিজের দাবী উপস্থিত করিবেই! অজ্ঞানের যত অন্ধকারেই সে লুকানো থাক্, ঘুমাইয়া থাক্—সেই যে গুহাশায়ী মন—সে তো মানুষকে একদিন না একদিন দেখা দিতে ছাড়িবে না। পাঁচটা ঘোড়ার একটার অভাবে তাহার রথ নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম করিলেও একদিন না একদিন তা লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবেই।

শ্যামলী অনুভব করিতেছিল, তাহাদের সংসারে কি যেন নূতন একটা কি আসিয়া ঢুকিয়া এতদিনের সব ধারা উল্টা-পাল্টা করিয়া দিয়াছে। পিতার রুক্ষতা, ভগ্নীর কঠিন মুখভঙ্গী এখন একেবারে এমন কোমল হইল কি করিয়া, ইহা তাহাকে প্রথমে আশ্চর্য্য করিযা তুলিতেছিল। মা তো তাহার চিরদিনের মা, বরং তিনিই একটু কঠিন ভাবে তাহাকে সংসারের হিতাহিত-বোধ ও কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য শিখাইতে চেষ্টিত রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার পিতা ও ভগ্নীর চোখে, মুখে এবং ব্যবহারে তাহার উপরে এতখানি সহানুভূতি ও করুণা সে যেন ইতি-পূর্ব্বে আর কখনো অনুভব করে নাই। তাহাদের সংসারে আর-একজন আত্মী-য়েরও বৃদ্ধি হইয়াছে—সে শিশিব। বিজলী যে তাহাকে দেখিযা মাথায় কাপড় দিয়া পলায়, তাহার উপস্থিতিতে বিজলীর মুখে যে সলজ্জ রক্তরাগ ফুটিয়া উঠে, তাহাতে শ্যামলী বুঝিয়াছে যে, শিশির বিজলীর স্বামী,—তাহার ভগ্নীপতি, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে তাহাদের বাটীতে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নাম বিবাহ। এই স্ত্রীপুরুষে বিবাহ হওয়াটা সে ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক দেখিয়াছিল। বর-বৌ লইয়া অন্যান্য ছোট মেয়েরা যেমন আনন্দ করে, তাহার দৃষ্টান্তে সেও এখন শিশিরকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বিজলী শিশিরের নিয়োমনে পড়িলেই সে বিজলীর পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহার মাথার কাপড় সহসা পুত্র দিয়া বালিকার ন্যায় করতালি দিয়া হাসে, বিজলীর সলজ্জ ভ্রূকুটী বা আজ। ন না এবং ভগ্নীর সে ভ্রূকুটীতে যে পূর্ব্বের ন্যায় বিরক্তি মিশানো

নাই, তাহা শ্যামলীরও বুঝিতে বাকী থাকে না। শিশিরও শ্যামলীর এ খেলায় সানন্দ হাস্তে যোগ দেয়। এই নব আত্মীয়টি যে তাহাকে সস্নেহ সম্ভ্রমের চোখেই দেখে, তাহাও শ্যামলী বুঝিতে পারে, তাই শিশির আসিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। আবার শিশির যখন বিজলীকে লইতে আসে, তখন সে ক্ষুব্ধ হইয়া ইঙ্গিতে শিশিরকে নিবারণ করিতে চাহে এবং বিজলী চলিয়া গেলে কাঁদিয়া অস্থির হয়। আবার কিছুকাল পরে বিজলী ফিরিয়া আসিলে শ্যামলীর আনন্দের সীমা থাকে না। এখন যে মাঝে মাঝে শিশিরও আসিবে, তাহা সে নিশ্চিত জানে এবং সেই নবলব্ধ আনন্দের আশায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বিলম্ব হইলে ইঙ্গিতে বিজলীকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। বিজলী দু-এককার সলজ্জ ভ্রূভঙ্গী করিয়া শেষে ইঙ্গিতে তাহার কারণও বুঝাইয়া দেয়। শিশির আসিলে শ্যামলী দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহার পান জল সরবরাহ করিতে ছুটে, মায়ের হাত হইতে জলখাবার তৈয়ারীর ভারও লইতে চাহে। পাড়ার এক ঠাকুরুণদিদি শিশিরকে তামাসা করিবার জন্য একবার পানের ডিবায় আরসুলা পুরিয়া এবং ঐরূপ আরও গোটাকতক বহুপ্রচলিত পুরাতন ঠাট্টা চালাইয়াছিলেন। শ্যামলীর সেই হইতে শিশিরকে প্রতিবার সেই ঠাট্টাটি করাই চাই! তাহার আমোদ বুঝিয়া শিশিরও তাহাতে এমন সন্ত্রস্ত ও ভীত ভাব দেখায় যে, শ্যামলী তাহাতে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে।

এই হতভাগ্য প্রাণীটির মধ্যের ঘুমন্ত স্নেহবৃত্তি যে এইরূপে ক্রমে জাগিতেছে, তাহা শিশিরও বুঝিতে পারে এবং অনিলের কথা মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়া যায়। শ্যামলীর মুখে, চোখে, কাজে, ভগিনীর স্নেহ, বন্ধুর বা সঙ্গীর সঙ্গলিপ্সা যে ক্রমেই ফুটিতেছে, তাহা শিশির লক্ষ্য করে। যে এতদিন জড়ের মত ছিল, মাতাপিতার স্নেহ তাহার যে স্বভাব দূর করিতে পারে নাই, একজন সম্পূর্ণ পরের অভ্যুদয়ে সেই জড় ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠিতেছিল। শিশিরের জন্য সে কাজ করিতে পর্য্যন্ত শিখিতেছে, আর এখন সে সব সময় আকাশ-বাতাসের

জন্য হাঁ করিয়া চোখ পাতিয়া পড়িয়া থাকে না, ঘরের কাজ শিখিবার জন্য মায়ের ভগিনীর সঙ্গ ধরে। একদিন সে মাতাকে জামাতার জন্য রেশম-পশমের জুতা, কম্ফর্টর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে দেখিয়া এবং বিজলীকেও মাঝে মাঝে মায়ের আদেশে তাহাতে যোগ দিতে দেখিয়া নিজেও বুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। মা প্রসন্ন মুখে তাহাকে সেলাইয়ের অক্ষর পরিচয় করাইতে লাগিলেন এবং অসীম ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যহই তাহাকে লইয়া শিখাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু শ্যামলী কাজকর্ম্ম যেমন শিখিতেছিল, এ বিষয়ে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব চোখদুটিকে অতক্ষণ যে ঐ সামান্য সুতানাতায় আবদ্ধ রাখিতে পারে না। শব্দহীন অতলে যাহার বাস, সে মনের অতল গুহায় ডুবিতে কোন মতেই সাহস পায় না, প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠে। একটু পরেই সে-সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া 'আঃ' ভাবিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে; বোনের অনুপম মুখ-খানির পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসে; তার পরেই একছুটে ছাদে পলাইয়া সেই নীল ও সবুজের রাজ্যে তাহার ক্লান্ত মন ও চক্ষুকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়ে।

সেবার বিজলীকে শিশির লইয়া গেলে সে বড়ই কাঁদিল এবং মনমরা হইয়া রহিল। সহসা একদিন তাহার মা গম্ভীর মুখে তাহার হাতে একখানা ছবি দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শ্যামলী বিস্মিত ভাবে ক্ষণেক ছবিটির পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে যেন কি একটা মনে পড়ায় একটু বিচলিত ভাবে মায়ের পানে দৃষ্টি ফিরাইল। তাহার চক্ষু দিয়া মাতাকে যেমন চিরদিনই সে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করে, তেমনি আজও করিল—"এ কে মা? একে যেন চেনা বলে বোধ হচ্ছে! এ কার ছবি—আর কেনই বা তা আমায় দিলে?"

মাতা তখন শ্যামলীর মাথার কাপড় তুলিয়া দিলেন—ছবির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সেই মাথার কাপড় বেশী করিয়া টানিয়া ঘোমটা করিয়া দিলেন। শ্যামলী বুঝিল। যেন অবাক্ হইয়া স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ ধরিয়া সে সেই

ছবিখানি দেখিল। সেই যে দিনকতক সে মা-ছাড়া হইয়া ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছিল—সেই সময়ে মাঝে মাঝে যাহাকে দেখিতে পাইত, এই সেই লোকটা। তার ছবি মা কোথায় পাইলেন? আর সেই রাত্রে—হ্যা—মনে হইতেছে—শিশিরের পাশে বিজলী ঘোমটা দিয়া বসিবার আগে তাকেও বোধ হয় এই লোকটার পাশেই তেমনি ভাবে তাহার বাবা বসাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার বাবাকে সকলে যখন মারিতে যায়—এই-ই সকলকে থামাইয়াছিল। তাহার বন্দীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে যে এখানে রাখিয়া গিয়াছে, সেও এই। আরও এমনি গোটাকতক কথা শ্যামলীর মনে পড়িল। কিন্তু এ ছবিতে কি হইবে? এ দেখিয়া লাভ কি?

মাতা কন্যার নিষ্প্রভ চক্ষের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার হস্ত হইতে ছবিখানা টানিয়া লইলেন এবং সম্মুখের দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিতে গিয়া আবার ক্ষণেক স্নেহশ্রদ্ধা মিশ্রিত অনিমেষদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু পূরিয়া উঠিল। সহসা ছবিখানা শ্যামলীর ললাটে ছোঁয়াইয়া অতি যত্নের সহিত কাগজে মুড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। শ্যামলী অবাক্ হইয়া মাতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এই লোকটা যেদিন এখানে তাহাকে রাখিতে আসে এবং চলিয়া যায়, মায়ের সেই দিনের মুখভাব এবং রোদন তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহাকে মা খুব ভালবাসেন। কিন্তু তাহার ছবি তাহার মাথায় ছোঁয়াইলেন কেন?

মাতা তখন সেই বাক্স হইতে অতি আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর সুন্দর কতকগুলো ছবি বাহির করিয়া শ্যামলীর হাতে দিতে, শ্যামলী আরও বিস্মিত হইয়া পড়িল। এমন সুন্দর ছবি তো জীবনে সে কখনো দেখে নাই! এ কি রংকরা তুচ্ছ ছবি যেমন সে প্রত্যহ যেখানে-সেখানে দেখিতে পায়? না, এ তো তাহা নহে। আকাশে সে যেমন কালো কালো মেঘের উত্তুঙ্গস্তূপ দেখিতে পায়—পৃথিবীর বুকেও সেইরূপ সুকৃষ্ণ শিখর-সমন্বিত দুর্লভদর্শন এ-সব কি বস্তু?

তাঁহার গায়ে কত কত গাছের লতার মালা—ফুলের শোভা! পদতলে কত স্রোতোধারা! কত বিচিত্র ভঙ্গীতে, কি ফেনোচ্ছলগতিতে, কোথাও সঙ্কীর্ণ খাতে, কোথাও বা প্রসারিত ধারায় বহিতেছে! কোথাও তাহারা আবার সেই সু-উচ্চ শিখর হইতে সতেজে বহু নিম্নে লাফাইয়া পড়িতেছে! সে দৃশ্য কি উত্তেজক, কি চমৎকার! দেখিতে দেখিতে উৎসাহে শ্যামলীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ সোৎসাহে সপ্রশ্নে মাতার প্রতি চাহিতে লাগিল—"এসব কিসের ছবি মা? কোথায় পেলে? কে দিলে? কি সুন্দর, ওগো ছাখো ছাখো! আমি নেব মা, আমায় দাও এ ছবিগুলো।" মাতার মুখে তো কই আজ শ্যামলীর এত আনন্দেও আনন্দের হাসি ফুটিল না। মা সেই একই রকম বিষাদমন্থর ভাবে বাক্স হইতে সেই লোকটার ছবিখানা বাহির করিয়া ইঙ্গিতে শ্যামলীকে বুঝাইলেন, এই ছবির লোকটি তাহাকেই এই ছবিগুলি পাঠাইয়াছে। বেশ তো, সে তো খুব ভাল লোক! কিন্তু এতে মা কেন এত দুঃখিতভাবে রহিয়াছেন এবং এমন সব ছবি ফেলিয়া ঐ ছবিখানাই একশবার কেন দেখিতেছেন—ইহাতেই শ্যামলীর একবার একবার কেমন যেন বোধ হইতে লাগিল! অন্য ছবি দেখার আনন্দের চেয়ে শ্যামলী যদি ঐ লোকটার ছবি দেখিয়া বেশী সুখী হইত, তবেই যেন মা খুশী হইতেন, মায়ের ভাবে এটুকু শ্যামলী ক্রমে বুঝিতে পারিল এবং মার বেদনাভরা মুখচোখের পানে চাহিয়া ছবি পাওয়ার আনন্দে শেষে সে যেন একটু নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। মা তাহার আদর-প্রাপ্ত ছবিগুলো তাহাকে দিয়া বাকী সেইখানা বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন। এই মূকজগতে যাঁহার প্রত্যেক ভঙ্গী শ্যামলীর অর্দ্ধবিকশিত জীবনের সম্বল, তাঁহার এ ভাবে হতভম্ব হইয়া শ্যামলী ক্ষণেক বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহা কিছুক্ষণ মাত্র। হস্তের চিত্রগুলার পানে ক্রমে আবার তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইল এবং প্রকৃতির সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যে প্রকৃতির চিরশিশু সে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

মাতার ঘন ঘন অসুস্থ হওয়ার সংবাদে সেবার বিজলী একটু শীঘ্রই পিত্রালয়ে আসিল। শিশিরই তাহাকে রাখিতে আসিয়াছিল।

শিশির আসিলে শ্যামলী আনন্দে অধীর হয়, এবারও হইল, কিন্তু কেমন যেন ততখানি স্ফূর্তি প্রাণে আসিল না। সে তুচ্ছ রসিকতাগুলার সে একটাও এবার করিতে পারিল না, বেশী হাসিতেও যেন পারিল না। শিশির তাহার এই ভাবান্তরে দু-একবার শ্যামলীর পানে চাহিল।

বিজলী শ্যামলীর প্রতিদিনের নাড়াচাড়ার সেই চিত্রগুলা দেখিল, প্রশংসায় তাহার চোখও উজ্জ্বল হইল বটে, কিন্তু তারপর সেই ফটোখানা হাতে লইয়া সেও গম্ভীরমুখে কতক্ষণ দেখিল। যখন সেখানা বিজলী মাতার কাছে ফিরাইয়া দিল, তখন তাহারো মুখে তেমনি কাতরতার চিহ্ন অজ্ঞাতে শ্যামলীকেও যেন একটু কাতর করিল। সেও মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিজলীর বর শিশির। সে যে কতবার আসে, কত আনন্দ করে, বিজলী তাহাকে দেখিলে লজ্জায় ছুটিয়া পালায়, ঘোমটা দেয়, কিন্তু আড়ালে সে শিশিরের সঙ্গে কত হাসে, নানাছলে কত নিকটে যায়, দুইজনে চোখোচোখি হইলেই তাহাদের মুখে চোখে কি হাসির লহর খেলিয়া যায়, কি আনন্দের আলোই ফুটিয়া উঠে! শ্যামলী এবারে এগুলো লক্ষ্য করিতেছিল আর তাহার সেই লোকটাকে মনে পড়িতেছিল। সেও যখন তাহার বর—তখন সেই বা এমন করিয়া আসে না কেন? পাড়ার যে যে মেয়েকে সে জানিত, তাহাদের বিবাহ এবং বিবাহের অব্যবহিত পরে পিত্রালয়ে বাসের সময়ে তাহাদের বরের সহিত প্রথম পরিচয়ের এইরূপ কিশোরীলীলা যাহা শ্যামলী দেখিয়াছে, সেই ছবিগুলা যে এখন তাহার

স্মৃতির দর্পণে ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। তখন যে মূঢ়ের মত কেবল দেখিয়াই গিয়াছে, অর্থও বোঝে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ বিজলী ও শিশিরের প্রত্যেক দৃষ্টি, প্রত্যেক ভঙ্গী, প্রত্যেক হাসি তাহার অন্তরে নিখিলের নরনারীর এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের রহস্যোদ্ভেদ করিয়া দিতেছিল। এই জগতে সকলকে দেখিয়া তো সকলে অমন হয় না, এমন হাসে না, এমন ভাবে চায় না! কেবল মাত্র দুইজন—তাহারা দু'টি বর-বৌ—যাহারা শিশির আর বিজলীর মত দু'টি, তাহারাই পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া এমন হয়! শ্যামলী লক্ষ্য করিতেছিল—বিজলীর সমস্তটাই যেন সর্ব্বদা শিশিরের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে রুগ্না মাতার সেবা করিতেছে, পিতার তত্ত্বাবধান করিতেছে, তবু শিশিরের পান জল এবং যখন যাহা প্রয়োজন তাহার দিকে যেন তাহার স্থির লক্ষ্য আছেই। শুধু কি তাই? শিশিরের জন্য যখন বিজলী কাজ করিতেছে, তখন শ্যামলী অবাক হইয়াই বিজলীর মুখের পানে চাহিত। সে সুন্দর মুখে তখন কি যে একটা ভাব দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিত তাহা শ্যামলী বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার মনে পড়িল, যখন শিশির না থাকে, তখন তো বিজলী এত আনন্দের বিজলী খেলাইয়া এমন করিয়া বেড়ায় না। এই যে তাহার চোখ—সর্ব্বদা যেন শিশিরের চোখের দৃষ্টির প্রতীক্ষাতেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চঞ্চল, আবার তখনি চোখোচোখি হইবামাত্র আনন্দে সুখের লজ্জায় স্থির বিভোর হইতেছে! অকারণে ওষ্ঠে হাসি লাগিয়া আছে, বিজলী যেন একটা অসীম সুখে সর্ব্বদা ডুবিয়াই রহিয়াছে! এমন ভাব তো শিশির এখানে না থাকিলে তাহার থাকে না। শ্যামলী বুঝিতে পারিতেছে, শিশির আসিয়াছে বলিয়া, সে নিকটে আছে বলিয়া, তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছে বলিয়াই বিজলীর এত সুখ! শিশির যে বিজলীর বর! শ্যামলীরও তো বর আছে। সেই, সেই লোকটি, যাহার কাজ আর কয়টা দৃষ্টি শ্যামলীর এখন বেশ উজ্জ্বল ভাবেই মনে পড়ে। সে যখন তাহার বর, তখন সেও কেন আসে না? তাহা

হইলে বিজলীর মত—পাড়ার তাহার চেনা মেয়েদের মত—সেও এমনি করিয়া বুঝি হাসিতে সাজিতে কাজ করিতে পারিত। এদের মত এমনি আনন্দই বুঝি তাহারও হইত। কিন্তু আসে না—সে তো কৈ আসে না! কেন আসে না?

ঐ যে ছবিগুলা, সেই পাঠাইয়া দিয়াছে—তাহাকেই দিয়াছে, কিন্তু কেন? যদি সে আসিবেই না, তবে কেন পাঠাইয়াছে? ভয়ানক রাগ হইতেছে। আর শ্যামলী ও ছবিগুলা লইবে না—দেখিবে না—না, কিছুতেই না। একদিন বেশ করিয়া ওগুলি ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিবে, যদি কখনো সে আসে তাহাকে দেখাইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর একটা নিশ্বাস বহিল, সে যদি আর না আসে!

তাহার ছবি মার কাছে আছে—মার বাক্সের ভিতর। বের করে নিলে মা যদি জানতে পারেন? এ চিন্তায় শ্যামলীর অন্তরটা কেমন যেন কুঁকড়াইয়া গেল। কেহ চাহিলে দেখিতে পাইত, লজ্জায় তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। না, মা জানিতে পারিলে লইতে পারিব না—কিছুতেই না।

কিন্তু শ্যামলী নিজেই অবাক হইয়া দেখিল, একদিন সে মাতার অজ্ঞাতে ছবিখানা বাহির করিয়া লইয়াছে! বার বার মনে হইল রাখিয়া দেয়—মা জানিলে তাহার বড় কেমন বোধ হইবে—না, তাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু তবু একবার লুকাইয়া ছবিখানা ছাদে লইয়া না গেলেই তো নয়! শ্যামলী যাহা অনুভব করিত, ভাবিত, ছাদে বসিয়া তাহা বার-কত উল্‌টি-পাল্‌টি করিয়া চিন্তা না করিলে, সেটা ভাল করিয়া তাহার বোধগম্য হইত না।

এই ছবি তার? এমনিই তো সে? ঠিক। এই চোখ, এই মুখ—এই দৃষ্টি, এমনি চেহারা—ঠিক সেই বটে! কিন্তু যখন মানুষটাকে শ্যামলী দেখিয়াছিল, তখন তো এমন লাগে নাই? বরং কত রাগ, কত বিরক্তি, কত অবিশ্বাসই আসিয়াছে। একদিনও তো চোখ তুলিয়া লোকটা কেমন তাহা দেখিতেও ইচ্ছা করে নাই। আজ তাহার ছবিটামাত্রও দেখিতে এমন লাগিতেছে কেন?

ভাল? ভাল কি মন্দ তাহা শ্যামলী জানে না—কিন্তু আর কোন ছবি দেখিয়া জীবনে তো তাহার এমন বোধ হয় নাই। সেদিন যে কত সুন্দর সুন্দর ছবি সে পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাহা দেখিয়া, তাহা পাইয়া শ্যামলীর যেমন আহ্লাদ হইয়াছিল, এ ছবি দেখিতে তো তেমন কিছু আনন্দ হইতেছে না, অথচ যাহা হইতেছে তাহা বুঝি শ্যামলীর অননুভূতপূর্ব্ব বস্তু! শ্যামলীর এই ছবি দেখা পাছে কেহ দেখিতে পায়, সে লজ্জাতেও শ্যামলী অন্তরে অন্তরে কুণ্ঠিত হইতেছে। চোরের মত মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাহিতেছে, অথচ না দেখিয়াও তো থাকিতে পারিতেছে না। তাহার মুখ এমনি? এই ছবির মত? এত সুন্দর? আর চোখ? চোখের কথা মনে নাই, কিন্তু দৃষ্টি—হ্যাঁ, দৃষ্টিটা শ্যামলী বেশ চিনিতে পারিতেছে। এমনি বটে। এমনি তা যেন অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়া পাষাণকেও গলাইয়া ফেলে! এ দৃষ্টি তো শ্যামলী কয়বার দেখিযাছিল—দেখিয়া যেন তাহার উদ্ধত হৃদয় সহসা এক-একবার থম্‌কিয়া গিয়াছিল—কিন্তু এমন করিযা তো তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু শ্যামলীর আজ ছবিখানা দেখা শেষ হইল না। কিন্তু পাছে মাতা ভগ্নী তাহার সেই ছবি দেখা ধরিয়া ফেলে, সেজন্য আর বেশী-ক্ষণ সে ভাবে থাকিতেও সাহস করিল না। ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া বিমনা ভাবে অন্য কার্য্যে চলিয়া গেল। কিন্তু পরদিনই আবার ছবিখানা তেমনি করিয়া ছাদে লইয়া গেল। মা-বোনের সামনে কুণ্ঠার ভাবও তাহাব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। শাশুড়ীব ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য শিশির বিজলীকে রাখিয়া চলিযা গেল। এই বিচ্ছেদে বিজলীকে যে কিরূপ কাতর করিয়াছে, শ্যামলীর তাহা বুঝিতে একটুও এবার বাকী থাকিল না। সে উৎসুক নেত্রে ভগিনীর প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য করিত। বিজলী যখন উন্মনা ভাবে কোথাও বসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, শ্যামলী বুঝিত সে শিশিরের কথা ভাবিতেছে। যে দিন শিশিরের পত্র আসার সম্ভাবনা থাকে, সেদিন বিজলীর উন্মনা ভাব শতগুণে বৃদ্ধি পায়,

সে যেন প্রভাত হইতে পথেই দাঁড়াইয়া থাকে, শতবার ঘর আর বাহির করে। তারপরে ব্যাগ ঘাড়ে একটি লোক দ্বারের নিকটে আসিয়া একখানা লেখা খাম ফেলিয়া দিয়া যায় আর বিজলী যে কি করিয়া সেই খামখানা কুড়াইয়া লয়—খামের ভিতর হইতে কত আঁচড়-পাঁচড়-কাটা একটা সাদা কাগজ বাহির করিয়া লইয়া চোখের নিকট ধরে, আর তাহার মুখ শিশিরের চোখের সামনে যেমন সুখে আনন্দে জল্‌জল্‌ করিতে থাকে, তেমনি জলজ্বলে হইয়া উঠে। শ্যামলী অবাক্‌ হইয়া তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখে। শিশির এই কাগজখানায় এমন কি পাঠাইয়াছে (এবং কি প্রকারেই বা তাহা পাঠাইল) যাহা পাইয়া বিজলী এমন আনন্দ বোধ করিতেছে! মানুষটাকে দেখিতে না পাইলেও, নিকটে না পাইলেও, এইরূপ এক-একখানা কাগজ আসিয়া কি এমনি করিয়া সব দিতে পারে? শিশির যেমন বিজলীর দূরে আছে, তেমনি শ্যামলীর স্বামীও তো দূরে আছে, তবে সেও কেন শ্যামলীকে অন্ততঃ এইরূপ একখানা একখানা কাগজও পাঠায় না? এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্যামলীর আবার কেমন যেন নিজেকে কোন একটা কিছুর অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। ঐরূপ এক-একখানা কাগজ পাইলে সে কি বিজলীর মত অমনি তাহাতে সব পাইবে? না, তাহা তো পাইতে পারিবে না। কাগজের আঁচড়-পাঁচড় কি আনিতে পারে, তাহা তো সে এখনও বুঝিতেই পারিতেছে না! ঐ ছবিখানায় যাহা আছে তাহা কি একটা কাগজের আঁচড়ে থাকিতে পারে? বিজলীর কাছে আছে—কিন্তু তাহার কাছে যে নাই! তাহার কি যেন নাই—তাই তাহার সকলের মত সব পাওয়া ঘটে না, দেওয়াও চলে না—কিন্তু কি নাই,—কি জন্য নাই? কিসের তার অভাব যার জন্য সে সকলের মত নয়? সকলের মত সহজে সে যে নিজের ভাব অন্যকে জানাইতে পারে না এং অন্যেও তাহাকে বুঝাইতে ক্লেশ পায়, তাহা সে এখন বুঝিতে পারে। মাত্র ঠোঁট নাড়িয়া তাহারা পরস্পরের ভাব বুঝে, কিন্তু তাহাকে কিছু বুঝাইতে হইলে তাহারা

বিব্রত হইয়া পড়ে। আছে, তাহার কি একটা গভীর অভাবই আছে। তাই সেও ক'খানা ছবি পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত, একবার আমার কথা বুঝি মনেও করে না!

দিন যে এমন করিয়া আর যায় না। যেন কিসের একটা প্রতীক্ষায় তাহার অন্তর-বাহির সর্ব্বক্ষণই উতলা হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা তাহাই যে সে জানে না। কিই বা সে এমন পাইয়াছে এবং কিই বা তাহার পাইবার আছে? কিন্তু আছে আছে! তাহার দিবার এবং পাইবার কিছু এমন আছেই—যাহার অস্তিত্ব তাহার অন্তরে দিন দিন পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে। কেবলমাত্র ফটোখানা দেখিয়া আর তাহার দিন কাটে না। অবশ হস্ত হইতে সেখানা কেবলই পড়িয়া যায়, চক্ষু আর দেখার সুখে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না,—অনির্দ্দিষ্টভাবে শূন্যে চলিয়া যায়। তাহার চিরদিনের মাতৃকোল—এই রূপরস-গন্ধময়ী প্রকৃতি—তাহার এ অভাব যে আর এখন পূরণ করিতে পারে না—জড়ের মত চাহিয়া থাকে মাত্র। আর তাহার ভাষাহীন শব্দজ্ঞানহীন মূক হৃদয় কেবল কাঁদিয়া ফিরে। যে একটা অভাবের আভাষ বুদ্ধির দ্বারা ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিতেছিল, এ অভাব তো তাহার মত ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করার বস্তু নয়! এ যে বড় তীব্র—বড় ভয়ানক—এ যে কি তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু এ যে তাহার অন্তরে তীব্র বেদনাদায়ক কাঁটার মত দিন দিন গভীর হইয়া বিঁধিয়া যাইতেছে। অচিন্তিত অননুভূত এ বেদনা সহসা কোথা হইতে তাহার মধ্যে আসিল?

ফটোটা লইয়া মাতা-ভগ্নীর উদ্দেশে প্রথমে সে যে লজ্জাবোধ করিয়াছিল—এখন আর তো তাহা নাই। সে যে সেই ছবিটা লইয়াই ঘরের কোণে ছাদের কোণে অধিকাংশ সময় কাটায়, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। যেদিন মা প্রথম দেখেন, সেদিন শ্যামলী লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছিল; কিন্তু মায়ের অশ্রুপূর্ণ গভীর আদরে তাহার সে লজ্জা স্থায়ী হইতে পারে নাই। সেই দিন হইতে সে

রুগ্নমায়ের বুকের নিকট মাথা রাখিয়া ভিত্তিস্থ ছবিটার দিকে স্বচ্ছন্দে অন্য-মনে চাহিয়া থাকিত—অমনি কত কি ভাবিত আর তাহার মায়ের ক্ষীণ হস্ত আশীর্ব্বাদ, আনন্দ ও বিষাদের ভরে নুইয়া তাহার পিঠের উপরে, মাথার উপরে চালিত হইত। মেয়ের এই নব জন্মের প্রতীক্ষাতেই যে তিনি ছিলেন, ইহাতে তিনি যত কাঁদিতেন, তত আশ্বস্ত হইতেন। ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার দিন যে ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু শ্যামলীর জন্য যে মরিয়াও তাঁহার স্বস্তি নাই। আজ এই ছবিখানা শ্যামলীকে চিনাইয়া, ইহার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ অনুভব করাইয়া দিয়া যাইতে পারিলেও তিনি বাঁচেন! শ্যামলীর দ্বারা তিনি ছবিখানার চারিদিকে রেশমের ফুলকাটা বর্ডার তৈয়ারী করাইয়া দিয়া শ্যামলীর শয্যাপার্শ্বে উহা টাঙাইয়া দিয়াছেন। মায়ের ইঙ্গিতে সে সেই ছবিখানার সম্মুখে সন্ধ্যার ধূপ দীপ নিবেদন করে, ফুলের মালা গাঁথিয়া ছবিখানার উপরে ঝুলাইয়া দেয়। মা ধীরে ধীরে তাঁহার হতভাগ্য কন্যার নবজাগ্রত নারীত্বকে এইরূপে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছিলেন। শ্যামলীও রুগ্নমায়ের সেবা করিয়া এবং ছবিখানা লইয়া এমনি পূজা ও খেলা করিয়া এতদিন একরকম বেশ ছিল, কিন্তু দিন দিন তাহার অন্তর যেন আবার বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইতেছিল। এইটুকুতে মাত্র তাহার চিত্ত আর ভরিতেছিল না—তাহার যেন আরও কত দিবার আছে, আরও কত পাইবার আছে। কি দিবে, কি পাইবে, তাহা সে জানে না। কেবল জানে তাহার অন্তর বাহিরে একটা ব্যথা—ব্যথা—ব্যথা!

মাতা একটু সুস্থ বোধ করায় বিজলীর শ্বশুরবাড়া যাইবার কথা হইয়াছে। আজ-কাল শিশির তাহাকে লইতে আসিবে। বিজলী মাতার কাছে বসিয়া ছিল—এবং শ্যামলী বিকালে তাহার প্রাত্যহিক যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাদের একটি কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। বাহিরের একটা আমগাছ মুকুলে ছাইয়া ফেলিয়াছে। উঠানের ফুলন্ত লেবুগাছ ছাদের উপর দিয়া তাহার গন্ধকে ভেট পাঠাইয়া দিতেছে। অদূরের অশোককুঞ্জ—আর উচ্চশীর্ষ শিমুল গাছ লালে

লাল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে—পশ্চিম আকাশেও সেই অশোক-শিমুলের আভা! তাহারই মধ্যে শ্যামলী জড়ের মত বসিয়া ছিল। ঐ চিত্রের মত নিস্পন্দ প্রকৃতিও যেন আজ তাহার কাছে অর্থশূন্য উদ্দেশ্য-হীন। কেন এসব চেষ্টা তাহার, এত রং, এত গন্ধ? তাহারও একটা বড় রকম অভাব আছে; সেই 'নাই' জিনিসটা যে কি, সে বুঝিতে পারিতেছে না? বৃথা-বৃথাই এ সব তাহার।

সহসা শ্যামলীর চক্ষে পড়িল—ও কি দৃশ্য! ছাদের অপর প্রান্তে দুটি প্রাণী—বিজলী ও শিশির। শিশির বিজলীর কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের চোখ দুটি জগতের আর কিছু দেখিতেছে না, অপলকদৃষ্টি দুইজনে দুইজনার মুখের প্রতিই নিবদ্ধ। ডান হাতে বিজলীর একটা হাত ধরিয়া বাম হাতে শিশির তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিয়াছে। তাহাদের মুখে—ওকি—ওকি অপরূপ অনুপম অননুভূত ভাব! শ্যামলী স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। দুইটা মুখ আরও নিকটস্থ হইল, ক্রমে আরও, একটা অন্যটাকে স্পর্শ করিয়া নিবিড় ভাবে সংলগ্ন হইয়া স্থির হইয়া রহিল। শ্যামলীর চক্ষু ধীরে ধীরে বুজিয়া গেল।

এই! যাহার জন্য তাহার অন্তর কাঁদিয়া সারা হইতেছে সে বুঝি এই! এতদিনে শ্যামলী তাহাকে খুঁজিয়া পাইল! বিজলীর মত অমনি করিয়া পাইতে অমনি করিয়া দিবার জন্যই তাহার হৃদয় বুঝি এমন অশান্ত হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু কাহাকে? কই সে? তাহার শব্দহীন বধির অন্তর ঐ আম্রমুকুল ও লেবুর ফুলের গন্ধে—অশোকের নবারুণ-বর্ণচ্ছটায় যে ভরিয়া উঠিয়াছে—হাতে তাঁহার একখানা প্রাণহীন স্পন্দহীন জড় ছবি মাত্র! দুই চারিবার শ্যামলী ছবিখানার পানে চাহিতে গেল, দৃষ্টি উঠিল না। অবশ হস্ত হইতে সেটা খসিয়া পড়িয়া গেল।

ধীরে, বহুক্ষণ পরে, মুদিত চক্ষু খুলিবামাত্র শ্যামলী চাহিয়া দেখিল—সম্মুখের আকাশে ও কি মধুরোজ্জ্বল হাসি! আরক্ত আভার মধ্যে বেষ্টিত কাহার

জ্যোতিপূর্ণ চক্ষু? ঐ তো—ঐ তো—ঐ তো সেই চক্ষের সেই দৃষ্টি! ঐ তো দীপ্ত শুভ্র নক্ষত্রালোকে মণ্ডিত হইয়া সে ধীরে ধীরে শ্যামলীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার অপরূপ রূপের আলোয় তৃতীয়া-চতুর্থীর চাঁদের মত ছাদের উপর মৃদু জ্যোৎস্না ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই তো সে। কাগজের মধ্যে আর আবদ্ধ নয়—মানুষের মত তাহার নিষ্প্রভ মূর্ত্তিও নয়! তাহার রূপের আলোয় আকাশ পৃথিবী সব যেন হাসিয়া উঠিয়াছে, আর হাসিয়াছে শ্যামলীর চির-অন্ধকারময় অন্তর। শ্যামলীর মনে হইল, বিজলীর যত নিকটে শিশির আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি করিয়া সে শ্যামলীর নিকটেও দাঁড়াইয়াছে, হাত ধরিতে হাত বাড়াইতেছে, তাহার অনুভবেই শ্যামলীর সর্ব্বাঙ্গে এমন কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে! আরও আরও নিকটে, এই যে তাহারই জ্যোতি একেবারে শ্যামলীর মুখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। শ্যামলীর মুখে এ কিসের স্পর্শ! তাহারই নিশ্বাস যে! অসহ্য আনন্দে শ্যামলীর চক্ষু মুদিয়া গেল। শরীর অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িল। মোহের মধ্যে সে অনুভব করিল, সেই দীপ্ত তারকামধ্যস্থ সেই অনুপম সুন্দর—সেই তাহার বর—ধীরে ধীরে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল,—ধীরে ধীরে, শ্যামলীর সংজ্ঞা এইবার একেবারে লুপ্ত হইল।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল, সে মাতার ক্রোড়ের মধ্যে শুইয়া আছে।

অনিলের সেই কাল-বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল অনিল চিরদিনের সেই বালক অনিলের মতই পড়াশুনা এবং মায়ের আঁচল ধরিয়া এক ভাবেই দিন কাটাইতেছে, কিন্তু মা যে আর পারেন না। ছেলে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার হইল, তবু এখনো বিবাহের চেষ্টা করিতেছে না দেখিয়া তখন মুখ ভারি করিয়া সলিলের জন্য তিনি পাত্রী অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এখন আর শিশিরকে নিজের হুকুম তামিল করিতে তো তিনি হাতের কাছে পান না! শিশির এখন চাকরি-বাকরি লইয়া পুরাদস্তুর সংসারী হইয়াছে। সংসারের ঝঞ্ঝাটে সে আর অনিলের সঙ্গে পড়িতেও পারে নাই। শিশিরের মুস্কিলের আদত কারণ বুঝিয়া অনিল একটু একটু হাসিত মাত্র। কাজেই মাতার মুখে যে ক্রমশঃ মেঘ সঞ্চার হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াই অনিল বৎসরাধিক পূর্ব্বে মাতার যে তীর্থযাত্রা ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মাতার এই কৃত্রিম উদ্যোগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মাতাকে ভ্রাতাকে প্রায় টানিয়া লইয়াই তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল।

নামে তীর্থযাত্রা, কিন্তু তীর্থ অতীর্থ যেদিক্‌টা অনিলের পছন্দ হইতেছিল, সেই দিকেই সে মনোরথকে চালাইতেছিল। বাংলা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, তীর্থযাত্রার সর্ব্বপ্রথমে সে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের বিশাল হৃদয় বহিয়া বাংলার পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইল। বাংলার ভূস্বর্গ চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, আদিনাথ ও তাহাদের নিকটস্থ অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া অনিল মাতাকে আসাম ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে কামাখ্যা ও উমানন্দকে দুইদিন ভাল করিয়া দেখার অছিলায় পাণ্ডা মহাশয়ের জিম্মায় রাখিয়া নিজে ভ্রাতার সঙ্গে "হস্তী প্রপাত" প্রভৃতি

নিসর্গ-দৃশ্য দেখিয়া লইবার জন্য শিলং বেড়াইয়া আসিল। শিলংয়ে কোন দেবদেবী নাই শুনিয়া মাতা পুত্রদের সঙ্গে যান নাই, কিন্তু আর কিছুর জন্য না-হোক 'প্রপাত' দেখিতে না পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করায় অনিল তাহার মতলবগুলো মাতার কাছে আগে কিছু আর ভাঙিল না। পশ্চিম যাত্রার পথে গোমো হইতে পরেশনাথ পাহাড় দেখিতে নামিয়া আদ্রা-পুরুলিয়া শাখা-লাইন হইতে রাঁচির পথ ধরিয়া ছোটনাগপুরের প্রসিদ্ধ জঙ্গল এবং তন্মধ্যস্থ হুড প্রপাত দেখাইয়া মাতার ক্ষোভ নিবারণ করিল। মাতা তাহাতে এতই খুশী হইয়া গেলেন যে, এইবারে ছেলের মতেই ভ্রমণের প্রোগ্রাম প্রস্তুতে সম্মতি দিলেন। তখন অনিল যাত্রাপথকে বদ্‌লাইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নিজের ইচ্ছামত ভারতবর্ষের গিরি, নদী, উপত্যকাগর্ভ প্রকৃতির তীর্থগুলি দেখিয়া ও মাতাকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কাশী গয়া বৃন্দাবন কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহারা তাহাদের এই নবতীর্থযাত্রার আনন্দকেই সে তীর্থের দেবতারূপে বরণ করিয়া লইল। তবে পথে যে তীর্থ দেখিবার সুবিধা হইতেছিল, কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিয়াও অনিল সে তীর্থ না দেখিয়া ছাড়িতেছিল না, সেখানেও যে তাহার এই দেবতা প্রত্যক্ষ! কত যুগ-যুগান্তের সাধক-ভক্তের আনন্দই যে সেখানে প্রস্তরীভূত হইয়া কালে কালে যুগে যুগে সে আনন্দকে নিত্য সত্য প্রত্যক্ষ ধরিয়া রাখিয়াছে। তবে না-জানিয়া না-বুঝিয়া কেবল দৃষ্টিপাত মাত্রেই যে আনন্দানুভব তীরের মত প্রাণকে বিঁধিয়া ফেলে, যে যে স্থানে সেই আনন্দের দৃশ্যগুলাই অধিক সুস্পষ্ট, সেই সেই স্থানের দিকেই অনিলের কেমন ঝোঁক হইয়াছিল। তাই সে কলমুখর শব্দবহুল জনপদের দিকে না গিয়া মৌন স্তব্ধ গিরিপথকেই আশ্রয় করিতেছিল। সঙ্গে ফটোর ক্যামেরা ছিল, তাই তাহারা তাহাদের এই সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রার প্রথম দৃষ্ট চট্টগ্রামের ও শিলংয়ের নিসর্গ-দৃশ্য হস্তীপ্রপাত ও হুড্রুর নানাপ্রকার ছবি হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুর হাজারিবাগের পর্ব্বতমালা এবং বিখ্যাত পরেশনাথ পর্ব্বতের দৃশ্য যাহা তাহাদের

মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল তাহারই ফটো তুলিতে তুলিতে চলিতেছিল। অনিলের ঈপ্সিত তীর্থগুলির পথে যাইবার পূর্ব্বে অনিল মাতার জন্য আবার খড়্গপুরে ফিরিয়া দক্ষিণাপথের যাত্রাটাও সারিয়া লইয়াছিল। পুরী হইতে ওয়াল্‌টেয়ার, ভিজাগাপত্তনম্, অবশেষে রামেশ্বর। যাইতে যাইতে এই সাগর-সর্ব্বস্ব মহাভূমির শোভাও অনিলকে মুগ্ধ করিতেছিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কপাট নিরুদ্ধ করিয়া ভাবিতেছিল, এই জলরাশির উচ্ছল গর্জ্জন বাদ দিলে যেন এ সমুদ্রের অনেকখানিই হানি হইয়া যায়। তাই তাহার অন্তর সেখানে কেমন যেন সঙ্কুচিত নিরানন্দ হইয়া উঠিতেছিল।

দক্ষিণাপথের যাত্রায় মাতাকে দক্ষিণের অন্যান্য তীর্থ এবং কাঞ্চিপুরীর রঙ্গনাথ, বরদরাজ প্রভৃতি দর্শন করাইতে অনিল ত্রুটি করে নাই। রামেশ্বর দেখিয়া মাতা চারি ধামের দ্বিতীয় ধাম দ্বারকাপুরী যাত্রীর সঙ্গে অগ্রে দ্বারকা যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠায় অনিল মাদ্রাজ হইতে বম্বের পথ ধরিল, এবং তথা হইতে গুজরাট কচ্ছ উপসাগরের পথে দ্বারকা পৌঁছিল। সেস্থান হইতে পুনর্ব্বার বম্বের পথে ফিরিয়া অনিল মাতিয়া উঠিল। নাসিকের প্রসিদ্ধ পঞ্চবটীবন ও জনস্থান, নাগপুরের অজন্তাগুহা, জব্বলপুরের মর্ম্মর পর্ব্বত এবং নর্ম্মদাপ্রপাত, পেণ্ড্রা রোডে নর্ম্মদার জনক অমরকণ্টক পর্ব্বত এবং বিলাসপুর হইতে রামগিরি বা চিত্রকূট তীর্থ দর্শন করিয়া এবার তাহাদের এলাহাবাদ হইতে মথুরা, বৃন্দাবন ও রাজপুতানার দিকে যাইবার কথা। একদা অনিল সহসা প্রস্তাব করিল যে, সুদূর অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া তাহার পরে নিশ্চিন্ত ভাবে ওসব দেখিয়া পরে কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি ঘরের কাছের তীর্থ-গুলিতে কিছুদিন বাস করা যাইবে। মাতা অতি সহজেই সম্মত হইলেন এবং সলিল দাদার মতলব বুঝিয়া মনে মনে খুব হাসিই হাসিল। খুশীও অত্যধিক পরিমাণে হইয়াছিল—কেননা ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখিবার সাধ কাহার না হইয়া থাকে? দিল্লী হইয়া আম্বালা রাওয়ালপিণ্ডি হইতে মারি কার্ট রোড ধরিয়া তখন তাহারা

কাশ্মীর যাত্রা করিল। অর্দ্ধপথে সলিল হাসিতে হাসিতে দাদা যে অমরনাথের ছলে কোথায় চলিয়াছে, তাহা মাতাকে বুঝাইয়া দিলে মাতা "ওমা!" বলিয়া প্রথমে বিস্ময় এবং ঈষৎ ভয় পাইলেন, কিন্তু ক্রমশঃ প্রচুর আনন্দই সে স্থানকে অধিকার করিল।

কাশ্মীরযাত্রায় দুই ভাইয়ের ফটোর ভাণ্ডার অসম্ভব রকম বাড়িতে লাগিল। সেই মৌনমূক অথচ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রাণস্পর্শী ছবিগুলা নাড়িয়া-চাড়িয়া অনিল কেবলই যেন কি একটা করিবার সঙ্কল্প করিত অথচ পারিত না। কিন্তু কাশ্মীর দর্শন যেদিন তাহাদের শেষ হইল, সেদিন অনিল সহসা কতকগুলা ফটো কার্ডে বসাইয়া পার্শেল বাঁধিয়া ফেলিল এবং বাংলার দিকে তাহাকে রওনা করিয়া দিল। নিজেকে লুকাইয়া তাহার মধ্যে নিজেরও একখানা ছবি সে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

কাশ্মীরের ফেরতা পাঞ্জাব হইতে ধীরে ধীরে তাহাদের সেদিকের তীর্থ দেখা সুরু হইল। অবশ্য, দ্রষ্টব্য সহরগুলিও বাদ গেল না। অমৃতসহর, কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বরের পর হরিদ্বার গিয়া মাতা বদরীতীর্থে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠি-লেন। কিন্তু তখনো সে পথ সুগম হইতে অনেক বিলম্ব।

ছয় মাস ধরিয়া অনবরত ভ্রমণে মাতা অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দৃঢ় ছিল বলিয়াই এতদিন তিনি শ্রান্তি বোধ করেন নাই, কিন্তু এইবার আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না। মাতার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনিল হরিদ্বারেই কিছুদিন বিশ্রামের প্রস্তাব করিল। মাতা প্রথমে রাজী হন নাই, কেননা, এখনো, তাঁহার মতে আসল তীর্থগুলিই বাকী। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতিই তাঁহার মনে তীর্থের শীর্ষস্থানীয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, কিন্তু কি করিবেন, শরীর আর বহে না।

সহর হরিদ্বারে না থাকিয়া অনিল হৃষিকেশের একটি বিখ্যাত ধরমশালায় আস্তানা পাতিল। প্রায় প্রত্যহই সে লছমনঝোলার কয়েক মাইল পথ বেড়াইয়া

আসিত, মাতাও সুস্থ হইয়া ক্রমে এক এক দিন তাহার সঙ্গ লইতেন। দুর্লভ-দর্শন বহু বিখ্যাত গিরিপথ ও তাহাদের ক্রোড়মধ্যগতা নদী হ্রদকে তাহারা দেখিয়াছে। কিন্তু বালিকা হৈমবতীর এই বাল্যলীলা তাহাদের যেমন মুগ্ধ করিতেছিল, এমন যেন আর কিছুতেই পারে নাই। কোনদিন বন্ধুর উচ্চস্থান হইতে গঙ্গার শৈলপ্রহৃত গতি দেখিত, কোনদিন বা সমতল ক্ষেত্রবাহিনী সেই শীতল স্নিগ্ধধারাকে স্পর্শ করিবার জন্য তাহার তীরে গিয়া বসিত।

সেদিন প্রভাতে অনিল ও তাহার মাতা যেখানে বসিয়াছিল, তাহার পার্শ্বেই লছমনঝোলার পথের চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, গঙ্গার অপর পারেও উচ্চ পর্ব্বত সোজা উঁচুভাবে উঠিয়াছে, নিম্নে অনিলদের সম্মুখে সমতল এবং সমধিক গভীর খাতের মধ্য দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। নবোদিত অরুণ-কিরণে পার্ব্বত্যদেশটি ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। সহসা অনিল বলিয়া উঠিল—"মা মা—ছাখো।" মাতা পুত্রের নির্দ্দেশমত চাহিয়া দেখিলেন, একটি রমণী মৃৎকলসীতে জল লইয়া সেই চড়াইয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মাতা সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাঙালীর মত করে কাপড় পরা যে, বাঙালীর মেয়ে নাকি ?"

"তাই তো বোধ হচ্চে ! দেখছ মা, উঠতে ভারি কষ্ট পাচ্ছে বেচারা !"

মাতাও সেই ক্ষীণকায়া নারীটির পূর্ণ কলস লইয়া কষ্ট লক্ষ্য করিতেছিলেন। রমণী খানিকটা যাইতেছে, আবার ক্ষণিক থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন হাঁপ ছাড়িতেছে। অনিল দু'চারবার মাতার পানে চাহিলে মাতা ছেলের দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন ; কিন্তু তখনি তাঁহাকে সেই ফিরানো মুখকে ছেলের দায়ে স্বস্থানে আনিতে হইল। ছেলের কণ্ঠস্বর কানে আসিল—"তোমার পায়ে পড়ি মা !" চাহিয়া দেখিলেন, অনিল উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। মা অগত্যা নিঃশব্দে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনিল রমণীটির নিকট পৌঁছিল, কিন্তু তাহার যাওয়াই সার হইল। মাতা দেখিলেন, তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায়ও রমণীটি তাহার প্রার্থিত বস্তু অনিলকে

দিল না। কেবল সে বিস্মিত চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কি যেন এক-একবার বলিতেছিল। ক্ষুণ্ণ অনিল মায়ের পানে এক-একবার চাহিয়া আবার কর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে রমণীটির পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতা তখন উঠিলেন, কিছুদূর অতিবাহনান্তে উভয়ের নিকটস্থ হইয়া মাতা শুনিলেন, রমণী বলিতেছে—"পথ ছাড় বাবা, আমিই নিয়ে যেতে পারব। কাছেই আমাদের আশ্রম। আজ তো নতুন নয়, দু'তিন বচ্ছর আমরা এখানে আছি, আর এমনি করে জল নিবে যাই।" অনিলের মাতা পশ্চাৎ হইতে উত্তর দিলেন, "দাও না-ই কেন ছেলেকে কলসীটা আজ। কাল আবার নিজেই নিয়ে যেও।" রমণী দ্বিগুণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিলে অনিলের মাতা এইবার স্পষ্ট চোখোচোখি করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইলেন। পরনে একখানা মলিন গৈরিক, হাতে দু'গাছা রাঙা কড়, মাথার চুলগুলি পুরুষের মত করিয়া ছাঁটা, ক্ষীণ দেহ কিন্তু তাহারই মধ্যে মেঘাচ্ছাদিত ম্লানজ্যোতি জ্যোতিষ্কের মত রূপ—এমন স্থানে এ ভাবে এই রমণী কেন রহিয়াছে! ভদ্রঘরের মেয়ে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, ভাবে ভাষায় তাহা অতি পরিস্ফুট। রমণীকে নির্ব্বাক দেখিয়া অনিলের মাতা এইবার অগ্রসর হইয়া কলসী ধরিলেন। পুত্রকে বলিলেন, "খুব ছেলে যাহোক, এই ভরা কলসী ঘাড়ে খাড়া দাঁড় করিয়ে রেখেছিস্ যে, পথ ছাড়্। দাও তো দিদি আমায় কলসীটা।" বলিতে বলিতে তিনি কলসীতে টান দিলেন। এইবার নির্ব্বাক রমণীর মুখে ভাষা ফুটিল, "ওকি দিদি, ওকি? রক্ষা করুন, মাপ করুন আমায়।" আর মাপ করা! অনিলের মাতা ততক্ষণে কলসী কাড়িয়া লইয়াছেন এবং অনিলও তৎক্ষণাৎ তাহা স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিব্রতা রমণী উপায়ান্তরহীন ভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "একি করলেন দিদি আপনি? আপনার ছেলেই নিশ্চয় ওটি, বাছার ঘাড়ে এ ভার কেন চাপালেন? ঐ ননীর শরীরে কি এসব কষ্ট সয়?"

"কি করব ভাই, ও ছেলেদের দায়ে আমার পারবার জো নেই। চল এখন, কোথায় তোমরা থাক, নইলে ও আবার—"

"হাঁ—চলুন চলুন।"

রমণী আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসেই চলিল। অনিলের মাতাও হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পিছনে ছুটিলেন। তথাপি তাহাকে ধীরে যাইতে অনুরোধ করিলেন না, কেননা, অনিল পাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথ ঐ ভার স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইয়া পড়ে, এই তাঁহার ভয়। অনিল ইতিমধ্যেই অনেকটা আগাইয়া গিয়াছিল।

তাঁহারা একটুখানি যাইতেই সম্মুখের বাঁকের পথ হইতে আর একটি রমণী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহার মুখের পানে চাহিতেই অনিলের মাতার মনে হইল, "একি এর কেউ নাকি?" একই রকম মুখের গঠন, শ্রী বরং বয়সের অল্পতায় ম্লানিমাহীন, মুখচোখ উজ্জ্বলতর। এরও চুল বোধ হয় তেমনি ছাঁটা ছিল, কিন্তু সেগুলা বর্দ্ধিত হইয়া গুচ্ছে গুচ্ছে চোখ-মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে অনিলের মাতা তাহাকে বালিকা যুবতী অথবা মধ্য-বয়স্কা রমণী এই তিনটির কোন পর্য্যায়েই ফেলিতে পারিলেন না, সে তিনই হইতে পারে—তার আচরণ শিশুর মত অসঙ্কোচ সরল, তার চেহারা যুবতীর মতন নিটোল পরিপূর্ণ, তার মুখ প্রৌঢ়ার মতন গম্ভীর। তাহাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বোক্তা রমণী ডাকিল, "রেবা!"

সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক-রমণীও ত্রস্তস্বরে বলিল, "মা, কলসী কই তোমার?"

মা একটু দূর হইতে বলিলেন, "এগিয়ে গেল যে ছেলেটি দেখলি না?"

"দেখলাম তো। তোমরই কলসী? কে এঁরা মা? তোমার কলসী কেন নিয়েছেন?"

"শুনবি শেষে, এখন যা ছুটে যা, আশ্রমের পথ দেখিয়ে দিবি।"

কন্যা দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। মাতা তখন একটু থামিয়া অনিলের

মাতাকে নিকটস্থ করিয়া লইল। অনিলের মাও এইবার সুস্থ ভাবে গতি মন্দ করিয়া দিয়াছিলেন। রমণীকে বলিলেন, "এটি কি তোমার মেয়ে নাকি? স্বামী কি সঙ্গেই আছেন? কপালে সিঁদুর, তুমি সধবা?"

রমণী এক—"হ্যাঁ দিদি"—শব্দে সকল প্রশ্নের উত্তর শেষ করিয়া বলিল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন? এখানে কতদিন এসেছেন? কোথায় আছেন? ক'টি ছেলে-মেয়ে আপনার?" একে একে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে দিতে অনিলের মাতা আর একটা বাঁক ফিরিয়া খানিকটা সমতল ক্ষেত্রের নিকট পৌঁছিলেন। সেই বদরীনারায়ণের পথের পার্শ্বে কয়েকখানা কুটীরে একটু আশ্রম তৈয়ারী হইয়াছে। কতকগুলি উদাসীন সেখানে বাস করিতেছেন। কাহারো কাহারো গরু বাছুর লইয়া দিব্য ছোট খাটো গৃহস্থালী। তাহারই এক-পার্শ্বে একখানা কুটীরের সামনে অনিল কলসী নামাইয়া দাঁড়াইয়া, আর রেবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে মধ্যপথে দাঁড়াইয়া মাতার পথপানে চাহিয়া আছে।

১৫

অনিলের মাতা আরও যে কয়দিন হৃষিকেশে রহিলেন, প্রায় প্রত্যহই সেইদিকে বেড়াইতে যাইতেন এবং রেবার মাতার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরিয়া গল্প করিতেন। বহুদিন তিনি সঙ্গিনীহীন অবস্থায় ভ্রমণ করিতেছেন। এই অপ্রত্যাশিত স্থানে ইহাদের পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। রেবার মাতার তো কথাই নাই।

অনিলের মার রেবার পিতামাতার কাহিনী জানিতেও কিছু বাকী ছিল

না। ইহারা সংসারে অশেষ কষ্ট সহিয়াই যে এমন স্থানে আসিয়া কুটীর বাঁধিয়াছে, কেবলমাত্র পরমার্থ চিন্তায়ই যে রেবার পিতা স্ত্রী ও যুবতী অনূঢ়া কন্যা লইয়া এইরূপে বাস করিতেছেন না, তাহা অনিলের মা একদিনেই বুঝিয়াছিলেন। পরে তাহাদের কাহিনী শুনিয়া তিনি একেবারে দ্রবীভূতা হইয়া গেলেন; বিশেষ যখন তিনি জানিলেন যে, ইহারা তাঁহারই স্বজাতি, স্বশ্রেণী এবং তাঁহার পিত্রালয়েরই নিকটস্থ গ্রামের লোক, তখন তাঁহার সহানুভূতির আর সীমা রহিল না।

ভদ্রলোকটি পশ্চিমেই চিরকাল চাকরি করিতেন, অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র লইয়াই সংসার ছিল। কন্যা দুইটি বিবাহযোগ্যা হইলে বিবাহ দিতে স্বদেশে যান। জ্যেষ্ঠার বিবাহের পর কনিষ্ঠার বিবাহ হইবে, ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠার বিবাহ লইয়াই মহা গোল বাধিয়া গেল। যে পাত্রের সঙ্গে জ্যেষ্ঠার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের পরে প্রকাশ পাইল যে তাহারা জাতিচ্যুত। জাতিচ্যুতের সঙ্গে আহার-ব্যবহারের জন্য তাঁহারাও জাতিহীন হইলেন। শুধু তাই নয়, কনিষ্ঠার জন্য যে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, এই সংবাদে তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, তাহার আর বিবাহ হয় না; কিন্তু সেটিরও তখন বিবাহের বয়স হইয়া উঠিয়াছে। বহুদূর পশ্চিমে অল্প বেতনের চাকরিতে তাহাদের সংসার চলিত, কাজেই বহুকাল দেশে আসা হয় নাই। বড় মেয়েটির বয়স তো বেশ একটু বাড়িয়াই গিয়াছিল। একে ধনহীন, তায় দূর হইতে মাত্র পত্র দ্বারা অনুসন্ধান, কাজেই সহজে পাত্রের সন্ধানও মেলে নাই; শেষে দেশে আসিয়া মেয়েদের রূপের সাহায্যে যদি বা ভাল ঘরের পাত্র মিলিল, এই ঘটনায় তাহা হরিষে বিষাদে পরিণত হইল। সদ্যপরিণীতা জ্যেষ্ঠা কন্যাটি ঘরে থাকিলে কনিষ্ঠার বিবাহ তাঁহারা দিতে পারিবেন না বুঝিয়া সেটিকে চোখের জলে ভাসাইয়া শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া রেবার বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন। কয়েকটি পাত্রও জুটিল, কিন্তু গ্রাম এবং সমাজের

প্রতিকূলতায় কোন মতেই বিবাহ হইতে পারিল না। উপরন্তু আর এক উপসর্গ জুটিল। একটি স্থানে বিবাহের এমন স্থির হইয়াছিল যে, গাত্র-হরিদ্রা, অধিবাস, এমন কি, সম্প্রদান ছাড়া বিবাহের সমস্ত কার্য্যই সমাধা হইলে বিবাহের দিন বৈকালে সংবাদ আসিল যে, জাতিচ্যুতের কন্যা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। যে ঘটক অনেক টাকা খাইয়া এ সংবাদ গোপন রাখিয়াছিল, তাহারা তাহাকে জেলে দিতে চায়, সে লোকটা তো পলাইয়া বাঁচিল। এদিকে ইহাদের আবার নূতন করিয়া জাতি গেল। সকলে একবাক্যে জানাইল যে, এ কন্যার আর হিন্দুর ঘরে বিবাহ সম্ভব নয়।

দেশের উপর অপরিমিত কৃতজ্ঞতা লইয়া তাহারা যখন জীবনের মত দেশ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণা আকস্মিক বিসূচিকা রোগে শ্বশুরবাড়ীতেই মারা গিয়াছে।

যখন তাহারা দেশ ত্যাগ করে, তখন গ্রামের প্রধানরা আসিয়া জানাইলেন যে, এখন অন্ততঃ একটু গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের তাঁহারা জাতিতে তুলিয়া লইবেন এবং রেবার বিবাহও যাহোক্ কোন উপায়ে তাঁহারা ঘটাইয়া দিবেন। শোকাতুর দম্পতী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চাকরির স্থানে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস কৃষ্ণা পিতামাতার জাতি ফিরাইয়া দিতেই এমন করিয়া নিজের প্রাণ দিয়াছে। তাহার সেই চোখের জল তাঁহাদের বুকের মধ্যে শেলের মত ফুটিয়া রহিল।

হতভাগা ছেলেটার বিদ্যা-বুদ্ধি দিন দিন অপরিমিত হইয়াই উঠিয়াছিল—উচ্চ বৃত্তি পাইয়া সে বাপ মায়ের অজ্ঞাতে বিলাত পলাইল। লিখিয়া রাখিয়া গেল যে, জাত যখন গিয়াছে, তখন ভাল করিয়াই যাক্! উপযুক্ত হইয়া আসিয় উপযুক্ত পাত্রে ভগিনীর বিবাহ দিবে। আশায় আশায় তিন বৎসর কাটিল। তারপরে সংবাদ আসিল, তাহার আর দেশে আসার সম্ভাবনা নাই, সেই দেশেই সে বিবাহ করিয়াছে এবং সকল দিকেই তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, দেশে

আসা তাহার পক্ষে অসাধ্য। পিতা মাতা তাহাকে যেন ক্ষমা করেন, ভগিনীর বিবাহের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা সে সময়মত পাঠাইয়া দিবে, ইত্যাদি। যেদিন এই সংবাদ আসিল, সেইদিনই রেবার পিতা তাঁহার চাকরিটিতে জবাব দিয়া আসিলেন। অনেক দিনের চাকরি, তাই পাঁচজন সহকর্ম্মীরা মিলিয়া চেষ্টার দ্বারা তাঁহার স্ত্রী-কন্যার জন্য সিকি ভাগ পেন্সনের উপায় করিয়া লইল। তিনি কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে বলিলেন, "আরও কি তোমাদের সংসারের বা লোকের সমাজে মিশে থাকার সাধ আছে? থাকে তো তোমরা থাক, আমি চললাম।"

তাহারাও একবাক্যে বলিল, "আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।"

তিন জনে হরিদ্বারে আসিলেন। সেখান হইতে হৃষিকেশ, পরে তাঁহারা বদরীতীর্থে চলিযা যান্। সেখানে একটি প্রৌঢ় বাঙালী সাধুর সহিত আলাপ হয়। তিনি ফিরিবার সময় তাহাদেরও ফিরাইয়া আনেন এবং এইখানে যে তাঁহার গুরু বাস করিতেছেন, তাঁহারই চরণে তাহাদের সমর্পণ করেন। এই গুরু মহারাজটি বৃদ্ধ, তাই পাহাড়ে বাস না করিয়া এইখানেই আশ্রম বাঁধিয়াছেন, বাঙালী সন্ন্যাসীটিও তাঁহার নিকটে থাকেন, পার্শ্বেই তাঁহাদের কুটীর। তাঁহাদের ভরসাতেই রেবার পিতা স্ত্রী-কন্যা লইয়া এখানে বাস করিতে পারিতেছেন। তাঁহার আর কিছুতে মন নাই, অধিকাংশ সময় তিনি মহারাজ ও সাধুবাবার কুটীরেই ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় কাটান। নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তা করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে পাহাড়ের দিকে চলিয়া যান এবং দুই চারি দিন দেখাও দেন না। ঈষৎ দূরের অন্যান্য কুটীর কয়খানির সাধু কয়টির মধ্যের কেহই যদিও বাঙালী নহে, তথাপি ইহাদের সান্নিধ্যেও রমণী দুইটি অকুতোভয়েই বাস করিয়া থাকে। যুবতী কন্যাকে একা অতদূরে জল আনিতে পাঠানো উচিত নয় বলিয়াই রেবার মাতা নিজে জল আনিতে গিয়া থাকে এবং কন্যা অর্দ্ধপথে আগাইয়া লয়; কিন্তু এ সাবধানতা কপাল মন্দ বলিয়াই তিনি করিয়া থাকেন, নচেৎ ইহার কোনই

প্রয়োজন নাই। ঐ লোকগুলির মধ্যে উচ্চ অঙ্গের সন্ন্যাসী বড় কেহ নাই। ইহারা হৃষিকেশের ধরমশালা হইতে ডালরুটী আনিয়া খায়, সীতারাম সীতারাম শব্দ করে, দিন রাত্রি গঞ্জিকা ডলে, সকালে বিকালে মাটি মাখিয়া কুস্তি করে এবং কাষ্ঠাহরণ করিয়া ধুনি জালিয়া বসিয়া থাকে। কাহারও কাহারও গরুও আছে। গরু বনে চরিয়া আসে, রাত্রে কেবল ইহাদের কুটীরের একপাশে থাকে মাত্র আর খুব খানিক করিয়া দুধ দেয়। সেই দুধ সব সাধুর মধ্যেই প্রত্যহ বিতরিত হইয়া থাকে। পরস্পরের মধ্যে সামান্য বচসা বা মতভেদের উচ্চস্বর ছাড়া আর কোন উপসর্গই ইহাদের নাই। মায়ী সম্বোধন ভিন্ন স্ত্রীলোককে ইহারা অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখিতে জানে না। রেবার পিতা দু-একমাস অন্তর হৃষিকেশ পোষ্টঅফিসে গিয়া তাঁহার পেন্সনের টাকা লইয়া আসেন এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় আহার্য্যও কিনিয়া আনেন। স্ত্রী-কন্যার দায়েই তাঁহাকে এ কষ্টটুকু সহ্য করিতে হয় নতুবা ধরমশালার দাতব্য দুইখানি রুটি লইয়াই নিশ্চিন্ত ভাবে দিনপাত করিতে তাঁহারও ইচ্ছা।

দিন পনেরো বিশ্রামের পর অনিলেরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। দেরাদুন হইয়া মুসৌরীর পথে আগে তাহারা উত্তর-কাশী ও গঙ্গোত্রী যাইবে, তাহার পরে ঘুরিয়া ক্রমে কেদার পর্ব্বত এবং বদরীনারায়ণ। রেবার মাতার নিকটে যখন অনিলের মাতা বিদায় লইলেন, তখন তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে ত্রস্ত হস্তে তাহা মুছিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "নির্ব্বিঘ্নে দর্শন করগে দিদি। ছেলেরা ভাল থাক্।" অনিলের মাতারও যেন চক্ষে জল আসিতেছিল। এই হতভাগিনী নারীকে তিনি এই কয়দিনেই অনেকখানি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাদের সংযত বাক্ এবং ধীর সৌম্য স্বভাব যেন অনন্যসাধারণ। ঐ রেবা মেয়েটির দুর্ল্লভদর্শন রূপ এবং বয়স লইয়া এই অরক্ষিত স্থানে বাস একান্তই অনুপযুক্ত, কিন্তু কি অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও চরিত্রের সুদৃঢ় দুর্গেই মেয়েটি বাস করে! ঐ রুক্ষ পিঙ্গল সদ্যকর্ত্তিত কেশে, ধূলিমলিন ক্ষীণদেহের বর্ণে ও গৈরিক-

বাসের মধ্যে যে কি অগ্নি প্রসুপ্ত রহিয়াছে, তাহা কার সাধ্য ধরে! মুখে প্রৌঢ়োচিত অভিজ্ঞতা, চক্ষু শান্ত, ধীর, আত্ম-সমাহিত। এই অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকার বয়স-নির্ণয় অনিলের মাতার সাধ্যেও হইত না, যদি না তাহার মাতা গল্প করিত।

রেবার মাতা আবার একটু থামিয়া বলিল, "দুর্গম পথে ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছ দিদি, যখন নির্ব্বিঘ্নে ঘরে ফিরবে, একটু সংবাদ দিতে পার যদি—"

"সংবাদ দেব! সে কি? আমরা এই পথে ফিরব আর তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব না? তবে ছেলেদের যে ঝোঁক, পথের জায়গায় জায়গায় কত যে দেরী হবে, তার ঠিক কি! আর যে তোমার অবস্থা ভাই, এসে দেখা পেলেও তো বুঝি!"

রেবার মাতা ম্লান হাসিয়া বলিল, "তাতে তো ভাবনার কথা নেই দিদি, বরং তাতে চারিদিকেই সুবিধা। আমার দায়ে উনি এত যন্ত্রণার পরও খালাস পান্ নি। সে দিন এলে যে আমারও মুক্তি, ওঁর-ও তাই।"

"আর রেবা? মেয়ের কথা ভাবছ না?"

"ভেবে কি করব দিদি? কৃষ্ণা যে এমন করে নির্ভাবনা করে দেবে, এই কি ভেবেছিলাম? আর অম্বর, প্রাণে বেঁচে থাক্—সুখে থাক্—তবুও এই কথা কি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম? আরও দু'তিনটা ছেলে মেয়ে হয়েছিল আমার। তারা খুব ছোটতেই তাদের ভাবনার শেষ করে দিয়েছিল। বাকি রেবার জন্য আর কি ভাবব দিদি!"

অনিলের মাতার চক্ষের কোণে আবার জল ভরিয়া আসিল। সেটুকু দমন করিয়া তিনি বলিলেন, "তা বললে কি হয়! যতদিন ভগবান রেখেছেন, ততদিন মা-বাপকে ভাবতেই হবে, বিশেষ আইবুড়ো মেয়ে।"

"ওকে তত আমি ভাবি না দিদি। মেয়ে বলে যখন মনে করি, তখন ভাবি বিধবা মেয়ে।"

"ষাট্-ষাট্, ও কি কথা।"

রেবার মাতা নীরবে দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন। যদিও অনিলের মাতা বুঝিলেন যে, রেবার এই কৌমার্য্য এবং বৈধব্যে কিছুই প্রভেদ নাই, তথাপি সন্তানের মাতা তিনি, এ চিন্তা সহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের যাত্রাকালে রেবা যখন তাঁহাদের প্রণাম করিল, তখন একটি আশীর্ব্বাদও তাঁহার মুখে ফুটিল না, কেবল ব্যথিত স্নেহে তাহার শিরোঘ্রাণ মাত্র করিলেন। মাথাটা বুকে টানিয়া লইতেই ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু মেয়েটির উচ্ছ্বাসমাত্রহীন স্বভাবে নিশ্চল মুখশ্রীর পানে চাহিয়া এ স্নেহোচ্ছলতা সংযত করিয়া লইলেন। শেষে তাহার মাতাকে বলিলেন, "দেখিস্, এসে যেন দেখা পাই!"

রেবার মাতা একমুখ হাসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল মাত্র।

১৬

তিন মাস পরে অনিলেরা যখন সেই পথে ফিরিয়া আসিল, তখন বর্ষা আসিয়া পড়িতেছে। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, তথাপি অনিলের মাতার আদেশে লছমনঝোলার পথ অতিবাহন করিয়া রেবার পিতা-মাতার আশ্রমের নিকট অনিল ও তাঁহার ঝাঁপান্ থামিল। সলিলের ঝাঁপান্ সঙ্গের মোটবাহীদের লইয়া হৃষিকেশের বাসার দিকে চলিয়া গেল।

উভয়ে কুটীর কয়খানির নিকটস্থ হইয়া বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ঝাঁপের দুয়ারগুলি সব রুদ্ধ—জনমানব কেহ কোথাও নাই। চারিদিক হতশ্রী—মার্জ্জন-

শূন্য। তবে রেবার মাতার ও মহারাজের কুটীরের দুয়ার খোলা আছে দেখিয়া তাঁহারা ঈষৎ আশ্বস্ত হইলেন। দ্বারের নিকটেই এক শীর্ণকায় দীর্ঘদেহ গৈরিক-ধারী সন্ন্যাসী একখানা গ্রন্থে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া বসিয়া আছেন। অনিলরা আন্দাজ করিল, হয়ত ইনিই কুটীরস্বামী। গতবারে ইঁহাকে তাহারা একদিনও দেখিতে পায় নাই। অনিলের মাতা গৃহের পানে চাহিয়া ডাকিলেন, "রেবা!"

সন্ন্যাসী একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র—তারপরে পুনর্ব্বার পুস্তকে মন দিলেন। শ্রান্তিতে অনিলের মাতা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না, রেবার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তিনি একেবারে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনিলও অধ্যয়নশীল ব্যক্তিটির সম্মুখে নিস্পন্দ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই ধূলার উপরেই পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে মাতার আহ্বান অনিলের কর্ণে প্রবেশ করিল, "অনিল এ দিকে আয়, ঘরে আয়।" অগত্যা অনিল উঠিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। দেখিল, রেবার মাতা গৃহকোণে শুইয়া আছেন, মস্তকের নিকটে তাহার মাতা—একপার্শ্বে কন্যা রেবা।

"অনিল, ঝাঁপানে করে তুইও হৃষিকেশে চলে যা। ধরমশালার কি অন্য কোন ডাক্তার বদ্যি বা ওষুধপত্র-জানা লোক যাকে পাবি, তাকেই এখানে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দে।"

রেবার মাতা এ কথা শুনিয়া যেন নিজের মনে অস্ফুট-স্বরে বলিল, "ঔষধং জাহ্নবী তোয়ং বৈদ্যনারায়ণো হরিঃ। ডাক্ রেবা বৈদ্যকে ডাক্, ওষুধ দিক্ সে।"

রেবা মাতার ওষ্ঠে বারি সিঞ্চন করিল। অনিল নির্ব্বাক হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল। শেষে মাতাকে বলিল, "তুমি তাহলে থাকবে?"

"আমিও যাব—ডাক্তার দেখে কি বলে, শুনে যাই,—কি বলিস্?"

অতি ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে রেবার মাতা এইবার যেন সজ্ঞান ভাবে বলিল,

"তোমরা একটু সুস্থ না হয়ে যদি এমন করো, আমি সে ওষুধের একবিন্দুও মুখে দেব না। আর—আর মিথ্যে ও-সব করোনা দিদি—আমার—আমার—আর কিছুর দরকার নেই। যখন নিতান্তই তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমায় যেতে দিলে না—যদি এমন সময়েও এলে—তবে—আরও একটু দয়া করো। স্নান করো—আর—একটু কিছু মুখে দিয়ে আমায় তৃপ্তি দাও।"

"আমরা পুলের ওপারেই নেয়ে জল-টল খেয়ে সুস্থ হয়ে নিয়েছি যে বোন!"

"তবে দু'টি চাল ফুটিয়ে মুখে দাও—ছেলেকে দাও। ওঠ্ রেবা।"

অনিলের মাতা আবার একটু আপত্তি করিতেছিলেন, কিন্তু রেবার মা যখন জোড় হাত করিয়া তাঁহার পানে চাহিল, তখন আর তিনি আপত্তি করিলেন না। রেবার সাহায্যে মাত্র হবিষ্যান্ন পাক করিয়া সকলে আহার করিলেন। স্থানটি জনশূন্য হওয়ার কারণ রেবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, কুরুক্ষেত্রে সম্প্রতি একটি দুর্লভ যোগ সংঘটিত হওয়ায় মাত্র আজ তিন চারিদিন আশ্রমের সকলে তথায় স্নান করিতে গিয়াছে। কেবলমাত্র বৃদ্ধ মহারাজ ও তাহার পিতা সেখানে উপস্থিত আছেন। তাহার মাতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—একটা বড় জোরে জ্বর আসিয়াই সহসা তাহাকে এমন করিয়া ফেলিয়াছে। রেবার মাতার অবস্থায় তাঁহারা বুঝিলেন, তাহার মৃত্যুর আর বড় দেরী নাই। তাহাকে প্রথমে দেখিয়াই ও আশঙ্কা অনিলের মনে আসিয়াছিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, ঝাঁপান্‌বাহী বেচারীরা টাকার জোরে সবই সহ্য করিতেছে বুঝিয়া এবং সব দিক ভাবিয়া অনিল মাতাকে বলিল, "মা, সলিল ভাবছে। ও বেচারারাও কষ্ট পাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, চল্ যাই।" তারপরে রুগ্নার মুখের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "কাল ডাক্তার নিয়ে আসব। আজ আসি দিদি, ছেলেরা—"

রুগ্না সচকিতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"একটু ভিক্ষে আমার দিদি।"

"বল দিদি কি বল্‌বে?"

"বল রাখবে? এ সময়ে কথা দিয়ে তা ভাঙবে না?"

অনিলের মাতা একটু চম্‌কিয়া গেলেন। না জানি, এই সময়ে তাহার কাছে এই মুমূর্ষু রমণী কি ভিক্ষাই চাহিয়া বসিবে! তিনি সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, একটু যেন বিব্রত ও বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। অনিল একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "বলুন, আপনি কি বলতে চান্।" অনিলের মাতা অনিলের পানে চাহিল, কিন্তু অনিলের দৃষ্টি রুগ্নার চক্ষের দিকে নিবদ্ধ। রুগ্না থামিয়া থামিয়া বলিল, "এই ভিক্ষে দিদি, আমাদের জন্য তোমরা আর ব্যস্ত হয়ো না। দুর্গম তীর্থ করে এলে, শরীরকে সুস্থ করে ছেলেদের নিয়ে বাড়ী যাও দিদি। আজ আমায় যা দিলে এই-ই যথেষ্ট।" অনিল মাতার পানে চাহিল—মাতা ছেলের দৃষ্টির নিকটে অপ্রস্তুত হইয়া দৃষ্টি নামাইলেন। সহসা সজোরে রুগ্না উচ্চারণ করিল, "আর দেরী করো না দিদি, রাত হবে। এ কুঁড়েয় কষ্ট হবে ছেলের। পায়ের ধূলো দাও, এস, আর না।"

আবার কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল,—অনিলের মাতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া কেবল রুগ্না ও ছেলের পানে চাহিয়া রহিলেন। অনিলও নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রেবার কণ্ঠস্বরে তাঁহারা আবার সচেতন হইয়া উঠিলেন—

"আপনারা আর দেরী করবেন না।" অনিল মাতার পানে চাহিতেই মাতা "যাই বাছা আজ—কাল আবার আসব" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইতেও তাঁহার কষ্ট হইতেছিল—অন্যায় বলিয়া মনে হইতেছিল, অথচ ছেলে-দের কষ্টের চিন্তাও তাঁহার অসহ্য। রেবাকে তিনি চুপি চুপি বলিলেন, "তোমার বাবা একবারও খোঁজ নিচ্ছেন না কেন মা?"

"তিনি তো এ ক'দিন এইখানেই আছেন, চলে যান্‌নি তো কোথাও।"

অনিলের মাতা বুঝিলেন, এই-ই তাঁহার খোঁজ লওয়া। মাতাকে যানে বসাইয়া অনিল সহসা মাতার নিকটে দুই হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। মাতা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "তবে আমায় চল চল করলি কেন? আমি তোর আক্কেল জানি বলেই উঠতে চাইনি। তুই না যাবি তো আমিও—"

"মা পায়ে পড়ি তোমার। সলিল সেখানে ভেবে অস্থির হবে। হয়ত এই রাতে এইখানে আমাদের খোঁজেই এসে পড়বে, তুমি যাও মা—সকালে বরং—"

"আর তুই এই রাত্রে এই জায়গায় ঐ কুঁড়ের মধ্যে—হয়ত রাত্রেই কিছু হয়ে যাবে—তখন তুই এই রাত্রে—না, আমি সে সহ্য করতে পারব না কিছুতেই।"

অনিল আর কথা কহিল না, কেবল জোড় হাতে 'মা' বলিয়া মায়ের মুখের পানে ভিক্ষার ভাবে চাহিয়া রহিল।

"তবে আমায়ও থাকতে দে না কেন?"

"সলিলের ভাবনার কথাও ভাব মা। এতে আমার কি এত বেশী কষ্ট হবে মা? এত দিন কত কাণ্ড গেছে মনে কর তো, তার উপরে আজকের রাতটিও ভিক্ষা দাও।"

"আচ্ছা, বস্ তবে, এই রাত্রে তুই পথে বেরুবিনে, কুঁড়ের মধ্যেই থাকবি?"

"তাই-ই থাকব মা।"

মাতা-পুত্রের বানানুবাদের কণ্ঠস্বর কুটীরেও বোধ হয় প্রবেশ করিয়াছিল। রেবা তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া বলিল, "আপনারা দু'জনেই যান্, ছোট ঘর, আমরা তিন জন আর উনি রোগী, সকলেরই অসুবিধা হবে নইলে।"

অনিল একটু অবাক হইয়া মেয়েটির পানে চাহিল। অপরিচিত যুবককে ঘরে স্থান দিবার পক্ষে এই যুবতীর এই আপত্তির উপর আর তো কথা চলে না! বিমূঢ়ের মত কেবল সে একবার বলিল, "অন্য কোন কুঁড়েয়ও কি রাতের মত একটু জায়গা দিতে পারবেন না?"

"না। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, ভয়ানক মেঘ উঠছে। আর দেরী করবেন না।"

এইবার অনিলের মা আকাশ পানে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এই দুর্য্যোগ রাত্রে যদি কিছু বিপদ ঘটে মা তোমাদের? একা তোমার বাবা—"

"আমরা দু'জনে আছি মাসীমা। আপনারা এইবার আসুন।"

আর কথার সময় না দিয়া রেবা চলিয়া গেল। নির্ব্বাক মাতা-পুত্রকে লইয়া বাহকরা তখন যান উঠাইল। মাতা মনে মনে নিজের কাছেও নিজে যেন বেশ লজ্জিত হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বাসায় পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই যখন সবেগে বৃষ্টি আসিল, তখন সেই কুটীরবাসিনী স্বাবলম্বিনী মেয়েটির উপরে তাঁহার ভক্তির অন্ত রহিল না। কি সর্ব্বনাশ! এই বৃষ্টিতে এই রাত্রে ছেলের কি হ'ত সেখানে না জানি!

সলিলের নিকটে তাঁহারা যথেষ্ট তিরস্কৃত হইলেন। সলিল জানাইল, তাঁহারা যদি আর এ রকম করেন তো সে আর তাঁহাদের সহযাত্রী হইবে না। মাতা ও ভ্রাতা সলিলের এ তিরস্কারেও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

শ্রান্ত অনিলের মাতার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অনিলের সন্ধান করিলেন। অনিল অতি প্রত্যুষেই উঠিয়া অভ্যাস-মত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। মাতা বুঝিলেন, আজ অনিল কোথায় গিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া তিনি চাকরকে একটা ঝাঁপান্ ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। শ্রান্তপদে গমনের বিলম্ব তাঁহার সহ্য হইবে না। সলিল শুনিয়া মুখ ভার করিল।

আশ্রমে পৌছিয়া তাঁহার যে পা কাঁপিতেছিল, তাহার বেশীর ভাগই ছেলের কাছে লজ্জায়। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, রেবাদের কুটীরটি তেমনি মুক্তদ্বার। মাতা উচ্চস্বরে ডাকিলেন "অনিল!"

অনিল নিকটেই কোথাও ছিল, আসিয়া মাতার নিকটে দাঁড়াইল। তাহার মুখ দেখিয়াই মাতা সমস্ত বুঝিলেন। মাতাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অনিলই তখন

বলিল, "কাল রাত্রেই শেষ হয়ে গেছে।"

মাতা ভগ্নস্বরে বলিলেন, "এরা সব কোথায় ?"

"দাহ শেষ করে স্নান করছে সব।"

মাতার দৃষ্টির প্রশ্ন বুঝিবা আবার সে বলিল, "আমিও এসে এমনি কাউকে দেখতে পাইনি। মহারাজের কাছে সব শুনে ঐ ওধার থেকে নীচে চেয়ে দেখলাম, চিতার ধূম উঠছে, একটু ঘুরে শেষ দাহ করাও উপর থেকেই দেখতে পেলাম। আর মিছে গিয়ে কি করব ব'লে বসে আছি—এখন তাঁরা স্নান করছেন।"

মাতা মৃদুস্বরে বলিলেন, "তবু গেলিনে কেন ? নিয়ে আসতিস্ সঙ্গে করে ওখান থেকে।"

"মা, তুমি পাগল ! ওদের দেখে কি বুঝছো না, মেয়েটি পর্য্যন্ত কি রকম করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে পুরুষের চেয়েও সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে শিখেছে। ওদের সঙ্গে ক'রে কারুকে আনতে হবে না। দু'জনে এই দুর্য্যোগরাত্রে কাঠ শব সব ঐখানে বয়ে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করতে পারলে, আর এখন উঠে আসতে পারবে না ?"

অনেকক্ষণ পরে মাতা বলিলেন, "যখন এলি, আমায় সঙ্গে নিয়ে এলিনে কেন ?"

তুমি তখন বড্ড গাঢ় ঘুম ঘুমুচ্ছিলে, তাই ডাকতে পারলাম না। রাত্রে এত জোরে মেঘ ডেকেছিল আর জোরে বৃষ্টি হয়েছিল যে, সমস্ত রাতই ঘুমুতে পারিনি, তাই খুব ভোরেই উঠেছিলাম।"

রেবা ও তাহার পিতা ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করিল। রেবার মাথা মুখ সমস্তই প্রায় ঢাকা, দৃষ্টি প্রায় আচ্ছাদিত, তাই সে বোধ হয় কোনদিকে না দেখিয়া একেবারে কুটীরের ভিতরেই প্রবেশ করিল। পিতার দৃষ্টিও লক্ষ্যশূন্য। চিন্তা-মন্থর গতিতে তিনিও কুটীরের দ্বারের নিকটে পূর্ব্বদিনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে

গিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইলেন, পরে সেই পুঁথিখানাও টানিয়া লইলেন। তাহাদের পদশব্দ পাইয়া পার্শ্বের কুটীর হইতে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন। ইঁহাকে অনিলের মাতা এ পর্য্যন্ত কুটীর হইতে বাহির হইতে দেখেন নাই। তিনি হস্তের ইঙ্গিতে অনিলের মাতাকে নিকটে ডাকিলেন এবং তাঁহাকে রেবার নিকটে যাইতে সঙ্কেত করিয়া অনিল ও রেবার পিতাকে নিজের কুটীরে আহ্বান করিলেন।

লজ্জায় বেদনায় অনিলের মাতার পা উঠিতেছিল না, তথাপি কোন রকমে রেবার নিকটে গিয়া বসিলেন। পদশব্দে চমকিয়া রেবা চাহিল, পরক্ষণেই একটা অস্ফুট 'মা' শব্দ করিয়া মায়ের পরিত্যক্ত স্থানে লুটাইয়া পড়িল। অনিলের মাতা এইবার তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন। এতদিন এ মেয়েটিকে তিনি যেন স্পর্শ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন। তাহার মায়ের সহিত কত কথা কহিয়াছেন, সেও কহিয়াছে; কিন্তু মেয়েটি একটি কথায়ও কখনো যোগ দিত না—দূরে দূরে সরিয়া থাকিত। তাহার মাতা বলিয়াছিল—ভগ্নীর মৃত্যুসংবাদের পর হইতেই সে এই রকম নির্ব্বাক্-নিস্তব্ধ গোছ হইয়া গেছে।

অনিলের মাতার ক্রোড়ে রেবার দেহটি কিছুক্ষণ ধরিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া তবে ক্রমে যেন স্থির হইল। তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া সে নতনেত্রে বলিল, "এত সকালে আবার আপনারা এসেছেন!"

সে কথার উত্তর না দিয়া মাতা বলিলেন, "একটু রোদে চল রেবা—কাপড়ে মাথায় বড্ড জল রয়েছে।"

"এ তো এখন আর মুছতে নেই!"

"তা জানি, একটু বাইরে রোদে যাই চল।"

"চলুন।"

উভয়ে বাহিরে আসিলে রেবা চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা আমাদের জন্য বড় কষ্ট পাচ্ছেন। কাল সবে পাহাড় থেকে এলেন—"

অনিলের মাতা সনিশ্বাসে বলিলেন, "মা, তা না হ'লে কি তোমার মাকে কাল অমন সময়েও ফেলে রেখে যেতাম? সত্যই যে সে কেবল আমার সঙ্গে দেখাটুকুর অপেক্ষায় ছিল, তা তো জানি না, জানিনা যে সকালে এসেও দেখতে পাব না! এ খেদ আমার চিরদিন থাকবে রেবা।"

"থেকে আর কি করতেন? তিনি আর বেশী কথা কন্‌নি। কেবল বাবার পায়ের ধূলো নিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণা কৃষ্ণা বলে ডেকেছিলেন মাত্র। কষ্টও আর কিছু হয়নি—আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে গেলেন যেন।"

অনিলের মাতা অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "সে আমায় এ ক্ষোভ দিয়ে গেল কেন, তাই আমি ভাবছি। তার সঙ্গে কি জন্ম-জন্মান্তরে কোন যোগ ছিল আমার? নইলে কোথা হতে কোথায় এসে তাব সঙ্গে আমাব এ দেখা—আর এমনি করে তাব চলে যাওয়া,—এ যেন—" বলিতে বলিতে অনিলের মাতা রুদ্ধকণ্ঠে থামিয়া গেলেন। এই মৃতাকে তিনি যতখানি ভালবাসিয়াছিলেন, তাহার এই মৃত্যুতে যেন তাহা তাঁহার নিকটে চতুর্গুণ হইয়া উঠিযাছিল। রেবা বিস্ফাবিত চক্ষে এই সম্পূর্ণ অপরিচিতা অনাত্মীযা রমণীর অশ্রুজল চাহিয়া দেখিল—সহসা যেন সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল—ইহার ক্রোড়ে পড়িয়া মা বলিয়া কাঁদিবার জন্যই তাহার অন্তর যেন আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বহু-দিন হইতেই সে মনে এইসব আকুলতাকে বদ্ধ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাই আজও সে ঐ ভাব দমন করিয়া শুধু বলিল, "মা একদিন আপনাকে বলে-ছিলেন যে, আপনি আর-জন্মে তাঁর দিদি ছিলেন।"

"তাই কি সে এমন করে গেল রেবা? বোনের কি এই কাজ? যদি একদিন আগেও যেত!"

"তা হলেও আপ।ন দুঃখ পেতেন মাসীমা যে একদিনের জন্যে কেন দেখা হ'ল না?"

"তা ঠিক মা। তোমার কথা তোমার বাবাকে কি কিছু বলে গিয়েছে

জান ?”

রেবা সপ্রশ্ন নয়নে চাহিয়া বলিল, “তাঁকে আর কি বলবেন ? আমি—আমি একবার ‘মা, আমি কার কাছে থাকব’ বলায় তিনি উপরে হাত তুলে—”

রেবার কণ্ঠ রোধ হইল। দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে বসিয়া পড়িতেই আবার অনিলের মাতা তাহার মস্তক ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “আমার কাছে তুমি থাকবে রেবা। তিনি মুখে না বললেও নিশ্চয় আমাকেই তোমায় দিয়ে গেছেন। নইলে তাঁতে আমাতে এই দেখাশোনা, এই স্নেহবন্ধন এর কোন অর্থই হয় না। ভগবান কি বিনা উদ্দেশ্যে কোন কিছু করেন ? আর এই যে এই ক্ষোভটা সে আমায় দিয়ে গেল, এরও যেন দরকার ছিল আজ বুঝতে পারছি। তার সঙ্গে জন্মজ-ন্মান্তরে সম্বন্ধ আছেই নিশ্চয়, আমি তা মানছিলাম না বলেই বুঝি—! আমি তোমার মাসীমা—আমি তোমার মা রেবা—আমার কাছেই তুমি থাকবে।”

১৭

অনিলের মার এই ঝোঁক তাঁহাকে স্থায়ী ভাবেই পাইয়া বসিল। রেবার অশৌচান্ত এবং মাতৃকৃত্য শেষ হওয়ার অপেক্ষায় হৃষিকেশের বাসায় তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সলিল রাগ করিয়া একাই দেশাভিমুখে রওনা হইয়া গেল, তথাপি তিনি দমিলেন না। অনিলও মাতার এই স্বভাবের বহির্ভূত দৃঢ় সৎসাহসে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “দেখো মা, ঝোঁকের মাথায় এটা যেন করো না। ঝোঁক জিনিসটা চিরস্থায়ী বস্তু নয়। এটি তোমার কর্ত্তব্য

বলে যদি ঠিক মনের সঙ্গে বুঝে থাক তবেই করো, নইলে শেষে কোন কিছুর ত্রুটীতে মনের এ উচ্ছ্বাস নেমে গিয়ে একটা এর উল্টো বিশ্রী জিনিস এসে পড়া কিছু বিচিত্র নয়।"

মাতা চটিয়া বলিলেন, "তুই এমন কথা বল্‌ছিস্? আমায় পরীক্ষা হচ্ছে বুঝি?"

"না মা, পরীক্ষা নয়। ধর, মেয়েটি যদি তোমার মনের মত না হয়, এই অপরিচিত স্থান থেকে এত বড় আইবুড়ো মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে রাখার যত দায়িত্ব—"

"আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখব কেন? দেখে শুনে বিয়ে দেব। যেখানকার মেয়ে, সব তো জেনেছি। তোকে ওসব মিছে ফ্যাকৃড়া তুলতে হবে না বাপু, বলে দিচ্ছি।"

"বিয়ে দেবে! সেটা খুব সহজ কাজ হবে মনে করছ? ওদের ব্যাপারগুলো ভুলে গেছ কি মা? তার চেয়েও এখন হাঙ্গামা শত গুণে বেশী হবে জেনো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা বাপু, সে হাঙ্গামা আমি পোয়াতে রাজী আছি। নিতান্ত বিয়ে দিতে না পারি, আইবুড়ো মেয়ের মত আমার কাছেই থাকবে। আমারও তো সংসারের দ্বিতীয় উপলক্ষ্য নেই, না একটা মেয়ে, না একটা কিছু। রেবা না হয় আমার মেয়ের মতই থাকবে!"

অনিল এইবার প্রসন্ন মুখে বলিল, "হাঁ, তা হলে তুমি পারবে মা। নিজের কোন স্বার্থ-সম্পর্ক বা মনের খানিকক্ষণের ঝোঁকে এত বড় দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। যা আমরা প্রত্যাশা করব, ধর, যদি তা নাই ঘটে, তখন বিরক্ত হয়ে মেয়েটিকে অকূলে না ভাসিয়ে দিই বা বোঝা জ্ঞান ক'রে তাকে কষ্ট না দিতে থাকি! তার চেয়ে সে যে-রকম স্বাবলম্বী জীবন পেয়েছে তাতেই তাকে থাকতে দেওয়া উচিত। মেয়েটির ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট না হয়।"

"তুই বলিস্ কি অনিল! বাপ তো ঐ রকম, মা ছিল বলেই এতদিন এক

রকমে কেটেছে। এখন ঐ সন্নিসী-দলের মধ্যে ঐ মেয়ে এইভাবে বাস করবে, এ কি ঠিক? আমরা স্বজাত স্বশ্রেণীর লোক হয়ে এই রকমে মেয়েটাকে ভেসে যেতে দিলে আমাদেরই কি অধর্ম্ম হবে না?"

"ভেসে হয়ত মেয়েটি যেত না, কিন্তু আমরা যখন সক্ষম, আর কিছু না হোক্, একটি স্বজাতি মেয়ের ও ভারটুকু যখন স্বচ্ছন্দে নিতে পারি, তখন আমাদের পক্ষে এতে অধর্ম্ম হ'ত বই কি!"

অনিল ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু মেয়েটি রাজী হবে তো মা?"

"ও এখন মায়ের শোকে অস্থির। ওর রাজী অরাজীর কি স্থিরতা আছে? ওর বাপ আর গুরু মহারাজরা তো আমাদের কথায় আপত্তি কিছু করলেন না, দেখলি তো!"

অনিল চিন্তিত ভাবে বলিল, "না মা, তাতে শুধু হবে না। তুমি তার স্পষ্ট জবাব নিও।"

"আচ্ছা, তাও নেবো বাপু—তুই আর আমার মনে সাত তর্ক তুলে দিস্‌নে কেবলই।"

"সব তর্কগুলোর মীমাংসা করে নেওয়াই এ ক্ষেত্রে উচিত মা।"

কিন্তু অনিলের মাতাকে এজন্য স্বতন্ত্রভাবে কিছুই প্রশ্ন করিতে হইল না। রেবার পিতার গুরু মহারাজ এবং সাধু জ্যাঠা মহাশয় যখন রেবাকে বলিলেন, "মা, সংসার যখন তোমাকে চাচ্ছে, তখন তোমায় এভাবে রাখা আমরা উচিত মনে করছি না। তোমার মায়ের মত যিনি তোমার ভার নিচ্ছেন, তাঁদের পরিচয় আমরা এ পর্য্যন্ত যত রকমে পেলাম, তাতে তোমায় তাঁর হাতে সমর্পণ করতে আমরা একটুও দ্বিধা করছি না। তোমার বাপেরও এতে মত আছে। এই উদাসীনদের মধ্যে থাকার চেয়ে তোমার সংসারে থাকাই আমরা ভাল মনে করছি।" তখন রেবার নত মস্তক এবং শান্ত সংযত মুখ বিদ্রোহ-সূচক ঈষৎ ভঙ্গীও প্রকাশ করিল না। তথাপি অনিলের মা সময়ান্তরে রেবাকে নির্জ্জনে

প্রশ্ন করিলেন, "মা—সত্যি করে বল, বাপের কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি ব'লে তুমি রাগ করছ না ?" রেবা তেমনি শান্ত মুখে একটু বিষাদিত স্বরে কেবল বলিল—"না মাসীমা। আপনি তো জানেন সবই, বাবা মা আমাদের জন্য অনেক কষ্টই সয়েছেন। মা শান্তিধামে গিয়ে তবে শান্তি পেলেন,—বাবা জগতে থেকেই যদি পান—আমার জন্য তা আমি কেন রোধ করব ?"

"আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার ভাবনা হচ্ছে না তো ? কষ্ট হচ্ছে কি তোমার ?"

"কষ্ট হচ্ছে মাসীমা—ভাবনা হচ্ছে না।"

রেবার নত মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাতা বলিলেন, "আমায় মা বলবে রেবা ? আমি তোমার মা হ'ব।"

ধীরে ধীরে রেবা তাঁহার ক্রোড়ে এইবার শুইয়া পড়িল, তাহার চোখের জল এবং দেহের কম্পনে তিনি বুঝিলেন, রেবা বড় কান্নাই কাঁদিতেছে। কিছুক্ষণ পরে ভগ্নস্বরে রেবা বলিল, "আপনাকে আমি মা-ই বলতাম ! মাকে না ডেকে থাকতে পারতাম না তো ! আপনার ভিতরেই আমার মা বসে আছেন, আমি বুঝতে পারছি।"

অনিলের মা এইবার স্নেহ-উদ্বেল হৃদয়ে তাহার পাণ্ডু গণ্ড ও রুক্ষ মস্তকের উপর চুম্বন করিলেন।

ক্রমে বিদায়ের দিন আসিল। অনিল কিন্তু সেদিন মাতার সঙ্গে রেবাকে লইতে আসিল না। মাতা অসন্তুষ্ট হইলেন, তিরস্কার করিলেন। কিন্তু রিজার্ভ গাড়ীর বন্দোবস্তের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া মাতার যাত্রার পুর্ব্বেই হরিদ্বারে চলিয়া গেল। মাতাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কেবল বলিল, "মা, কেন রাগ করছ ? যে কর্ত্তব্য তুমি মাথায় নিচ্ছ, তাতে কি আমারও অংশ নেই ? কিন্তু তবু রেবাকে আমার আজ নিজে আন্‌তে যেতে কেমন ভাল লাগছে না। ওঁরা কি জানি অন্য কিছু মনে করতে পারেন হয় তো। তুমিই একা যাও মা।"

"কি তারা মনে করবে বলে তোর এ ভয় শুনি ? আমি আনলে কি তোর আনা হবে না ?"

"নিজে আনার বেশী হবে মা বরং, অথচ কোন সন্দেহ জন্মাবে না।" আর প্রতিবাদের অবসর না দিয়া অনিল চলিয়া গেল।

অগত্যা সঙ্গের পুরাতন চাকর দাসী লইয়াই অনিলের মাতা রেবাকে আনিতে গেলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন, অনিলকে না দেখিয়া তাহারা না জানি কি বলিবে বা কি করিবে। কিন্তু সে বিষয়ে যেন কেহ লক্ষ্য মাত্র করিল না। সকলের নিকট বিদায় এবং আশীর্ব্বাদ লইয়া রেবা একবার নিজেদের কুটীরে গেল—কিছুক্ষণ পরে মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া অনিলের মাতার নিকটে দাঁড়াইল। অনিলের মাতা সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিলেন, "চল মা এইবার—সময় যাচ্ছে।"

"চলুন।" সম্মুখে পিতা এবং বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সাধুদ্বয়, চারিদিকে আজ তিন বৎসরের স্বজনের মত অন্যান্য সাধুরা—তাঁহারা অদ্য কয়দিন কুরুক্ষেত্রে স্নানের পর ফিরিয়াছেন। চলিতে গিয়া রেবা আসিয়া মুখ তুলিয়া তিন জনের পানে চাহিয়া সহসা বলিল, "যদি কখনো এখানে আসি, আপনাদের দেখতে পাব তো ?"

বৃদ্ধ সাধুদ্বয় বলিলেন, "পাবে বই কি—যদি ততদিন এ দেহ থাকে। আমরা আর কোথায় যাব ?"

পিতা উত্তর দিলেন না দেখিয়া রেবা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়াই রহিল। তখন সেই ক্ষীণদেহ দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী রেবার নিকটস্থ হইয়া তাহার মস্তকে হস্ত রাখিলেন। চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল নীরবে কি যেন ধ্যান করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সংসার আবার যদি তোমায় তাড়িয়ে দেয় রেবা - এই-খানেই এস। তোমার বাবার আর তো তোমাদের কাছ থেকে একলা হবার জন্য

এদিক ওদিক সরে যেতে হবে না, যতদিন তার দেহ থাকে, ঐ শূন্য কুঁড়েতেই এখন সে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।”

“বাবা” বলিয়া রেবা এইবার তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। বৈরাগী চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে কুটীরের দিকে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতে অনিলের মা রেবার হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাহার কটি বেষ্টন করিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে রেবাও চলিল। চলিতে চলিতে পথের যে স্থান হইতে গঙ্গার স্রোত-ধারা দেখা যায় সেই দিকে কয়েকবার হেলিয়া রেবা হাত জোড় করিয়া কাহাদের যেন প্রণাম করিয়া হৃষিকেশের সমতল ভূমিতে নামিয়া নাগাধিরাজের উদ্দেশে যাত্রাপথের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। শকট হইতে সমস্ত পথ সে শান্তভাবে কেবল পশ্চাতে চাহিতে চাহিতেই চলিয়াছিল। শীঘ্রই সে শান্ত হইয়া পূর্ব্বের মত অনিলের মাতার সহিত কথা কহায় তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন।

সলিল রাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদেরও বাড়ীর দিকে মন টানিতেছিল, কিন্তু এখনো যে তাঁহাদের বহু তীর্থ এবং জায়গা ভ্রমণ বাকী। পথের নিমিতীর্থ সারিয়া তাঁহাদের রাজপুতানার দিকে যাইতে হইল। তথা হইতে ক্রমে মথুরা বৃন্দাবন। সেখানে অনিল একটু বেশী দেরী করিয়াই ফেলিল। মাতা তাগাদা দিতেছিলেন, কিন্তু অনিলের শ্রান্তি দেখিয়া অগত্যা যেখানে পাঁচদিন বিলম্ব হইবার কথা, সেখানে দশদিন করিতে হইতেছিল। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি ঘুরিয়া আউধের তীর্থে অযোধ্যায় আবার অনিল কিছু-দিনের জন্য আড্ডা পাতিল। সে দেবতা দেখিতে, মন্দির দেখিতে তো বেশী ছুটাছুটি করিত না, কেবল পুণ্য সরযূ তীরে গিয়া তাহার জল স্পর্শ করিয়া বসিয়া দেবী জানকী এবং তাঁহার লোকরঞ্জন নিঠুর অথচ একপত্নীব্রতধারী স্বামী রামচন্দ্রের কথা ভাবিত। সীতাকে বনে পাঠাইয়াও যে নির্দ্দয় তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি

লইয়া জীবন কাটাইয়াছেন—আর যিনি দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেই অনন্ত-প্রেমিক স্বামীকে পাইয়াও সে অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই, পাতালে গিয়া লুকাইলেন—তাঁহাদেরই কথা কেবল অনিল বসিয়া ভাবিত।

কাশীতে অনিলের মাতাও কিছু দেরী করিলেন। নিকটের বস্তু ফেলিয়া দূরে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মনে কেমন একটা অস্বস্তি ছিল, এতদিনে তাহা মিটিল। আরও দেখিলেন, রেবাকে লইয়া এই যে তাঁহারা দুইমাস ধরিয়া সেই জন-বহুল তীর্থগুলিতে ফিরিতেছেন, ইহাতে তাহার শোকস্তব্ধ চিরমৌন অন্তর যেন নূতন হইয়া গড়িতেছে। সে তাঁহাকে এখন কেবল 'মা' বলিয়া ডাকিয়াই ক্ষান্ত নয়, কন্যার মত স্নেহে, যত্নে সেবায় ধীরে ধীরে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াই ধরিতেছে। কন্যা না থাকায় যাহা পান্ নাই, সেই কন্যার স্নেহে রেবা তাঁহার অন্তরকে পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। কর্ত্তব্য বলিয়াই যাহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন, সে এখন পূর্ণ স্নেহের দাবীতে ধীরে ধীরে অন্তরে আসন পাতিয়া বসিতেছে।

কাশীতে পূজা কাটিয়া গেলে তাঁহারা দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে ঘরের দিকে চলিলেন। গয়ায় নামিয়া অনিল আবার দেরী করিতেছে দেখিয়া মাতা এইবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনিল হাসিয়া বলিল, "এই ক'টা দিন মা,—তারপরে আবার যে ঘর সেই ঘর,—তাই মনে হচ্ছে যে-ক'দিন পারি আর—"

মাতা বাধা দিয়া বলিলেন, "না, যে ঘর সেই ঘরে আর আমি একদিনও বাস করতে পারব না বাপু, তা কিন্তু বলে রাখছি! বাড়ী গিয়েই রেবাকে দিয়ে নতুন করে আমার ঘর সাজাব।"

অনিল একটু থামিয়া চেষ্টার দ্বারা একটু হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি এত তাগাদা?"

"এর নাম আবার তাগাদা? ছেলের খেয়ালে আমার মত এমন করে সংসার বিসর্জ্জন দিতে কে পারে বল্ দেখি? কিন্তু আর নয়, এই অগ্রাণ মাসেই আমার

ঘর-দুয়োরকে নতুন করে সাজানো চাই, এ শুনে রাখ্।"

অনিল ধীরে ধীরে বলিল, "বেশ তো—কিন্তু মা, সলিল রাজী হবে তো? মেয়েটি একটু বড়—"

তাতে মাতা পুত্রের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুই আর বিয়ে করবি নে?"

মাতার এই দৃষ্টিতে পুত্র মাথা নামাইল। মাতা তাহার উত্তরের সম্ভাবনা না দেখিয়া বলিলেন, "বিয়ে না করিস্, এই বেলা ঠিক করে বল্,—আমি কাশীবাস করব। তুই বাড়ী যা, গিয়ে সলিলের বিয়ে দিতে হয় দিস্, না হয় অমনি থাকিস্ দুই ভাইয়ে, আমিও মেয়েটাকে নিয়ে মনে করব, আমার ছেলে হয়নি—কেবল একটা মেয়ে—" বলিতে বলিতে অশ্রুজলে অনিলের মার কণ্ঠ-রোধ হইল। অনুতপ্ত পুত্র 'মা' বলিয়া নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিতেই মা সবেগে পা টানিয়া বলিলেন, "ওতে আর আমায় ভুলুতে পারবিনে! যার মায়ের উপর এতটুকু দরদ নেই, মার দুঃখের দিকে এতটুকু নজর নেই, সে আবার ছেলে! আমি কার জন্যে সংসারে যাব—যাব না আর তো!" মাতা সক্রোধ অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন, আর পুত্র মাথায় হাত দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে মাতা তেমনি বিমুখভাবেই উঠিবার চেষ্টা করিতে অনিল তাঁহাকে বাধা দিয়া সনিশ্বাসে বলিল, "আমি তো অনেকদিনই তোমার যা খুশী আমায় নিয়ে তাই করতে বলেছিলাম মা। তুমিই করনি। বেশ, যা বলছ তাই হবে!" মাতা পুত্রের দিকে এবার ফিরিয়া বলিলেন, "রেবার মত মেয়েকে বিয়ে করতেও যে তুই সেই এক কথাই বলবি, এ আমি ভাবতে পারিনি। আমি বরং ভাবছি—"

"যাক্ মা—চল আজ বুদ্ধ-গয়া দেখে আসি। আর এক সপ্তাহ থাকতে দেবে এখানে?"

"তা কি আমি বারণ করছি—তবে সলিলের কনে খুঁজতে হবে, তাই এত

তাড়াতাড়ি।"

কিন্তু তাহা হইল না, দুই চারি দিন পরে যেই অনিলের মাতা শুনিলেন যে, অসময়ে সেখানে মারাত্মক বীজের বসন্ত হইতেছে, অমনি তল্পী গুছাইতে লাগিলেন। অনিল যত বলে, "মা, বসন্তের সময়ে তার পৈত্রিক দেশে আমরা কাটিয়ে এলাম—আর প্রায় ঘরে এসে কেন এত ভয় করছ?" ততই মাতার ভয় যে ঘরে ফিরিতে পারিলে বাঁচি।

গাড়ী রিজার্ভের বন্দোবস্ত হইতেছে, এমন সময়ে রেবা তাঁহাকে বলিল, তাহাকে যেন হরিদ্বারের টিকিট করিয়া সেই দিকের গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়। মাতা অবাক হইয়া রেবার পানে চাহিলেন, রেবা আজ মুখ নামাইয়া রহিল। মাতা বুঝিলেন, সে সব শুনিয়াছে এবং অনিলের শুষ্ক বিষণ্ণ মুখ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় স্তব্ধভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু যাই হোক্—তবু রেবার এ কথায় তাঁহার অপমান বোধ হইল। রেবা অনিলের এইটুকু অসম্মতিতে এমন কথা বলিতে পারিল! তাহার ছেলেকে কি তাহার সহস্র অনিচ্ছা অপছন্দের মধ্যেও লাভ করিতে পারিলে রেবা তাহাকে ভাগ্য বলিয়া মানিতে পারিতেছে না? আশ্চর্য্য বটে! অনিলের মা মুখ ভারি করিয়া বলিলেন, "তুমি ভাবছ কেন রেবা—আমি দেশে গিয়ে তোমার বাপ মা তোমায় যেমন পাত্রে দিতেন, তেমনি পাত্র খুঁজে বিয়ে দেব। এ কথা আমায় জানালে, ভালই করলে, কিন্তু সেজন্য তোমায় চলে যেতে হবে না মা। বৌ না করেও তোমায় ঘরে জায়গা দিতে পারি, এতটা জায়গা আমার ঘরে আছে। মেয়ের মত রাখব বলেই তো নিয়েছি তোমায়, তাই হবে।"

রেবা মাথা তুলিল না—নিঃশব্দে শুধু তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আমার বাবার কাছেই যেতে হবে মা—তাঁর কাছেই আমি থাকব।"

"আমার সঙ্গে তাহলে তুমি যাবে না? এতটা অকৃতজ্ঞতা তুমি করতে

পারবে রেবা ? আমি তোমায় মেয়ের মতই রাখব বলছি, তাও এই কথা বলছ ?”

রেবা একই ভাবে বসিয়া রহিল। মাতা বুঝিলেন, তাহার সংকল্প দৃঢ়। রাগে বিরক্তিতে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, “তোমার বাবা যখন এসে এ কথা বলবেন, তখন তাঁকেই তোমায় ফিরিয়ে দেব —তার আগে নয়। সেই হরিদ্বারে এখন আমি তোমায় পৌঁছুতে ফিরে যেতেও পারব না—আর তোমার হুকুমে তোমায় একা ছেড়ে দিতেও পারব না। এ অধিকার আমায় তোমার স্বজনেরা দিয়েছেন জেনো।”

“আমি একা যেতে পারব মা!”

তাঁহার সক্রোধ কঠিন ভাষার উত্তরে একি বিনীত কোমল ভাব! মৃদু মধুর কথা! মাতা ক্ষণেক তাহার দিকে চাহিয়া সহসা তাহাকে কোলের দিকে টানিয়া লইলেন—“অভিমানী মা আমার! আমাব ছেলেকে এখনো চিনতে পারিস্‌নি! কিন্তু ভগবান যদি দিন দেন, তখন বুঝবি, দেখবি তখন—”

রেবা ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, “আমায় যেতেই হবে মা।”

অনিলেব মাতা আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে অনিল আসিয়া ডাকিল, “মা—”

পুত্রের দিকে চাহিযাই মাতা চম্‌কিযা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—“অত মুখ লাল কেন তোর ? চোখ অমন কেন অনিল ?”

“মা বড্ড জ্বর এল—কি হবে মা—গাড়ী ঠিক, কালই যে বেরুতে হবে—কিন্তু কি করে যাব ?—বড়—বড় যন্ত্রণা মাথায়।” অনিল বলিতে বলিতে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

মাতা পুত্রের উপর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উবুড় হইয়া তাহার শরীরের তাপ নিলেন —“ওরে, গা যে তপ্ত খোলা হয়ে উঠেছে! হরি—মধুসূদন—এ কি করলে ?”

রাত্রিটুকু অনিলের অজ্ঞান ভাবেই গেল। প্রভাতে একবার চাহিয়া বলিল,

"মা, কি করে বাড়ী যাব ?"

"তোকে কোলে করে নিয়ে যাব অনিল। সব ঠিকই তো করে রেখেছি — কেবল গাড়ীতে উঠে বসা মাত্র। সলিলকে টেলিগ্রাম করে দিলাম—ষ্টেশনে থাকৃতই সে—তোর অসুখ জানালাম।"

"গাড়ীর ঝাঁকুনিতে কষ্ট হবে না মা বেশী ?"

"বেশী তো লাগবে না ঝাঁকুনি বাবা—বাড়ী চল্—তবু এখানে আর থাকব না।"

"মা, তা না থেকেই কি আর উদ্ধার পাবে ? বসন্তই হ'ল নিশ্চয়, দ্যাখো দেখি ভাল করে আমায় !"

মাতা সজোরে চক্ষু বুজিয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "হোক্ —মা ভাল ক'রে দেবেন আবার। তবু এখানে আর থাকব না।"

ট্রেনে উঠিতে যাইবার সময় সহসা তাঁহার রেবার কথা মনে পড়িল। চাকরকে আদেশ করিলেন, সে যেন হরিদ্বারের তিনখানা টিকিট করে এবং রেবা ও একটা ঝিকে লইয়া রেবাকে যথাস্থানে পৌছিতে যায়।

অনিলকে সন্তর্পণে রিজার্ভ ক্লাশে তুলিয়া নিজে উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন,— পার্শ্বে রেবা। "ওকি ! তুমি এ গাড়ীতে কেন বাছা ? হরিদ্বারে যাওয়ার এ গাড়ী নয় ! তুমি হরির সঙ্গে যাও। হরি আর নদের-মা তোমায় সেখানে পৌছে দিয়ে আসবে।" রেবা নড়িল না। অনিলের এই আকস্মিক ব্যারামে আজ মাতার মন রেবার উপর সহসা একান্ত বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "আবার কি সেখান থেকে তোমায় পাঠাতে ব্যস্ত হ'তে হবে ? দেখছ আমার সে সময় নয় ! ভগবান কি করবেন আমার, তাই দেখি, তুমি বাপের কাছে যেতে চাও, যাও বাছা।"

মাতার রুষ্টস্বরে অনিল বিস্মিতভাবে উভয়ের মুখের দিখে চোখ মেলিয়া চাহিল। মাতার সেই কঠিন এবং অনিলের বিস্মিত রোগমূঢ় দৃষ্টির মধ্যে রেবা

একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল, তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "হরি আর নদের' মারাও এই গাড়ীতে উঠেছে। তাদের হরিদ্বারে যেতে হবে না ব'লে দিয়েছি।'

দীর্ঘ এক মাস না এক বৎসর! জীবনের মধ্যে বহু বহু বার প্রবাহিত কোন বৎসরেও বুঝি অনিলের মার এমন করিয়া কাটে নাই। এই এক মাস যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভীষণ ব্যাধিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া রাখিয়া কোন রকমে তিনি অনিলকে জীবনের এপারে আনিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যাহারা মাত্র দর্শক, তাহারা বলিতেছিল, "হায়! হায়! অনিল বাঁচিতে পারে বটে, কিন্তু সে অনিলকে কি আর কেহ ফিরিয়া পাইবে? ভীষণা রাক্ষসীর চর্ব্ব্যমান দশন-পংক্তির ভিতর হইতেই যে অর্দ্ধপিষ্ট অনিলকে টানিয়া বাহির করা হইল, তাহার দংষ্ট্রাঘাতের ঐ দারুণ চিহ্নগুলি কি আর এই অনিলকে সেই অনিল হইতে দিবে?"

কিন্তু যাহারা বুকের রক্ত, চক্ষের জ্যোতি, নিজ নিজ জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ঢালিয়া মাত্র তাহার প্রাণটুকু ফিরাইতে চাহিতেছিল, তাহাদের সেদিকে তখন চাহিবার সময় কই? আর চাহিলেও অনিল যদি অন্ধ, খঞ্জ, বিকৃতদর্শন হইয়াও নিজের দেহপ্রাণটুকু মাত্র তাহাদের পুরস্কার দিতে পারে, সে-ই যে তখন তাহাদের পরমলাভ! আজ একমাস অনিলের মাতার বুকের নিকটে অচৈতন্য অনিলের বিভীষিকাময় দেহ—পার্শ্বে শিশির, সলিল, আর অভিশপ্ত তীর্থযাত্রার ফল—একটা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা-ক্লান্তি ও বাক্যহীন জীব, যে শেষমুহূর্ত্তে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছার মধ্যে জোর করিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে! যাহাকে প্রথম কিছুদিন তাঁহাদের নিকটে দেখিলেই অনিলের মার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ধরিয়া যাইত! এই অলক্ষণা, এই হতভাগী, ইহাকে ঘরে আনার জন্যই বুঝি আজ তাঁহার এ সর্ব্বনাশ! ইহারই সঙ্গে অনিলের বিবাহ দিবার ইচ্ছামাত্রেই বুঝি অনিলকে বিধাতা তাঁহার বুক হইতে কাড়িয়া লইতেছেন! একটা সংসার যাহার জন্য পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে তিনি নিজের সর্ব্বনাশের

জন্যই বুঝি এমন করিয়া স্কন্ধে লইয়াছেন।

কিন্তু হতভাগী তো এই একমাস এক নিমিষের জন্যও তাহার পদতল ছাড়িল না.! ডাক্তার হতাশ হইয়া চলিয়া যাইতেছে—সলিলও এক একবার অন্য ঘরে কিছুক্ষণের জন্য পলাইয়া সাম্‌লাইয়া আসিতেছে, শিশিরের অক্লান্ত হস্ত ও নির্নিমেষ চক্ষুও নিরাশার ভারে আচ্ছন্ন হইয়া সেই রোগশয্যার পার্শ্বেই লুটাইয়া পড়িতেছে, কিন্তু এই যে একমাস একভাবে সেই ভীষণ রোগীর গৃহে সেই অলক্ষণাটা দিবারাত্রি অতন্দ্র অশ্রান্তভাবে যাহার যাহা প্রয়োজন—যখন যাহা দরকার, তাহা সকলের হাতে হাতে জোগাইয়া দিতেছে, ইহার তো ক্লান্তি শ্রান্তি নাই। প্রথম দিকে অনিলের মাতা তাহাকে অনিলের শয্যার দিকে আসিতে দিতেন না—তাহার দিকে চক্ষু পড়িলেই তাঁহার মুখ হইতে এমন সব কথা বাহির হইতে থাকিত যে, সলিল শিশিরও সেই জীবটার জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিত। এক একবার তাহারা মাতাকে মিনতি করিয়াই শান্ত করিত—কিন্তু সে জীবটা তো তাহাতে এক নিমিষের জন্যও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। নির্ব্বাক প্রস্তর-প্রতিমার মত নতমস্তকে ঘরের এককোণে বসিয়া থাকিয়াছে এবং যখনি কাহারো কিছুর প্রয়োজন হইত, অমনি সেই নিশ্চল প্রতিমাটাই সর্ব্বাগ্রে ত্রস্তে তাহা সকলের হাতের নিকটে আনিয়া দিয়াছে। প্রাণপণ যুদ্ধের ফলেও যখন অনিলের পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছিল, ক্ষতগুলা ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল, সহস্র প্রতিষেধক ঔষধেও যখন সেই পচন ও ক্ষতের দুর্গন্ধ কিছুতে নিবারিত হয় নাই, রোগীর দিকে চাহিয়া আত্মীয়-স্বজনে যখন অসহ্য কষ্টে চোখ ফিরাইয়াছে এবং অনিলের পুনর্জীবনের আশায় হতাশ হইয়া তাহাদের হাত-পা যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তখন দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ প্রাণীটিই দ্বিগুণ বলের সহিত রোগীর সমস্ত শুশ্রূষার ভার নিঃশব্দে নিজ হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। অবসাদগ্রস্ত আত্মীয়েরা তখন শুধু জড়ের মত, জ্ঞানহীনের মত, কেবল রোগীর মুখপানে চাহিয়া দিন কাটাইয়াছে, আর এই 'পরস্থাপি

পর' মেয়েটি দ্বিগুণ একাগ্রতার সহিত সেই মুমূর্ষুর ওষ্ঠে খাদ্য পানীয় তুলিয়া দিয়াছে, ভীষণ ক্ষতগুলিকে সযত্ন কোমলহস্তে মুহুর্মুহুঃ পরিষ্কার করিয়াছে, ঔষধ প্রলেপ দিয়াছে, অজ্ঞান রোগীর সামান্য অঙ্গসঞ্চালন ও মুখভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দিন রাত্রি অতন্দ্রভাবে তাহার মুখের নিকটে অবনত হইয়া বসিয়া থাকিয়াছে। বিকারতপ্ত মুণ্ডিতমস্তকে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া শীতল বস্তু প্রয়োগেও যখন সুস্থির করিতে না পারিয়া শিশির ও সলিল বরফের টুপি ছুড়িয়া ফেলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন সে ত্রস্তে সেই টুপি কুড়াইয়া আনিয়া নূতন করিয়া তাহাতে বরফ পুরিয়া রোগীর মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। ক্ষতের গন্ধে আকৃষ্ট পিপীলিকা এবং বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত কীটের আক্রমণ হইতে ক্ষতকে রক্ষা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়গুলাকে ক্ষণে ক্ষণে সে সুসংস্কৃত করিয়াছে, পাছে মুহূর্ত্তের অবহেলায়ও কোন ক্ষতি হয়। এমনি করিয়া যখন কয়েকদিন ও রাত্রি কাটিয়া গেল, সচেতনেও মূর্চ্ছাগ্রস্তা অনিলের মাতা যখন ডাক্তারের হর্ষোৎফুল্ল মুখে আশার আভাস পাইয়া গৃহতল ছাড়িয়া পুত্রের শয্যাপার্শ্বে আবার উঠিয়া বসিলেন, তখনও ডাক্তারের আদেশবাণী "যে সকল যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে এই ক'দিন কেটেছে, তেমনি ভাবে আরও দিন দুই চার যদি কাটাতে পারেন, তা হ'লে আর ভয় নেই" এই কথাগুলা তাঁহার কর্ণে বাজিতেছিল। তাই রেবার হস্ত হইতে তাহার দিবারাত্রির একটি কর্ম্মও নিজেরা লইয়া সাহস করিয়া স্পর্শ করেন নাই। শিশির সলিলও সম্ভ্রমে সঙ্কোচে দূর হইতে কেবল তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। যেন অনিলের এই প্রনষ্ট জীবনকে রেবাই যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাই রেবার কার্য্যের উপরে কাহারো হাত চালাইবার অধিকার নাই। অনিলের নষ্ট জ্ঞান ক্রমশঃ ফিরিতেছিল, কিন্তু আত্মীয়ের মুখ দেখিলে পাছে এই নব সঞ্জীবিত মস্তিষ্ক সামান্য উচ্ছ্বাসও প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য ডাক্তার তাহাদের দূরেই থাকিতে বলিয়াছিলেন। "এই অসাধারণ মেয়েটি ধৈর্য্য, সাহস এবং অক্লান্ত তৎপরতায় যে বিখ্যাত নার্সদেরও হারিয়ে

দিতে পারে, এই-ই কেবল রোগীর মুখের কাছে এখন থাকবে” এই তাঁহার আদেশ।

অনিল ক্রমেই সুস্থ হইতেছিল। ‘মা’ বলিয়া যেদিন সে চারিদিকে মাতাকে খুঁজিল, সেদিন মাতা নিজের ক্রন্দনাতিশয্যে পুত্রের নিকটস্থ হইতে পারিলেন না, ডাক্তারের ইঙ্গিতে দূরেই রহিলেন। “মা কাছেই আছেন, ঘুমুন আপনি” ডাক্তারের এই আদেশে রেবার মুখের পানে চাহিয়া তাহার হস্ত হইতে বলকারক পথ্য পান করিতে করিতে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ ঘুমে রোগীর মস্তিষ্ক ছাইয়া গেল। বিশ্বের স্নেহসমুদ্র যেন তাহার দুর্ব্বল স্মৃতিকে দোল দিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিতে চাহিতেছিল—তাহাকে এখনো সে কিছু দেখিতে দিবে না, কেবল স্নেহামৃত পান করাইয়া ঘুম পাড়াইয়াই রাখিবে।

ক্ষতগুলা তখনো ভয়ানকই আছে, কেবল বৃদ্ধি ও দুর্গন্ধ কমিয়াছে মাত্র। রেবা যখন অতি মৃদু হস্তে সেগুলাকে ঔষধজলে ধোয়াইতেছিল, তখন অনিল আবার ডাকিল, ‘মা!’ মা এইবার তাহার মুখের নিকটে গিয়া যথাসাধ্য সংযত-ভাবে বসিলেন। অনিল চাহিয়া চাহিয়া বলিল, “মা, শিশির সলিল?” তাহারাও রোগীর সম্মুখে আসিল। তাহাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া অনিল বলিল, “আমি আজ ভাল আছি!” তাহারা অতি কষ্টে তাহাদের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া বলিল, “ভাল আছ বই কি, আর ভয় নেই। এইবার শিগ্‌গিরই সেরে উঠবে।’ রেবার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া অনিল মৃদুস্বরে বলিল, “মা, কে উনি?” মাতা তেমনিভাবে উত্তর দিলেন, “রেবা! রেবা!” অনিল চক্ষু মুদিয়া যেন ভাবিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া রেবা ত্রস্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল—“যাকে আপনারা হৃষিকেশ থেকে সঙ্গে আনেন, তারই নাম রেবা।” বলার সঙ্গে সঙ্গে রেবা বলকারক ও নিদ্রাকর্ষক ঔষধটা অনিলের মুখের নিকটে তুলিয়া ধরিল—কেন না, ক্ষত পরিষ্কার করিতে যেটুকুও ব্যথা বোধ হইয়াছে, তাহার পরে এখন রোগীর দেহমনের বিশ্রাম প্রয়োজন। অনিল ঔষধ খাইয়া ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে

বলিল, "রেবা! সে কেন হবে? তুমি যে কত দিনরাত ধরে আমার কাছে রয়েছ—আমাকে দেবতার মত ভাল করছ! কে তুমি? কত ঠাণ্ডা তোমার হাত!" অনিল ধীরে ধীরে রেবার হাতটা কপালের উপর তুলিয়া লইয়া মৃদুমৃদু বলিল—"আঃ—ভারী সোয়াস্তি হচ্ছে,—ঘুম আসছে, কেমন ঠাণ্ডা!" ধীরে ধীরে অনিলের মৃদুস্বর আরও নামিয়া জড়াইয়া গেল। শ্রান্ত অনিল ঔষধের গুণে ঘুমাইয়া পড়িল। মাতা ক্ষণেক রেবার নতমুখের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে তাহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন। তাহার কর্ণে মুখ দিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "মা, যেদিন তোমায় শাপ দিয়েছিলেম, সে দিনের কথা আজ ভুলে যাও। আজ অনিলকে যদি পাই, সে তোমারই জন্যে পাব! আজ বুঝেছি ভগবানের আশীর্ব্বাদেই তোমায় আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম! বল রেবা, তোমার জ্ঞান-হারা মার গালগুলো আর মনে রাখবে না!"

রেবা নিঃশব্দে তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। মাতা উচ্ছ্বাসভরে আবার কি বলিতেছেন দেখিয়া শিশির ত্রস্ত মৃদুস্বরে বলিল, "শাপ গাল আশীর্ব্বাদের চেয়ে ঢের বড় জিনিস তুমি ঘরে এনেছ মা,—ওসব কথা মুখে ব'লে কেন আর ওঁকে কুণ্ঠিত করো! অনিলের তন্দ্রা ভেঙে যাবে। নীরবে যা করবার, তাই করি আমরা এস—উনি আমাদের ব'লে দেন, এখন কি করতে হবে।"

রেবা মুখ তুলিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানাইল—এ মশারিকে বদ্‌লাইয়া ধৌত নূতন মশারি টাঙাইতে হইবে, বিদ্যুতের পাখা সর্ব্বদা চলিলেও লোকের সংস্পর্শে ইহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু রোগীর ক্ষতের পক্ষে অনুকূল নয়। প্রত্যহই ইহাকে বদ্‌লাইবার প্রয়োজন—নতুবা সূক্ষ্মকীটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। ঘরেও বিশোধক ঔষধ ছড়াইতে হইবে।

শিশির ও সলিল নিঃশব্দে তখন রেবার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে লাগিয়া গেল।

অনিল ক্রমে দিন দিন আরোগ্যের দিকে চলিল। সকলেই বুঝিতেছিল যে, অনিল সেই দেবোপম সুন্দর কান্তি আর ফিরিয়া পাইবে না। তথাপি

তাহার প্রাণটুকুই যে আত্মীয়স্বজনের পক্ষে সব চেয়ে দরকারী সেই প্রাণটুকু ফিরিয়া পাইয়াই আপাততঃ তাহারা বর্ত্তাইয়া গিয়াছে; তবে হ্যাঁ, সেই অনিলের এই পরিবর্ত্তনে সকলেই অন্তরে অন্তরে মর্ম্মাহত হইয়াছিল বই কি! সবচেয়ে অনিলের মাতার প্রাণেই ইহার আঘাত গভীররূপে বাজিতেছিল। ছেলের প্রাণটি ফিরিয়া পাইবার আনন্দ একটু প্রশমিত হইলে অনিলের মা যেদিন বুঝিলেন, ছেলের মুখের ঐ সব গভীর ক্ষতচিহ্নগুলি শুকাইলেও মুখখানিকে বিকৃত করিয়াই রাখিবে—তাঁহার অকলঙ্ক চাঁদের গায়ে এই যে গ্রহণের মালিন্য, এ আর ঘুচাইবার উপায় নাই, তখন তিনি আর একবার ধরাশয্যা লইলেন। তাঁহার সেই সোনার পুতুল অনিল—শত্রুও যার মুখের পানে, রূপের পানে ফিরিয়া চায়, সেই ছেলের এই দশা হওয়ার চেয়ে তাহার মায়ের মৃত্যু হইল না কেন? সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয়—ভগবান অনিলকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, এই ঢের। তাহাকে অন্ধ পঙ্গু বিকৃতাঙ্গ না করিয়া কেবল মুখখানাকে খানিকটা বিশ্রী করিয়া দিয়াছেন বই তো নয়। এর জন্য এত কষ্টবোধ করা উচিত নয়। করিলে ভগবানের নিকট অকৃতজ্ঞতার অপরাধে পড়িতে হইবে। কিন্তু অনিলের মাতা এ কথায় মনে কিছুতেই সান্ত্বনা আনিতে পারিলেন না। ভগবান কেন তাঁহার অনিলকে অক্ষতভাবে ফিরাইয়া দিলেন না! কি অপরাধে এমন শাস্তি দিলেন? তাঁহার এ কি অবিচার! অনিল যখন মা বলিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকে, তখন তিনি অন্য দিকে চাহিয়া পীড়িত পুত্রের মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে থাকেন,—মুখের দিকে চাহিলেই তাঁহার চক্ষুজল অসম্বরণীয় হইয়া উঠে। তাঁহার ভাবে ক্রমে অনিলের বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, তাহার এমন কিছু হইয়াছে, যাহাতে মাতার এই চাঞ্চল্য! কিন্তু তাহা কি, তাহা বুঝিয়া উঠিবার শক্তি তখনো তাহার হয় নাই—তাই একদিন ম্লানমুখে সকলের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমরা আমায় লুকিও না—আমার কি হয়েছে বল দেখি? আমি তো চোখেও দেখতে পাচ্ছি, একটু বল

পেলে আর ঘা-গুলো আর-একটু শুকুলে উঠতেও পারব বলে মনে হয়। তাহ'লে আর কি এমন হয়েছে—যাতে মা অমন করছেন?"

শিশির চঞ্চল নেত্রে সলিল ও রেবার পানে চাহিয়া বলিল, "কই না—কিছুই তো হয়নি তোমার অনিল! কেন এ কথা ভাবছ তুমি—ও কিছু নয়—"

"ও কিছু নয় শিশির? ঐ ছাখো, মা চোখ ঢেকে উঠে চলে গেলেন! তোমরাই বা আমার মুখের পানে চাইছ না কেন?—তাহ'লে আমার মুখখানায় এমন কিছু হয়েছে যাতে তোমাদের চাইতে কষ্ট হয়। না?"

শিশির, সলিল কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না,—কেবল অস্পষ্ট ভাবে "না—না—তা কেন" বলিয়া অর্থহীন প্রতিবাদ করিতেছিল মাত্র। রেবা তাহাদের এই মুশকিল হইতে উদ্ধার করিল। সে সহজ মুখেই অনিলকে বলিল, "আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, গায়েও আপনার কত ঘায়ের দাগ রয়েছে। মুখেও তো তেমনি, কি তার চেয়েও বেশী হবার কথা। এখনো সে-সব শুকোয়নি, তাই ওঁদের কষ্ট হচ্ছে। গায়ের চেয়ে মুখের ক্ষতই বেশী হয় আর তার ঘাও সহজে শুকোয় না—আপনি তো বুঝতেই পারছেন তা।" রেবার সরল দৃষ্টি এবং অসঙ্কোচ কথায় অনিলের আশঙ্কা যেন একটু কমিল। তথাপি সে বলিল, "একখানা আয়না দাও আমায়—দেখি—কি হয়েছে!"

শিশির ও সলিলের মাথা আরও নীচু হইয়া গেল,—কি উপায় হইবে! এই সদ্যবিকারমুক্ত রোগীর মাথায় এ আঘাত না জানি আবার কি অপকারই না করিবে! মায়ের দুর্ব্বলতায় আবার এ কি বিপদ উপস্থিত হইল? কিন্তু রেবা অবিচলিত ভাবে তেমনি উত্তর দিল, "ও ঘা-গুলো এখনো আপনার দেখা উচিত নয়। হাত দিয়ে তো বুঝতেই পারছেন—এখনো কত গভীর রয়েছে! ঘা শুকুলেও ওর দাগ মিলুতে অনেক দিন লাগবে। যতদিন না ঘা শুকোয়, ততদিন রোগীকে তা দেখতে দিতে নেই, তা তো আপনি জানেন!"

"একবার দেখি না,—তাতে কি ক্ষতি?"

"ক্ষতি কিছুই নেই—তবে যা দিতে নেই—যা করতে নেই—তা কেন করবেন ?"

অনিলের ব্যাধিক্লিষ্ট মুখে এইবার একটু হাসি ফুটিল। শিশিরের পানে চাহিয়া বলিল, "ঘরের মেয়ে না হয়ে রেবার নার্স হওয়াই উচিত ছিল, নয় শিশির ?"

শিশির পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া সকৃতজ্ঞনেত্রে রেবার পানে চাহিয়া বলিল, "নার্স কি আকাশ থেকে পড়ে অনিল ? ঘরের মেয়েরাই তো নার্স হয়ে থাকেন।"

সলিল বাধা দিয়া বলিল, "ঘরের সব মেয়েই কি নার্সের উপযুক্ত হতে পারে শিশিরদা। সেবায় দক্ষ, কর্ত্তব্যে কঠোর, আর স্নেহে কোমল,—অথচ রেবাদির মত এমনি নিদ্রা-তন্দ্রা-ক্ষুৎপিপাসাবর্জ্জিতা যাঁরা, তাঁরাই নার্স হতে পারেন! ডাক্তার ওঁকে নার্সের কতবড় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সর্ব্বদা শুনছ তো ?"

অনিল তৃপ্ত প্রসন্ন মুখে রেবার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আর, তার চেয়েও যে আমি দেবো! রেবাকে যদি না পাওয়া যেত, হয়ত—"অনিলের কথায় বাধা পড়িয়া গেল। সে তখনো তেমন সবল হয় নাই—থামিয়া থামিয়া একটু একটু করিয়াই কথা কহে। এখনো তেমনি ভাবে কথা কহিতে কহিতেই রেবার মুখে বেদনার গভীর নীল ছায়া ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া সহসা তাহার এ উচ্ছ্বাস-টুকু স্তব্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল—কিন্তু অনিলের মাতা সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার কথাকে সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন—"তা হ'লে তোকেও আর ফিরে পেতাম না!" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বাসভরে তিনি রেবাকে যেন বুকের মধ্যেই টানিয়া লইলেন। সলিল ও শিশিরের দত্ত উচ্চ সম্মান, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি এবং এই গৃহের গৃহিণীর আকুল স্নেহ-আলিঙ্গনের মধ্যেও রেবা তেমনি নিঃশব্দেই মাথা নীচু করিয়া রহিল, এবং তাহার বদ্ধ ওষ্ঠে এবং নতনেত্রের কোলে তেমনি নীল ছায়া জমিয়াই রহিল।

শিশির অনিলকে স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিবার জন্য বলিল—"সে দিন যে ভ্রমণ-কাহিনী বলতে সুরু করেছিলে—এখন পার তো একটু একটু ক'রে বল—আর আমি লিখে নিই! জান তো এমন অনেক ব্যাপারই ভাবজগতে ঘটে থাকে, যা শুনেও ঠিক চোখে দেখার মত ক'রে ভেবে নিতে পারা যায়। যদিও আমাকে বর্জ্জন করেই তোমরা তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলে, তবু আমি এখানে বৈশম্পায়ন হ'ব, তুমি সৌতি হয়ে কেবল আমায় ব্যাপারটা জানিয়ে দাও, তারপরে দেখবে, জনমেজয়-প্রমুখ শ্রোতায় সভা ভরে যাবে।"

অনিল তাহার স্নেহোচ্ছ্বাসে রেবার কথায় বাধা পাইয়া একটু বিমনা হইয়া গিয়াছিল, এখন শিশিরের কথায় অনিচ্ছায়ও একটু হাসিয়া বলিল, "কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করব বল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ—কোথাকার কথা?"

"আঃ,—কি রে সলিল, কুমারের সেই শ্লোকগুলো কি রে? সপ্তর্ষি-হস্তাবচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরি-বর্ত্তমানঃ—তার পরে?"

"পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ময়ূখৈঃ। কিন্তু এ যে হিমালয়-মহিমার শেষে এসে পড়লেন একেবারে শিশিরদা! পদং তুষারস্রুতিধৌতরক্তং যস্মিন্ন দৃষ্টাপি হতদ্বিপানাম্। বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্র মুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ। আগে ভাল ভাল সব শ্লোক ছেড়ে এলেন যে! তার পরে—"

"আরে আমি তো শ্লোকই ছেড়ে এসেছি—আর তোর দাদা সেই হিমালয়কেই ছেড়ে দিয়ে কি না তুচ্ছ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কথা এনে ফেল্‌ল! দ্যাখ্ দেখি—রাগ ধরে না? কাশ্মীর আর গঙ্গোত্রী, কেদার ও বদরীর তিন চূড়ায় যে ঘুরে এল, সে কি না মাটির কথা কয়?"

"কিন্তু যাই বলুন দাদা আপনারা, কবি কালিদাস যে কখনো হিমালয়কে দেখেছিলেন, তা তাঁর ঐ সব অত্যুক্তি-ভরা অলঙ্কার-পোবা কথায় মনে হয় না। যদি দেখতেন, তাহ'লে কি ঐসব সিংহের নখে বেঁধা গজমুক্তো তার রাস্তায় ছিটুতেন, না তার শিখরকে এত অসঙ্গত উঁচু ভাবতেন, যার উপরের সরোবরের

পদ্ম ফুটুতে সূর্যদেব স্বয়ং নীচে থেকে উঁচু দিকে কিরণ পাঠাচ্ছেন কল্পনা করতে হ'ত!"

অনিল বাধা দিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "কি বলিস্ সলিল! চোখের দেখার প্রমাণের কথা ছেড়েই দে, তাঁরা মন দিয়ে যে হিমালয়কে দেখতেন, তার প্রমাণও যে একটা শ্লোকেই রয়েছে—যথৈব শ্লাঘ্যতে গঙ্গা পাদেন পরমেষ্ঠিনঃ। প্রভবেন দ্বিতীয়েন তথৈবোচ্ছিরসা ত্বয়া! এই যে সম্মান, এর চেয়ে কি ঐ অত্যুক্তিগুলো বড়? যাঁকে দেখে তাঁর এত বড় কথা মনে হয়েছে, তাতে কল্পনার গজমুক্তা ছিটিয়ে কিংবা সূর্য্যের চেয়েও উঁচুতে তার শিখর তুলে সপ্তর্ষি দিয়ে সেখানের সরোবর থেকে পদ্ম তুলিয়ে কি বেশী সম্মান দিয়েছেন মনে করছিস্? আর তিনি যে স্বচক্ষেই হিমালযকে দেখেছিলেন, তা কি ঐ "আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য" ঐসব শ্লোকেও প্রমাণ পাওয়া যায় না? তা ছাড়া একদিন ৺বদরীবিশালার পথে মনে করে ছাখ্, তোকে দেখিয়েছিলাম, সপ্তর্ষিরা যেমন দেখেছিলেন—"গঙ্গাস্রোতঃ পরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি। বৃহন্মণিশিলাশালাং" স্বর্গাদপি মনোহর হিমবন্তের দিব্য পুরী! বরফ-ঢাকা শৃঙ্গের উপর সূর্য্যের নতুন আলো পড়ে কি সুন্দর নগরই না একটি সৃষ্টি কবেছিল! তাতে কত সার-গাঁথা মণি-মাণিকে গড়া মন্দির ঘর বাড়ী আর প্রাচীর সব দেখাচ্ছিল! বরফের তৈরী সে অমরাবতী কবি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন! বরং এই কথা বলতে পারিস্ যে তিনি ঐ স্থাবররাজের কল্পনার কন্যা উমার উপরেই তাঁর মনের যত কিছু সৌন্দর্য্য সব পুঞ্জীভূত ক'রে ঢেলে দিয়ে গিয়েছেন, আর হিমালয়ের বাস্তবের যে কন্যাটি, তাঁর দিকে যেন তিনি ফিরে চান্‌নি! তা যদি চাইতেন, তা হ'লে তাঁর মানস "মেঘ সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী" হয়ে সেই কনখলতলবাহিনী "শৈলরাজাবতীর্ণা"র স্বচ্ছ স্ফটিক বিশদ জল পান করেও গৌরীর ভ্রূকুটীভঙ্গীর কথাই ভাবতেন না! সেই নাগাধিরাজের হৃদয়বিগলিতা শঙ্খেন্দুহিম-কুন্দোজ্জ্বালা আদরিণী মেয়েটির বিদ্যুৎচঞ্চল

গতিস্রোতের সৌন্দর্য্য আর তার শিলাময় নূপুরের নিক্কণ, আবার কোথাও বা গজরাজগর্ব্বহারী সফেনতরঙ্গ—এসব মন দিয়ে ভাল করে দেখলে নিশ্চয় তিনি কুমারসম্ভবের মত আর একখানি কাব্য লিখতেন, তার নায়িকা হ'ত আমাদের হিমালয়ের কিশোরী কন্যা গঙ্গা।"

অনিলের দৃষ্টি আর একবার তাহার মুখের উপর পড়িল। দেখিল, রেবার মুখে আর সে নীল ছায়া নাই। এই প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য্যভরা অল্পবয়সী রমণীটির মুখে সহসা কোথা হইতে তারুণ্যের একটা উজ্জ্বল আলোক আসিয়া পড়িয়া সে মুখের আদত সৌন্দর্যটিকে সহসা যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছে! রেবার চোখে মুখে তাহার অতুল রূপকে ফুটাইবার উপাদানস্বরূপ জীবনের আরক্ত আভা আর যেন কখনো দেখা যায় নাই। অনিলের বিস্মিত দৃষ্টির সহিত রেবার দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র সে তাহার দীর্ঘ সুনীল চক্ষুর উপর সুকৃষ্ণ সুদীর্ঘ পল্লবাবরণকে নামাইয়া দিল। কিন্তু সে চক্ষুর অভ্যন্তরে আরক্তছটা তাহার রক্তলেশহীন চম্পকগৌর গণ্ডে ও চক্ষের নীচে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টিতে রেবা লজ্জিত হইয়াছে বুঝিয়া অনিলও অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার হস্ত হইতে পথ্যের বাটি গ্রহণ করিল। এই অত্যদ্ভুত সেবাপরায়ণা ও অকারণ স্নেহশীলা বালিকাটি,—আজ দুইমাস হইতে যাহার স্নেহস্পর্শ অনিলের ব্যথিত সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া আছে,- তাহাকে আজ অনিলও প্রতিদানে একটু স্নেহস্পর্শ প্রকাশ করিতে গিয়া একটা আঘাত খাইয়াই থামিয়াছিল, মেয়েটি যেন তাহাতে কোথায় একটু বেশীরকম বেদনা বোধ করিতেছে বলিয়াই অনিলের মনে হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহার এই আনন্দোজ্জ্বল আরক্ত মুখ যেন অনিলকে বলিয়া দিল—অনিলের কোন কথায় সে যেন সুখবোধ করিয়াছে। বেদনার সে নীল রেখা অনিল যেন ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে। কিসে যে রেবা আনন্দ বোধ করিল, তাহা বুঝিতে না পারিলেও তাহাকে যে অনিল একটু সুখ দিতে পারিয়াছে, ইহার অনুভবে কৃতজ্ঞ অনিলও তৃপ্তমুখে পথ্যটুকু খাইয়া চোখ বুজিয়া বিশ্রাম লইল।

নিজের সে দুর্দ্দশার কথা বুঝিতে অনিলের আর বেশী দিন লাগিল না। শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতচিহ্নের অপেক্ষা মুখের ক্ষতচিহ্নগুলোই তাহাকে এক নবজন্ম দিয়াছে। নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন সহজে আর কেহ তাহাকে সে অনিল বলিয়া চিনিতে পারিবে না। নিজের এই নূতন অবস্থার কথা ভাবিয়া এবং সহিয়া লইতে তাহার দিন দুই লাগিল, তাহার পরে অম্লান হাসি-মুখে শিশিরের সঙ্গে এ বিষয়েও রহস্যালাপ জুড়িয়া দিল, কেবল মায়ের কাছে সে যে নিজের এই দুর্দ্দশার কথা টের পাইয়াছে, তাহা সহজে ভাঙিল না,—কেননা, সে জানিত, মা তাহা হইলে রোদনের ভারে এমনই ভাঙিয়া পড়িবেন যে, অনিলের এখন সে বেগ সহ্য করা কঠিন হইবে।

মাতা তখন আহারাদির জন্য কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন, রেবাও তাঁহার নিকটে আছে। অনিল এখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, কক্ষের মধ্যে তো উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়ই, বাহিরেও দু চার পা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার ঐ চারিটি সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী ছাড়া দাসী-চাকরেব ব্যথিত এবং করুণাপূর্ণ দৃষ্টিও এখনো সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাই সক্ষম হইলেও সহজে নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া গৃহের অন্য কোন স্থানে যাইত না। মাতা ও রেবা নিকটে নাই দেখিয়া হাসিয়া সে শিশিরকে বলিল, "দ্যাখো হে, আমার নিজের চেয়েও আজ তোমাদের জন্য দুঃখ হচ্ছে শিশির!"

শিশির বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কেন?"

"কেন? আমি তো রাত দিন আয়না নিয়ে সম্মুখে ধরে থা ব না, বরং এখন ঘর থেকে আয়নাকে সযত্নেই নির্ব্বাসন দিতে হবে—কিন্তু তোমাদের তো

সর্ব্বদাই এই মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতে হবে! তাই ভাবছি—"

শিশির মর্ম্মাহত স্বরে বলিল, "অনিল—অনিল—"

"আঃ—তুইও যে মার মত হলি! তাঁর সুমুখে ভয়ে এ কথার উচ্চবাচ্য করি না—কিন্তু তোর সাম্‌নেও যদি দু'চার কথা বলতে না পাই, তুইও এটুকু সহ্য করতে না পারিস্, তাহ'লে আমি যে মারা যাই—সেটুকুও তো বুঝতে হয়!"

ব্যথিত শিশির তখন নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "বল, কি বলবে।"

"বলছিলাম কি যে, আজ আমি আয়না দিয়ে দেখেছি!"

শিশির চমকিত হইয়া বলিল, "কোথায় পেলে? তুমি এ-ঘর ও-ঘর করবার উপক্রম করতেই মা ঘরের সব আয়না দূর করিয়ে দিয়েছেন।"

অনিল হাসিয়া বলিল, "তা ব'লে বাড়ীর সব আয়নাই কি দূর করতে পেরেছেন? তোমাদের এই ষড়যন্ত্র ধরতে পেরে বাক্স থেকে বার করেছিলাম ছোট একখানা! যাক্—এতে আমার যেন সর্ব্বদা একটা কুশ্রী বিকট বস্তু দেখার দুঃখ থেকে বাঁচালে—কিন্তু তোমরা? তোমাদের তো এ দুঃখ থেকে আমার বাঁচাবার উপায় নেই শিশির!" শিশিরের মুখের পানে দৃষ্টি তুলিতেই অনিল দেখিল, দ্বারের নিকটে কে দাঁড়াইয়া আছে। মাতার আগমনের আশঙ্কায় ভীত হইয়া অনিল সচকিতে চাহিয়াই বুঝিল—মাতা নয়—রেবা। রেবার সঙ্গে চোখাচোখি হইলে রেবা তাহার অভ্যাসমত দৃষ্টি নামাইল বটে, কিন্তু অনিল তাহার সঙ্গে সেই ক্ষণকাল দৃষ্টির বিনিময়েই বুঝিল, রেবা তাহার কথাগুলি শুনিয়াছে। হাসিয়া অনিল ডাকিল, "এস রেবা—দাঁড়িয়ে আছ কেন—ঘরে কি কোন কাজ আছে?"

রেবা মাথা নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ, কাজ আছে।"

"তবে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মার ভয়েই আস্তে আস্তে কথা

কইচি—তোমার ভয়ে নয়।”

শিশির ততক্ষণে বেদনাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—“আমাদের এই তুচ্ছ দুঃখটাই তুমি এত বড় ক’রে দেখছ অনিল—আর আমরা যে তোমাকে ফিরে পেলাম—এ কথাটা একবার তোমার মনে পড়ল না? ফিরে পাবার কি কথা ছিল? তা যখন পেয়েছি, তখন ক্ষতির চেয়ে লাভই কি আমাদের বেশী হয়নি অনিল?”

“সে কথা মনে পড়লেও দুঃখ দেওয়ার দুঃখটাও যে ভুলতে পারছিনে ভাই!”

“আবার সেই কথা? এ দুঃখের চেয়ে সুখের ভাগটা যে ঢের বেশী—এ স্বীকার না ক’রে ঐটুকু নিয়ে দুঃখ পেলে ভগবানের কাছে যে অকৃতজ্ঞের অপরাধে অপরাধী হ’তে হবে।”

অনিল আবার কি বলিতে যাইতেছে দেখিয়া শিশির এইবার রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল—“দাঁড়াও—মাকে ডেকে আনি—নইলে তোমার মুখ বন্ধ হবে না!”

“এই ছাখ্—এতেও তোদের এই দুঃখের দুর্ব্বলতাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। এর আলোচনাটুকুও সইতে পারছিস্ না!”

শিশির আর একটু বেশী রাগের ভান করিয়া সত্যই ঘর ছাড়িয়া গেল। অনিল তেমনি হাসিমুখেই অন্তর্হিত শিশিরকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল—“দুঃখটাকে স্বীকার করতেও এত লজ্জা—যে তাকে রাগ বলেই দেখাতে হবে!”

“এতে ওঁদের দুঃখ বলে যখন বুঝতেই পারছেন, তখন নাই বা সে দুঃখটাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া ক’রে ওঁদের মনে দুঃখ দিলেন।”

অনিল একটু চমকিত ভাবেই রেবার পানে চাহিল, কেননা, সে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর ছাড়া নিজ হইতে এমন করিয়া তো কথা কহে না, তাহা ছাড়া তাহার কণ্ঠের স্বরটাও যেন কেমন অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন ধরণের। মনের মধ্যে কণ্ঠের মধ্যে কি যেন একটা চাপিয়া লইয়াই সে সহসা এই কথাটা বলিয়া

ফেলিল। অনিল তাহার পানে চাহিল মাত্র—মুখ দেখিতে পাইল না। এমন ভাবে দাঁড়াইয়া সে নিজের কার্য্য করিতেছিল যে, পিছন ফিরিয়া না থাকিলেও মুখখানা অদৃশ্যভাবেই ছিল। অপ্রস্তুত হইয়া অনিল বলিল, "তা সত্য রেবা—কিন্তু শিশিরের কাছে না ব'লে কোন কথা যে নিজের মনেও কোন দিন একা একা ভাবতে শিখিনি।"

"তা হ'লে যাতে ওঁরা ব্যথা পান্, এমন ভাবনাটাও ছেড়ে দেওয়া উচিত আপনার।"

অনিল একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া সলজ্জহাস্যে বলিল, "ঠিকই বলেছ রেবা, এ আমার হয়ত নিজেরই দুঃখ! অন্যায় ক'রে তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে তোমাদের বেশী দুঃখ দিচ্ছি।"

রেবা ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমি শিশিরবাবুর কথাই বলছি।"

"শুধু শিশিরের কথাই কেন বলবে রেবা—তোমার কথাও কি আর আমাদের মধ্যে বাদ দেবার উপায় আছে? আমরা চারজন ছিলাম এতদিন। এখন যে পাঁচজন হয়েছি।" রেবা নিঃশব্দে রহিল। অনিল স্নিগ্ধচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া স্নেহকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, "আমরা তিনটি ভাই, কিন্তু বোন ছিল না আমাদের রেবা, মারও মেয়ে ছিল না, এখন আমাদের সে কথা তো ভাববার উপায় নেই।"

রেবাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অনিল তাহার মুখের কোন একটু কিছু সরব উত্তর অথবা তাহার প্রফুল্লমুখশ্রীরই নীরব ভঙ্গী একটু দেখিতে পাইবার প্রত্যাশায় রেবার পানে চাহিয়াই রহিল, কিন্তু দুইয়ের একও তাহার এই স্নেহজ্ঞাপনের উত্তরস্বরূপ অনিলের নিকটে পৌঁছিল না। আরব্ধ কর্ম্ম সমাপনান্তে রেবা তেমনি নিঃশব্দেই গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া ক্ষুন্ন অনিলের মুখ হইতে "রেবা" শব্দটি অতর্কিতেই বাহির হইয়া গেল।

রেবা মুখ বা দৃষ্টি ফিরাইল না—কেবল নীরবে অনিলের যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহার প্রতীক্ষায় গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। কিন্তু অনিলের তখন আর কিছু বলিবার ছিল না, বরং একটু শুনিবারই ছিল। তাই রেবাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে চলিয়া যাইতেই হইল। অনিল তখন বিস্মিতভাবে এই বাক্যোচ্ছ্বাসমাত্রহীন কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণীর স্বভাবের কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার এই মাসের পর মাস ব্যাপী অক্লান্ত সেবা, একান্ত যত্ন, একি কেবলই কর্ত্তব্যের শিক্ষার ফল? না, মন তো এ কথা মানিতে চাহে না। অনিলের সেই দুর্দ্দান্ত বিকারের মধ্যে মাঝে মাঝে ঈষৎ জ্ঞানের স্মৃতি—সে সময়ের কথা মনে করিতে গেলেই যে অনিল দেখিতে পায়, নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নিঃশব্দ গৃহের মধ্যে ঘড়ির অশ্রান্ত টিক্ টিক্ শব্দ, উজ্জ্বল অতন্দ্র আলোক আর তার মধ্যে কখনো মাথার শিয়রে, কখনো মুখের নিকটে নিশীথ রাত্রির উজ্জ্বল দীপ্তিমান অতন্দ্র তারকার মত দৃষ্টি লইয়া এই রেবা! তাহার সে চক্ষু কখনো রোগীর যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় কাতর, সহানুভূতিতে আর্দ্র, স্নেহে সজল, আর তাহার পুষ্পপেলব হস্ত-দুখানি কেবল তীব্র-বেদনা-জর্জ্জরিত ক্ষতবিক্ষত অঙ্গের যথাসাধ্য সন্তাপ-মোচনে ব্যগ্র! বিকারের মোহে—তন্দ্রার ঘোরে কতদিন বিস্মিত অনিল রেবার স্মৃতি মনে না পড়ায় ভাবিয়াছে—সত্যই এ বুঝি কোন দেবী! তাই ইহার চোখেমুখে মায়ের মত, ভগ্নীর মত দৃষ্টি, হস্তে তাহাদেরই স্নেহময় সেবাকুশলতা! শুধু কি সেই সময়ের কথা মনে করিতে হইবে? এখনো দুর্ব্বল অনিলের সর্ব্ব বিষয়ে যে রেবারই হস্ত এক ভাবেই নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহার হস্ত হইতে সে ভার মাতা পর্য্যন্ত এখনো গ্রহণ করিতে চাহেন না, রেবার উপর তাঁহাদের এতই নির্ভরতা, এতই বিশ্বাস। পরকেও যে এমন করিয়া শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে বাঁধিয়াছে, সে কি কেবল কর্ত্তব্যের যন্ত্রমাত্র হইতে পারে? কখনই নয়। কিন্তু কেন সে তবে অনিলের এ স্নেহ-প্রকাশে এমন উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিল? আর সেদিন অনিলের কৃতজ্ঞতা

প্রকাশে তাহার সেই ব্যথা বোধ—তাই বা কেন? জানি না, ইহার মনে কি আছে!

আরও একমাস কাটিয়া গেলে যখন অনিল সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ তিনমাস পরে শিশির যখন বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, অনিলের যখন কেবল দাসীরই মাত্র প্রয়োজন, তখন সহসা একদিন সে লক্ষ্য করিল যে, রেবা নিতান্ত দরকার না পড়িলে আর তাহার কাছে বা ঘরে আসে না। রেবার দরকারও এখন আর বড় বেশী নাই, অনিল এখন স্বচ্ছন্দে বাড়ীর সর্ব্বত্র যাওয়া আসা করে, পড়িবার ঘরেই দিনের বেশী ভাগ কাটায়। যখন শোবার ঘরে আসে, তখন দেখে, রেবা তাহার ঘরের কর্ম্ম শেষ করিয়া রাখিয়াছে। আহারের স্থানে কি অন্য কোথাও যখন তাহার সহিত দেখা হয়, তখন সে কাজে এমনি মগ্ন যে, তাহা হইতে মুখ তুলিবারও তাহার সময় থাকে না। সহসা একদিন মাতার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু এবং আরক্ত মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে অনিল প্রশ্ন করিয়া জানিল যে, রেবা নাকি তাহার পিতার নিকটে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছে। এইবার তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। কেন রেবা সহসা এ কথা বলিল, তাহার কারণ মাতাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া শুনিল যে, গয়া হইতে আসিবার সময়ও রেবা হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—অনিলের ব্যারামের জন্যই তখন যায় নাই, এখন সে আবার যাইতে চাহে। তাহাকে কাহার সঙ্গে পাঠানো যায়, ইহাই এখন ভাবনা।

অনিল বলিল, "সেজন্য ভাবনার কিছু নেই, কিন্তু কথা এই যে, রেবা তখন কেন যেতে চেয়েছিল মা? সে তো নিজের অনিচ্ছায় আমাদের সঙ্গে আসেনি, তুমিই এ কথা বলেছ।"

"তাই তো আমি তখন বুঝেছিলাম—কিন্তু শেষে তার সে ইচ্ছে বদ্‌লেছিল অনিল।"

"কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে—কেন তা হয়েছিল? রেবাকে বরাবর যেমন

দেখছি—এখনো যেমন বুঝেছি—সে তো বিনা কারণে এমন অস্থিরমতির মত কাজ করবে না। কিছু নিশ্চয় হয়েছিল,—তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, তুমিও তা জান! কথাটা কি মা?"

মাতা সহজে উত্তর দিতে চাহিলেন না দেখিয়া অনিলের কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। এই ছয়মাসব্যাপী সঙ্গ ও সাহচর্য্যের অভিজ্ঞতায় এই মেয়েটির উপরে অনিলের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না; তাহার উপরে এই ব্যারামের ঘনিষ্ঠতায় রেবার চরিত্রের প্রকৃষ্টতম পরিচয়ে তাহার সঙ্গে একটা বন্ধনও যেন অনিল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। অনিল তাহাকে পর বলিয়া আর যেন ভাবিতে পারিত না। আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধে যাহারা আত্মীয়—সেই আত্মীয়ের মধ্যেই রেবাকে গণ্য করিতে তাহার প্রাণ যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু রেবা তাহার সে স্নেহবন্ধনে যেন ধরা দিতে চাহে না, রেবার এখনকার ব্যবহারে অনিল তাহা লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। অনিলের এই রোগের অবসরে দুর্জ্জেয়চরিত্রা মেয়েটির অন্তরের ছবি যেন সে দেখিতে পাইয়াছে—এইরকম তাহার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল, নিজের সে বিশ্বাসের উপরে এই আঘাত, এ যেন অনিলের নিকট বেদনার মতই বাজিল। ব্যগ্র হইয়া মাতাকে সে প্রশ্ন করিল—"না বললে আমি কিছুতেই ছাড়ব না, বল না মা, কেন রেবা যেতে চাচ্ছে?"

মাতা তখন অধোমুখে বলিলেল, "আমি তো ঠিক জানি না—তবে তখন আমার বোধ হয়েছিল যে, তোমাতে আমাতে যে কথা তখন হয়েছিল, সেও তা শুনেছিল।"

"কি কথা হয়েছিল মা আমাদের তখন?"

"কেন ভুলে যাচ্ছিস্? রেবাকে বিয়ে করতে তোর আপত্তি!"

অনিল চমকিয়া উঠিল, ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া মাতাকে প্রশ্ন করিল, "সে কথা এখন কেন আবার উঠল মা? তুমি কি তাকে কিছু বলেছিলে?"

মাতা চুপ করিয়া রহিলেন। অনিল ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "এখনো মা তোমার ছেলের আবার বিয়ে দেবার ঝোঁক যায়নি তাহ'লে? তোমার এই ছেলে, যার মুখের দিকে চাইলে লোকে ঘৃণায় চোখ বুজতে চাইবে—তার আবার বিয়ে দিতেও তুমি চাও? তাও আবার ঐ রেবার মত মেয়ের সঙ্গে? কি ক'রে এ কথা ভাবতে পারছ এখনো মা তুমি?"

মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "অনিল, ওরে চুপ কর, আর বলিস্‌নে!"

"না মা, চুপ করব না, আমায় বলতে দিতে হবে তোমায়। এখনো যদি তুমি—"

"আমি রেবাকে সে কথা তো বলিনি, কেবল বলেছিলাম, তার বিয়ে দেব এইবার শীগ্‌গির। তোর সঙ্গে—এ কথা তো আর মুখে আনিনি অনিল।"

"এখন না এনে থাকো, এর আগে এ কথা উঠেছিল কিনা, তাই রেবা ভেবেছে যে বুঝি—তার এ বোঝায় অবশ্য দোষ নেই তার। যাক্‌, তাকে বুঝিয়ে দিও মা কথাটা, বলো যে আমি—আমার স্ত্রীকেই আনতে যাব শীগ্‌গির।"

মাতা স্তব্ধভাবে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অনিল ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোড়ে মাথা দিয়া চোখ বুজিয়া বলিল, "একবার আমার মুখের পানে চাও মা! এখনো তুমি তোমার সেই কালা বোবা বৌকে আন্‌তে অনিচ্ছুক? আমরা যে পাপ করেছি, তার প্রতিফল স্বরূপই ভগবান, তোমার যে ছেলে নিয়ে এত গর্ব্ব ছিল, তার—অমন করতে পাবে না,—মুখ ঢাক্‌তে পাবে না—শুনতে হবে, আজ বুঝতে হবে তোমায় আমাদের এ পাপকে। তাকে তুমি এখনো ঘৃণা করছো মা? কি ক'রে করছো? তোমার ছেলেকে এইবার ভগবান তার উপযুক্ত স্বামী ক'রে দিয়েই আমাদের এ অহঙ্কার ভাঙ্‌লেন না কি? আরও পাপ করতে দিও না, নিজেও কোরো না। আর আমার বিয়ের চেষ্টা কোরো না, তাহ'লে আরও কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আমাদের জন্যে তোলা রইবে। এই ছাখো, আমি খবর পেয়েছি—আমার শাশুড়ী মারা গিয়েছেন। সে অভাগা জীবটাকে মায়ার

চোখে দেখবার আর কেউ নেই। সে একটা পাগলের মতই হয়ে উঠেছে, সর্ব্বদাই নাকি অজ্ঞান হয়ে যায়। মা, শীগ্‌গিরই সে আমার এই মনের কর্ত্তব্য-ভারকেও মুক্তি দিয়ে দেবে—আর নয়ত সেই স্ত্রী নিয়েই আমি সংসারী হ'তে পারব।—সে মানুষ মা, আমি লক্ষ্য করেছি, তার মধ্যে মানুষের সব জিনিসই আছে, এমন কি, হয়ত সাধারণের চেয়ে বেশী পরিমাণেই আছে, কেবল অবস্থার অপরিবর্ত্তনে তা ফুটতে পারছে না। আমায় অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে আসি। আর আপত্তি কোরো না মা।"

মাতা মুখ ঢাকিয়াই দেওয়ালের গায়ে যেন ঢলিয়া পড়িলেন। অনিল কঠিন স্বরে বলিল, "এখনো মা ছেলের অহঙ্কার ছাড়তে পারছ না? নিজের ছেলের এ অবস্থা সহ্য করতে পারছ, দেখতে পারছ, কিন্তু আর একটা জীবের দুঃখের কথা একবার ভাবতেও পারছ না? সে কালা বোবা ব'লে তার উপর কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনো তোমার এলো না মা? ভগবানের রাজ্যে এত অবিচার এ কি তিনি—"

"চুপ কর, চুপ কর, আর বলিস্‌নে"—মাতা আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন। "যা নিয়ে আয়গে তোর সেই বৌকে। আর আমি বারণ করছি না। ভগবান! —ভগবানের নাম আর করিস্‌নে! তাঁর বিচারের রাজ্য হ'লে আমার উপরে তাঁর এই বিচার!"

অনিল হাসিয়া বলিল, "বিচার খুব সূক্ষ্মই হয়েছে মা—কিন্তু আমাদের তা আজ বোঝবার সাধ্য নেই।"

"তোর আবার বোঝবার সাধ্য নেই? তুই তো মায়ের এ দুর্দ্দশায় খুশীই হয়ে উঠেছিস! যা, তুই তোর সেই বৌকে নিয়ে এসে ঘর কর—আর আমায় বাক্যযন্ত্রণা দিস্‌নে!"

অনিল সবিষাদে মাতার পানে চাহিল, "তাহ'লে এই আমায় দেবে তুমি? তাকে আনি যদি, তুমি আর আমায় কাছে জায়গা দেবে না, না মা?" বলিতে

বলিতে অনিলের স্বর রুদ্ধ হইল।

মাতা দুই হস্তে চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আর যন্ত্রণা দিস্‌নে অনিল,—ভগবান এত দিলেন, তবু কি তোর মন উঠল না? আনতে তো বলিছি—আর কেন কতকগুলো কটু কথা বলিস্?"

মাতার পদধূলি লইয়া অনিল এইবার তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল।

দিন দুই পরেই অনিল যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া মাতা একবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "আর দিন কত পরে রাস্তায় বেরুস্, এখন রাস্তার কষ্ট সইবে কি?"

"বেশ সইবে মা—আর আমার শরীরে কোন গ্লানি নেই।"

"শিশিরকে আনিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে যা, নয়ত সলিলকে নিয়ে যা, একা যাসনে।"

"কোন ভয় নেই মা—কালই বাড়ী এসে পৌঁছুব,—কিছু ভেবো না।"

মাতা ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনিল নিজেই একটা ব্যাগ লইয়া তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় দু-একটা জিনিস পুরিতেছিল, পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "আপনার একা যাওয়া হবে না।"

অনিল ফিরিয়া দেখিল—রেবা! অনিল বিস্ময়ে একটু আনন্দিত হাসিমুখে চাহিযা বলিল, "কেন?" রেবা অনেক দিন পরে এমন করিয়া আবার তাহার সহিত কথা কহিতে আসিয়াছে দেখিয়া অনিল সেই আনন্দে মূঢ়ের মতই এ প্রশ্ন করিল।

"এখনো আপনি বেরুবার উপযুক্ত বল পান্‌নি।"

"বেশ পেয়েছি রেবা। এই তিন মাস যে কাণ্ড তুমি করছ—বল না পেয়ে কি আমার উপায় আছে?"

রেবা গম্ভীর মুখে বলিল, "কই, এই পনেরো দিন তো—আমি তো এখন

আর আপনার কিছু করি না! শিশিরবাবুকে আনিয়ে তাঁর সঙ্গে যান, এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন?"

অনিল একটু থামিয়া সহসা রেবার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়াই বলিল, "তাড়াতাড়ি তুমিই যে করালে! এখন আমার বড় কিছু আর করো না, তাও দেখছি, তার পরে শুনলাম হৃষিকেশে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ! তাই তোমার ভয় ভাঙতেই তো আরও তাড়াতাডি করছি।"

রেবা ক্ষণেক নিঃশব্দে থাকিয়া একটু—একটু মাত্র হাসিয়া বলিল, "না, তার জন্যে তাড়াতাড়ি করতে হবে না আপনাকে। বৌ না দেখে কি যেতে পারে কেউ?"

অনিল প্রথমটা হাসিল, তাহার পরে ব্যথাবিবর্ণ মুখে রেবার পানে চাহিয়া বলিল, "তার কথা সব শুনেছ তো রেবা?"

রেবা মাথা নীচু করিয়া রহিল। ক্ষণপরে অনিল ব'লিল, "আমার যেন মনে হচ্ছে, তুমি থাকলে আমার কাজটা আরও সহজ হ'ত রেবা। তার মত প্রাণীকে মানুষ ক'রে তুলতে পুরুষের চেয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গই বোধ হয় বেশী উপকারে দিত।"

রেবা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার চেষ্টাতেই সবচেয়ে কাজ হবে,—অন্যের দরকার করবে না।"

"তোমার মত সঙ্গ নিশ্চয় তার উপর কাজ করত রেবা! থাকবে কি তুমি?" বলিতে বলিতে অনিলের কি যেন স্মরণ হইবামাত্র হাসিয়া ত্রস্তস্বরে বলিল, "কি স্বার্থপরের মত কথা কইছি দেখেছ? তোমার যেন আর কারো ঘরে যেতে হবে না—চিরদিন আমাদের কাছেই থাকতে হবে! কিন্তু সেই কথাই আমি বলতে চাই রেবা,—আমাদের ঘর থেকেই সে-ঘরে তোমায় আমরা পাঠাব—তুমি নিজে হ'তে কোথাও যেতে পাবে না—হৃষিকেশেও না। সেই উপযুক্ত জায়গায় যতদিন আমরা তোমায় না পাঠাই, ততদিন আমাদের কাছেই

তুমি থাক। কেমন ?”

রেবা উত্তর দিল না। অনিল কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া আবার প্রশ্ন করিল, “কি বল রেবা ?”

রেবার এতদিন পরে এমন করিয়া তাহাদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সেই উদাসীনের রাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া, এ যেন অনিলের সহিতেছিল না—প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা বিঁধিতেছিল। তাহাকে কোন্ উপায়ে রাখিতে পারিবে, তাহারই আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া অনিল প্রশ্ন করিল। রেবা সে কথার উত্তর না দিয়া কেবল বলিল, “আপনি আজ যাচ্ছেন না তো ?”

অনিল তাহার প্রশ্নে এতক্ষণে আবার নিজের কার্য্যের দিকে মন আনিল—এতক্ষণ সে কেবল রেবার যাওয়ার কথাই ভাবিতেছিল। এখন একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, “আজই যাব রেবা। মার আবার কি জানি যদি মন ফিরে যায় !”

“যখন আনতে মা একবার বলেছেন, তখন আর কথা ফিরোবেন না। দু’দিন পরেই যাবেন।”

“আরও কথা আছে,—শিশিরের পত্রে জেনেছি—বিজলীও সেখানে এখন নেই, একেবারে একা আছে সে। কি এক রকম মূর্চ্ছায় অবসন্ন হয়েই নাকি সে পড়ে থাকে সময় সময়। মা ভিন্ন সে তো জগতের আর কারো কাছে কিছু পায় নি। তাই বোধ হয়, তার এটা হচ্ছে। আর দেরী না ক’রে তাকে কাছে আনাই এখন উচিত নয় কি রেবা ?”

রেবা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল—“হ্যাঁ, আজই যান তাহ’লে।”

“তার পরে—আমার কথার উত্তর কি ? হৃষিকেশে যাবে না তো আর ?”

“এখন তো আপনি যান—পরের কথা পরে।”

রেবা কক্ষত্যাগের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়াই, অনিল হাসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল,—“তা হবে না রেবা—কথা দিতে হবে তোমায়।”

"তাহ'লে আপনাকেও একটা কথা দিতে হবে!"

"কি কথা?"

"আপনারাও ব্যস্ত হ'য়ে আমায় বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দিতে পাবেন না!"

অনিল বিস্মিত মুখে বলিল, "সে কি রেবা? আমরা তোমায় বিদেয় ক'রে দেব? তুমি যাবে শুনে মা কেঁদে অস্থির—সেই-ই তোমায়ই আমরা বিদেয় ক'রে দেব!"

"বলুন—দেবেন না?"

অনিল একটু ভাবিয়া সহসা যেন এ কথার কূল দেখিতে পাইল—"তুমি কি তোমার বিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেবার কথাই বলছ?"

রেবা নিঃশব্দে রহিল। অনিল গম্ভীর মুখে ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে বলিল, "তোমার মত বয়স পর্য্যন্ত যারা কুমারী অবস্থায় আর স্বাবলম্বের মধ্যে কাটিয়েছে, তাদের বিয়েতেই শেষে অনিচ্ছা হওয়া খুবই সম্ভব ব'লে মানি আমি, কিন্তু মা যদি রাজী না হন?"

রেবা হাসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনি যে-রকম করে তাঁকে রাজী করলেন—এই রকম ক'রে কেঁদে কেটে হাতে পায়ে ধ'রে ক্রমশঃ রাজী করা যাবে।"

অনিল রেবার হাসিতে এবার সুখী হইল না—সেই রূপোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অন্যমনস্কের মত বলিল, "সেটা তো উচিত হবে না রেবা—"

"এখন যেখানে যাচ্ছেন যান্, ও নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করবেন না—ও-কথা পরে হবে।"

"যখনই হবে, তখনই তো এই সমস্যা উঠবে! আমার কথা বললে, আমায় যে ভগবানই এ কর্ত্তব্যের ভার দিয়েছেন। তাঁরই এ আদেশ, তাই আমি মাকে কষ্ট দিয়েও বাধ্য করলাম। কিন্তু তুমি কিসের জন্য তোমার এমন জীবনকে—"

"আপনার কি সময় নষ্ট হচ্ছে না? যান্ না কোথায় যাবেন!"

রেবা অনিলের পাশ কাটাইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

১৯

অনিল শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলে তাহার শ্বশুর প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, শেষে গলার স্বর এবং ভাবভঙ্গীতে বুঝিয়া আস্তেব্যস্তে জামাতাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনিলের মন এ ঘটনায় একটা যেন আঘাত পাইল। ইনিই যখন চিনিতে পারিলেন না, তখন সেই অর্দ্ধমনুষ্য শ্যামলী তাহাকে চিনিবে কি? তাহার সঙ্গে শ্যামলীর কতটুকুর পরিচয়? এই বিধিনির্দ্দিষ্ট দু'দিনের পরিচয়ের স্থানে যিনি মাতৃমূর্ত্তিতে অধিষ্টিত ছিলেন, আজ তিনি থাকিলে হয়ত অনিলের যেমন পরিবর্ত্তনই হউক না কেন—তাহাকে চিনিতে কাহারো দেরী হইত না। অনিলের মনে হইল—এইবার সে একটি সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় গৃহেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্যামলী, যাহাকে লোকে অর্দ্ধ-জড়ই বলিয়া থাকে, সে আজ এই বিকৃতদর্শন অনিলের সঙ্গে দু'দিনের সে সম্বন্ধ-বন্ধন স্বীকার করিবে কি? চিনিতেও যদি পারে, সে সম্বন্ধের বিষযে কোন জ্ঞান এখন তার হইয়াছে কি? সে অনিলের সঙ্গে তাহার গৃহে যাইতে চাহিবে কি?

উভয়ের মধ্যে সময়োপযোগী কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শ্বশুর তাহার দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণের কথা জানিতেন এবং সেইজন্যই যে শ্যামলীর মাতার অন্তিম ইচ্ছাও তিনি পালন করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে শেষ দেখা দিবার জন্য অনিলকে একটু সংবাদও দিতে পারেন নাই, সে কথা বলিলেন। কেবল এই

ব্যাধির ফলে অনিলের যে এমন অবস্থা হইয়াছে, তাহাই তিনি জানিতেন না—এ কথাও ক্রমে প্রকাশ করিয়া দুঃখ করিলেন। অন্যদিকে অনিলও তাঁহার ক্লিষ্ট ক্লান্ত হতশ্রীতে তাঁহার গূঢ় শোকের আভাস পাইতেছিল। লক্ষ্মী-মূর্ত্তিতে এই গৃহকে যিনি আশ্রয় করিয়া ছিলেন, তাঁহার অভাবে সবই যেন শ্রীহীন, শোভা-হারা। বাইরের ঘরে বসিয়াও অনিল যেন এই লক্ষ্মীহীন গৃহখানির সমস্ত অবস্থা মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেছিল।

এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যেও শ্যামলীর পিতা জামাতার অভ্যর্থনার চিন্তায় মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন। পাড়ার একটি রমণী দয়া করিয়া দুইটা রাঁধিয়া রাখিয়া যায়, শহরের মত এ গ্রামে তো ইচ্ছা করিলেই রাঁধুনী পাওয়া যায় না। তাঁহারা দুইটি প্রাণী যখন হোক্ দু'টা মুখে দেন, কিন্তু এই ধনী জামাতার জন্য আজ কি ব্যবস্থা করা যাইবে! যে এ-সব দেখিবে—সে আজ কোথায়? সে যদি আজ মুমূর্ষুভাবেও বিছানায় পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহাকে এর জন্য যে কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না।

কথাবার্ত্তার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাঁহার বিমনা ভাবে অনিল ক্রমে তাঁহার এই দুশ্চিন্তার কথা বুঝিতে পারিল। কিন্তু আপনা হইতে শ্বশুরকে এ বিষয়ে ভরসা দিবারও কোন কথা কহিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে শ্বশুর যখন চাকরকে—"ওরে, মুখ-হাত ধোবার জল আন্ দোকানে যা দেখি একবার" প্রভৃতি আদেশ দিলেন, তখন কুণ্ঠিত অনিল জানাইল যে, তাঁহার ব্যস্ত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তাহার অসুস্থ শরীর, সেজন্য আহারাদির বিষয়ে কোন বাহুল্যের আবশ্যক নাই, দোকানের কিছু তো সে ব্যবহারই করিতে পায় না। একটু দুধ হইলেই চলিবে, আর তাহাকে দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

শ্যামলীর পিতা চাকরকে দুগ্ধের ব্যবস্থার আদেশ দিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "বিজলীও যদি আজ এখানে থাকৃত!"

অনিল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? শিশির কি এমন সময়েও তার স্ত্রীকে পাঠায় নি?"

"বিজুর যে সন্তান হয়েছে।" তিনি এই খবরটি মাত্র পেয়ে গেছেন, কিন্তু চোখে দেখার উপায় ছিল না। "এখনো তারা রাস্তায় বেরুবার উপযুক্ত হয় নি।"

অনিল অধিকতর বিস্মিত হইল, কিন্তু একটু পরেই বুঝিল, শিশির কেন এ সংবাদ তাহাদের দেয় নাই। নিজের সুখ-সৌভাগ্যে শিশির অনিলের কাছে কুণ্ঠিত।

অনিল জানাইল, তাহাকে এখনি ফিরিতে হইবে। শ্বশুর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তবু এইটুকুই যে দেখা দিতে এসেছ—এইই—"

বাধা দিয়া অনিল বলিল, "আপনার কন্যাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।"

শ্যামলীর পিতা ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া শেষে বলিলেন, "জানি এও তোমারই উপযুক্ত। সে হতভাগী যে ডানার তলে লুকানো ছিল, সে আশ্রয় আজ তার নেই; আজ যদি সে তোমার আশ্রয়ে থাকারও উপযুক্ত হ'ত, তা হ'লেও যে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু বাবা—কেন আর তার জন্যে বৃথা এত কষ্ট করছ, সে এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে। মাঝে কিছুদিন বেশ মানুষের মতই হয়ে উঠছিল, এখন একেবারেই জড় হ'য়ে পড়ছে দিন দিন। সংসারের কিছু জানা দূরে থাক্, নিজেও স্নান করতে খেতে পর্য্যন্ত ভুলে যাচ্চে—দু-তিন দিন না খেলেও তার ক্ষিধে তেষ্টা বোধ পর্য্যন্ত আসছে না,—টেনে ধ'রে এনে কিছু খাওয়াই। কেবল তার মার ঘরে—নয়ত ছাদেই পড়ে থাকে মড়ার মত! কি কর্ম্ম-ভোগ যে ঈশ্বর—যাক্, এ নিয়ে গিয়ে বাবা কি করবে তুমি! তারও উপরে মূর্চ্ছার ব্যারাম ধরেছে কিছুকাল থেকে। না বুঝে যদি নিয়ে যাও আবার, তোমার মা নিশ্চয় ফিরিয়ে পাঠাবেন।"

অনিল ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "বোধ হয়, মার অভাবেই এসব হয়েছে।"

"না-না বাপু! আমার সন্তান, তার মঙ্গলে তো আমার নিশ্চিন্তই হবার কথা, কিন্তু তা হবার নয় জেনেই বলছি, তার গর্ভধারিণী মারা যাবার অনেক আগে হ'তেই তার ঐ রকম মূর্ছা আরম্ভ হয়েছিল। ছাদ থেকে একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় কতদিন তুলে আনতে হয়েছিল। কেন আর বাবা তার জন্যে —যাও, ঘরে গিয়ে বিয়ে ক'রে সংসারী হও গে, তবে কখনো যদি আমাদের এই রকম মনে কর, সেইই আমাদের পক্ষে—" কথা আর শেষ করিতে না পারিয়া শ্যামলীর পিতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাত চাপা দিলেন।

অনিল আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে বলিল, "তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।"

"বাড়ীর মধ্যে যাও তবে। আর তো কেউই বাড়ীতে নেই, হয়ত ছাদেই আছে।"

অনিল ঘরেই শ্যামলীকে দেখিতে পাইল। কি বিবর্ণ পাণ্ডুর রুগ্ন মুখশ্রী! চক্ষুতে অনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টি, শরীর অতিশয় শীর্ণ। অনিলকে দেখিয়া তাহার মুখে সামান্য ভাবান্তর হওয়াও দূরে থাকুক, গৃহে একটা অপরিচিত লোক দেখিলেও যেমন মানুষে একটু জিজ্ঞাসুভাবে চাহে, শ্যামলীর সেটুকু বোধের লক্ষণও অনিল দেখিতে পাইল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে যখন সে সে-স্থান হইতে যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া যাইতেছিল, তখন অনিল তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে এইবার সে দৃষ্টি ফিরাইয়া অনিলের পানে চাহিল। বিস্ময়, বিরক্তি এইবার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তখন ঠিক যেন—"এ আবার কে? ঘরের মধ্যে এমন ক'রে এসে দাঁড়ায় কেন?"—এই ভাবে শ্যামলী অনিলের পানে দৃষ্টি হানিয়া ভ্রূকুটীর সহিত তাহাকে হস্তের ইঙ্গিতে পথ ছাড়িতে আদেশ করিল। অনিল মূঢ়ের মত কেবল চাহিয়া ছিল; দ্বিগুণ বিরক্তিভরা মুখে শ্যামলী তাহাকে একরকম ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া গৃহ ত্যাগ করিল।

* * * *

অনিল বাটী পৌঁছিয়া প্রথমে মাতাকে দেখিতে পাইল না। জানিত, সে কখনো স্থানান্তরে গেলে তাহার আসিবার দিনে মাতা সমস্ত দিন প্রায় রাস্তার ধারের জানালাতেই বসিয়া থাকিতেন। আজ বধূবরণ করিবার ভয়েই যে তিনি লুকাইয়াছেন, তাহা বুঝিয়া অনিল মনে মনে একটু ক্ষোভের হাসি হাসিল।

পথশ্রান্তিতে দুর্ব্বল অনিল অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। ঘরে ঢুকিয়া সে দীর্ঘ চেয়ারখানায় নিজের দেহকে প্রসারিত করিয়া দিয়া চোখ বুজিল। বাতাসেরও একটু দরকার, কিন্তু ফ্যান খুলিবার কথা অনিলের মনে পড়িল না। মা সম্মুখে আসেন—এ কথাও লজ্জায় বেদনায় সে ইচ্ছা করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু তাহার অন্তর একটু কিছু যেন আজ চাহিতেছিল। একটু স্নেহের স্পর্শ, এমনি একটু কিছু ; অথচ তাহার কাছে লজ্জা পাইবার কিছু না থাকে ! মা তাহার আজিকার অন্তরের কথা বুঝিবেন কি ? তিনি হয়ত আনন্দে—অথবা জয়ের গর্ব্বে—না, মার এখন আসিয়া কাজ নাই,—সে একটু সাম্‌লাইয়া লউক।

খুট্ করিয়া একটু যেন শব্দ হইল। অনিলের সে শব্দ কানে পৌঁছিলেও কান সে শব্দকে যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারিল না—অনিল তখন এতই অন্যমনস্ক ! কিন্তু একটু পরেই ক্লান্তি আপনোদনের স্বস্তি তাহাকে যেন জাগাইয়া তুলিল। আঃ—বাতাস পাইয়া প্রাণটা যেন বাঁচিল, কিন্তু এ কি ! ফ্যান খুলিল কে ? অনিল সচকিতে চোখ খুলিতেই দেখিল—মা নন্, রেবা নিঃশব্দে গৃহের একধারে দাঁড়াইয়া আছে। অনিলকে চাহিতে দেখিয়াই নিজের চোখ নামাইয়া নিজের সেই শান্ত স্বরে সে বলিল, "একটু জল আনব কি ?"

"জল ? হ্যাঁ—আনো !" রেবা গৃহ ত্যাগ করিতেই অনিল আবার চোখ বুজিল। মা যে এখন আসেন নাই—ভালই হইয়াছে। কিন্তু রেবা তখনি ফিরিল। হস্তে আহার্য্য ও স্নিগ্ধ পানীয় লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "জল খান্ !"

অনিল প্রায় চোখ বুজিয়াই নিঃশব্দে তাহার হস্ত হইতে ধীরে ধীরে সেগুলা গ্রহণ করিল। বলকর পথ্য-পানীয়ে যখন সে একটু সুস্থ ও সবল হইয়া চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, তখন রেবা আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া অনিল ডাকিল, "রেবা!"

রেবা দাঁড়াইল।

"শোন, মা কোথায়?"

"তাঁর ঘরে আছেন। ডাকব কি?"

অনিল ত্রস্তস্বরে "মা" বলিয়া চোখ বুজিয়া চেয়ারের গায়ে মাথা রাখিল। কিছুক্ষণ পরে চাহিতেই দেখিতে পাইল—রেবা সেই এক ভাবেই, অচল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে এ কি কাতর উদ্বিগ্ন ভাব? মুখে এ কি বিবর্ণ পাণ্ডু ছায়া? জগতের কাছে অনিলের প্রাণ তাহারও অজ্ঞাতে এতক্ষণ যাহা চাহিতেছিল—এই কি তাই? এই নিঃশব্দ মর্ম্মবেদনা—এই স্নেহের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি লইয়া এই সম্পূ' পর রেবা তাহার সম্মুখে কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল! রেবার কথা এতক্ষণ সে যেন ভুলিয়াই ছিল—এইবার তাহার এই মুখ—এই দৃষ্টি তার কথা মনে আনিয়া দিলে অনিলের মনে পড়িল—এ আর অসম্ভব কি! এ যে রেবা! কিন্তু তাহার এ ব্যথার উপরেও কি রেবার এমনি সহানুভূতি? তাহার এই চেষ্টাকে বিশ্বসুদ্ধ যে খেয়াল বলিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। এই বালিকা যে আজ সেখানেও বিগ্রহিনী দয়া মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া, লজ্জিত ব্যথিত অনিলের সে বেদনাতেও সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হইয়াছে। কথা সে কহে নাই, তবু তাহাকে অনিলের চিনিতে তো বাকি নাই। অনিলের যে ইহাকে দেখিয়া আজও কুণ্ঠিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই, একথা অনিল বেশ বুঝিল। রেবা তাহার আদেশের অপেক্ষায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া অনিল কথা কহিল, "জানো রেবা, আমি একাই ফিরেছি?"

রেবা তেমনি নতমুখেই রহিল।

"সে আমায় চিনতে পারল না,—এল না!"

রেবা মুখ তুলিয়া অনিলের পানে না চাহিয়াই মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এ তার পক্ষে তো অসম্ভব নয়!"

"কেন রেবা—আমি যে তার জন্যে কত করতে চাই, তা—"

রেবা এইবার তার শান্ত সমবেদনা-ভরা দৃষ্টি অনিলের পানে ফিরাইয়া উত্তর দিল, "কিন্তু তা কাজে তো করতে পারেন নি! যতটুকু পেরেছেন, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা ভগবান তাকে দেননি, সে যে অসম্পূর্ণ জীব, তার এ অসঙ্গত কাজ নয়।"

"তাই কি রেবা? না আসতে চাক্,—চেনা কি উচিত ছিল না?"

"না, তার সঙ্গে আপনার ক'দিনের পরিচয়? ক'দিন আপনি তার কাছে ছিলেন?"

অনিল চোখ বুজিযা একটু ভাবিয়া বলিল, "হয়ত তুমি যা বল্‌ছ, তাই ঠিক। নিজেকে তার কাছে আমি কতটুকু পরিচিত করতে পেরেছি! তার অবস্থা যে অনুভব করবারই ক্ষমতা নেই। তার উপরে আমার এই পরিবর্ত্তন! শ্বশুরই প্রথমে চিন্‌তে পারেন নি, তিনি তো একটা পূরো মানুষ!"

রেবা নিঃশব্দে রহিল। অনিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল রেবা, এইবার মায়ের কাছে যাই।"

আবার যেমন দিন কাটিতেছিল, কাটিতে লাগিল। মা তাহার দুর্নিবার লজ্জা সম্বন্ধে একটি কথাও কহিলেন না বা তাঁহার মুখে এমন কোন ভাবের ঈষৎ আভাসও অনিল একদিনও দেখিতে পাইল না, যাহাতে তাহার ব্যথা লাগে। যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবেই তিনি চলিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞ অনিলও মায়ের সম্বন্ধে সে যে একটু অবিচার করিতেছিল, এই অনুতাপে আবার যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে মাতার অঞ্চল অধিকার করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আর রেবা? তাহারই কাছে অন্তরের যত যা কিছু অনিল ক্রমে নিঃসঙ্কোচেই প্রকাশ করিতে লাগিল। শিশিরের অনুপস্থিতিতে এখন রেবাই ক্রমে তাহার বন্ধুর স্থান অধিকার করিতেছিল। শিশিরের খোকা হইয়াছে শুনিয়া মাতাও বলিলেন, "এইবার বৌ আর নাতি এনে আমায় দেখতে হবে।" অনিল তাঁহার মুখের দিকে দু-একবার চাহিল, কিন্তু মাতার অবিকৃত মুখভাবে বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এই সংযমে অনিলও বিস্মিত হইয়া গেল।

বেশ সুখেই দিন কাটিতেছে। অনিল বুঝিল—উচ্চ আদর্শে জীবনের তারকে বাঁধিতে না পারিলেও, তার অন্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তিকে পোষণ করিতে না পাইলেও, জগতে তার সুখশান্তির অভাব হইবে না। এই মা এবং এই একাধারে স্নেহে ভগিনী ও বন্ধু এবং এমন অযাচিত সেবিকা, প্রয়োজন অনুভবের পূর্ব্বেই সে-কার্য্য আন্তরিক আগ্রহের সহিত যে সম্পাদন করিয়া রাখে, সেই মহিমময়ী রেবার সাহচর্য্যে তাহার জীবন বেশ আনন্দেই কাটিবে। কেবল অনিল এই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছিল যে, মা সলিলের বিবাহের কোন কথা আর তোলেন না কেন! অনিলের দুর্ভাগ্যের দায়ে এই বংশ এবং মাতার চিরজীবনের সাধ সত্যই কি একেবারে লয় পাইবে? সলিলের স্ত্রী বা পুত্রকন্যাও কি এ গৃহ অলঙ্কৃত করিবে না? মা এ কি করিতেছেন?

মার কাছে এ কথা তুলিতেই মা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ভেবেছি অনিল, ভেবে কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। এখন বুঝেছি, এ সংসারের এই-ই বিধান ভগবান ক'রে দিয়েছেন, তাঁর কাজের উপরে আর আমি হাত চালাতে যাব না।"

"সে কি মা? সলিলের বিয়ে দিতেই হবে, আমি কালই পাত্রী খুঁজতে চেষ্টা করব। কেন, সেই যে সম্বন্ধ এসেছিল, সে তো খুব ভাল—তাদের কালই—"

মাতা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না অনিল, সে চেষ্টা করো না, আমি আমার

ছেলেদের আর বিয়ে দেব না, সে আমার সইবে না।"

অনিল কাতর কণ্ঠে বলিল, "কেন মা? কেন অমন করছ? পায়ে পড়ি তোমার—"

"অনিল, একটু বুদ্ধি শুদ্ধি ধরতে শেখো, বয়স তো হচ্ছে! এই যে পরের মেয়ে রেবা, তাকে একটি ভাল পাত্রে সম্প্রদান ক'রে তার মায়ের আত্মাকে একটু শান্তি দেব, সেই তীর্থস্থল থেকে এই প্রতিজ্ঞা করেই নিয়ে এসেছিলাম। তাকেই যখন এমনি করে রাখতে হ'ল আমায়, তারই যখন বিয়ে দিতে পারলাম না, তখন নিজের ছেলের বিয়ে দিয়ে কোন্ মুখে সংসারী হ'ব? রেবাকে এমনি ক'রে চোখের উপর রেখে নিজের এই সংসার পাতানো, একি আমার ধর্ম্মে সইবে? সে আমি পারবই না!"

অনিল চমকিয়া উঠিল, তাই তো! এ কথা তো তাহার এক দিনও মনে হয় নাই। রেবা যেন সেই হিমালয়ের অন্তর হইতে নির্ঝরিণী ধারার মত বহিয়া আসিয়া তাহাদের ঘরের প্রান্ত দিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য কাহারও যেন কিছু ভাবিবার বা করিবার নাই, কেবল তাহার স্নিগ্ধ স্বচ্ছ স্নেহধারায় নিজেদের সর্ব্ব প্রয়োজন সারিয়া লও, তীরে বসিয়া তাহার শীতল স্পর্শে জীবনের ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করো, শোভায় নয়ন তৃপ্ত করিয়া লও, কলস্নেহভাষণে কানের মনের স্নেহ-ক্ষুধা দূর হউক, কিন্তু তাহার জন্য কাহারো কোন কর্ত্তব্যই নাই। অনুতপ্ত অনিল বলিল, "ঠিক কথা মা, এ কথা যে আমার মনেই হয়নি। আগে তাহ'লে রেবার জন্যেই—"

বাধা দিয়া মাতা বলিলেন, "সে বৃথা চেষ্টায়ও কষ্ট পেও না অনিল, সেও হবার নয় বুঝেই আমি এসব ইচ্ছা এখন একেবারে ত্যাগ করতে চাইছি।"

"কেন হবার নয়? নিশ্চয় হবে। আমি খুব ভাল পাত্র খুঁজে আনব—দেখো।"

"অনিল, তুই এর মধ্যে এত ভুলে যাস্? তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করায়

সেদিন সে হরিদ্বারে যাবার জন্যে কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা কি তোর মনে নেই?"

অনিলের সে-কথা মনে পড়িল এবং তার চেয়েও বেশী মনে পড়িল, রেবা তাহাকেও কি প্রতিজ্ঞা করাইতে চাহিয়াছিল, বুঝি কতকটা রাজীও করিয়াছিল! তাইত, তাহ'লে উপায়?

মাতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু এমন ক'রেও আর তাকে রাখা উচিত হচ্ছে না। যে আসে, সেই এমনভাবে তার দিকে চায়, এমন কথা বলে, যে রেবার মত মেয়ে বলেই তা সহ্য করছে, অন্য কেউ করত না—কোন্ দিন চ'লে যেতে চাইত।"

অনিল উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কে কি বলে? কার এত বড় সাধ্যি? রেবা আমাদের বোন, এ কথা সকলকে বলতে পার না?"

"মুখের এ কথায় কি সকলের মনকেও বন্ধ ক'রে দিতে পারা যায়? তাই ভাবছি, ওকে নিয়ে আমিও তীর্থস্থানেই যাই, তার পরে তোরা যার যা ইচ্ছে—"

মাতা নীরব হইলেন। অনিল একটু স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ব্যগ্র আগ্রহে সহসা বলিল, "আমি আর একবার রেবাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লে দেখি মা।"

মা চক্ষু ঢাকিয়া কেবল হস্ত তুলিয়া নিষেধমাত্র করিলেন। কিছুক্ষণ আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে কেবল বলিলেন, "না, তাকে আর অযথা কষ্ট দিতে পাবে না তুমি।"

অযথা কষ্ট? হ্যাঁ, এই বালিকাকে সুখী করিতে আনিয়া অনেক ভোগই দেওয়া গেল বটে! না জানি, সকলের ব্যঙ্গদৃষ্টিতে বিদ্রূপে সে কত অপমানই নিঃশব্দে সহ্য করিতেছে! অনিল অতর্কিতে বলিয়া উঠিল—"কে কি বলে মা রেবাকে? কেন বলে—ছি ছি!"

"জগতের যেমন রীতি, তারাও তো তাই দেখছে শুনছে, তেমনিতর ব'লে থাকে। ভাবে, এতে তাদেরই বা দোষ কি! বড় যে ভাল লোক, সেও বলে, "মেয়েটিকে কি বৌ করবার জন্যে এনেছ? কার সঙ্গে বিয়ে দেবে? অনেক বড় হয়েছে, আর এমনি রাখা ভাল দেখায় না।"

অনিল যেন অকূল সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইল। "ঠিক মা, এ কথা তো এতক্ষণ মনে হয়নি, সলিলের সঙ্গে বিয়ে দাও না কেন রেবার? এস, তাই দেওয়া যাক্। রেবাও আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, এ বাড়ী থেকে অন্য কোথাও তাকে আমরা পাঠাব না। সলিলের সঙ্গে বিয়ে দিলেই—"

"অনিল—অনিল—তুই আমার পেটের ছেলে—মুখ দিয়ে আমার বেরুচ্ছে না—তবু বলছি, তুই অন্ধ অনিল—একেবারে অন্ধ।" বলিতে বলিতে মা মুখ চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আর অনিল বিস্ময়ের অতল গহ্বরে পড়িয়া বাক্যহীন চিন্তাহীন যেন নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

মা যাহা বলিলেন, তাহা কি সত্যই? সত্যই কি অনিল অন্ধ? অনিল অন্ধ হইতেও যে রাজী, তবু এমন সত্যকে সে যে সহ্য করিতে পারিবে না। যদি অনিলের পূর্ব্বাবস্থা থাকিত, তবুও এ কথা যে সম্ভব বলিয়া মনে হইত—কিন্তু আজ এই বিকৃতদর্শন কুমুখ অনিল—যাহাকে আত্মীয়স্বজনেও চিনিতে পারে না, সেই অনিলকে ঐ প্রভাত সূর্য্যের মত উজ্জ্বলতাময়ী রেবা—ছি ছি, মার এ কি ভ্রান্তি! এ কি কখনো সম্ভব? এ ভ্রম মার ভাঙিতেই হইবে।

যদি এমন অসম্ভবও জগতে সম্ভব হয়, তাহা হইলেও এর প্রতিকার এখনি করার প্রয়োজন। এ চিন্তা—এর সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যত্ব লইয়া এমন করিয়া ভাবিতেও যে বেশীক্ষণ পারা যায় না! রেবার মত সর্ব্ববিষয়ে দেবীরূপেই যে তাহাদের সংসারে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার বিষয়ে এ কি ভ্রান্তি মা অনিলের মাথায়ও ঢুকাইয়া দিলেন! কেন মনে হইতেছে, মার দৃষ্টি সত্যই যে অভ্রান্ত—তিনি যাহা বোঝেন, ক্বচিত তাহার অন্যথা দেখা যায়, তবে কি এ কথাও সত্য? না-না, ইহা হইতেই পারে না।

উদ্‌ভ্রান্ত মনে অনিল পড়িবার ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া রেবা কি কাজ করিতেছে। কি আর কাজ! তাহারই স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু একটা সেবা রেবার হাতে রহিয়াছে! এই রেবা? এই তরুণী—যাহার অঞ্চলের প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন রূপের তড়িৎপ্রভায় হাসিতেছে, যার সেবাকুশল হস্ত জগতের পীড়িত আর্ত্তদের কামনার সামগ্রী, যার অন্তর—থাক্ সে চিন্তা, এই রেবাই কি অনিলের মত আতুরের জন্যও— ছি ছি! কল্পনায় অনিল নিজের এখনকার মুখ চিন্তা করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইল।

অনিলকে দ্বারের কাছে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রেবা একটু ত্বরিত হস্তে নিজের আরব্ধ কাজটা সারিতে সারিতে ঘাড় ফিরাইয়া ডাকিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—ওদিকের কৌচটায় বসুন না। আমার হ'ল ব'লে।"

অনিল শ্লথচরণে আসিয়া চেয়ারটার উপরে শুইয়া পড়িল। সে আর সত্যই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

হাতের কাজ ফেলিয়া রেবা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, "কি হ'ল? মাথা ঘুরছে কি?"

"হ্যাঁ।"

মিনিট ছয়েক পরেই রেবার মৃদুস্বর আবার কানে গেল, "খেয়ে ফেলুন।"

অভ্যাসত অনিল ঔষধ-মিশ্রিত দুগ্ধের সন্ধানে হাত বাড়াইল। ইতিমধ্যে

ঘরের পাখাও খোলা হইয়াছিল। একটু পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া অনিল সজোরে উঠিয়া বসিল। মনের সব দুর্ব্বলতা যেন সে ঝাড়িয়া ফেলিতেই চায়। রেবাকে আজ এই নূতন চিন্তার মধ্যে দেখার সঙ্গেই তাহার অভাবগ্রস্ত দৈন্যভরা প্রাণ কিসের যে কম্পনে আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যাই হোক—এ কথা সত্য হোক, মিথ্যা হোক, যাহা করিবার, তাহা করিতেই হইবে। এ লইয়া এত অধীর হইলে চলিবে কেন ?

অনিল উঠিয়া বসিলেও রেবা শঙ্কিত মুখে বলিল, "মাকে ডাকি ?" অনিল যে এখনো প্রকৃতিস্থ হয় নাই, তাহা সে অনিলের মুখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল।

অনিল তাহাকে বাধা দিল, "না, শোন, তোমারই সঙ্গে একটু কথা আছে আমার।"

"কি কথা ?"

রেবারও মুখ যেন একটু অজ্ঞাত ভয়ে কি এক রকম হইয়া উঠিল। অনিল আজ এমন করিয়া কেন তাহার সহিত কথা কহিতে চাহিতেছে ? কি না জানি আবার সে বলিবে !

কোন ভূমিকামাত্র না করিয়া অনিল বলিল, "সলিলের বিয়ে দিয়ে আমাদের একটু সংসার করতে হবে, এমন ভাবে দিন আর কাটে না, কিন্তু তার আগে তোমার আমরা বিয়ে দিতে চাই রেবা।"

রেবা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝিল, আশেপাশের অপ্রীতিকর মন্তব্যগুলা অনিল শুনিয়াছে। যাহা সে নিঃশব্দে সহিয়া যাইতেছে, তাহা তো অনিল সহ্য করিতে পারিবে না। কেনই বা পারিবে ? রেবা একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, মাকে তো বলেছি, আমি হৃষিকেশেই আবার ফিরে যাব। মা আর দু-একমাস অপেক্ষা করতে বলেছেন, তাই—"

"বুঝেছি, তাই তুমি এখনো আছ, কিন্তু কেন তাই বা তুমি যাবে? এ বন্ধন তো জগতের সর্ব্বপ্রাণীই স্বেচ্ছায় বহন করতে চায়, তুমিই কেন তা নেবে না?"

রেবা উত্তর দিল না। অনিল আবার বলিতে লাগিল, "মনে ক'রে ছাখো, তুমিই না আমায় বলেছিলে, তোমাকে আমরা অন্য কোথাও যেতে বাধ্য না করি। আমায় সে বিষয়ে তুমি একরকম প্রতিজ্ঞা করিয়েই নিয়েছিলে। আমরাও যে স্বেচ্ছায় তোমায় পরের ঘরে পাঠাতে পারি, এতটা বলও রাখি না রেবা। তুমি আমাদেরই ঘরের লক্ষ্মী হয়ে চিরদিন থাক। মার মেয়ের মত বধূ হয়ে—আমারও চিরদিনের আশ্রয়রূপা হয়ে—ও কি রেবা—অত অস্থির হ'য়ে উঠছ কেন? শোন আমি যা বলছি!"

দেয়ালে পিঠ রাখিয়া রেবা অনিলের চোখের সম্মুখ হইতে নিজের মুখখানিকে একেবারে অদৃশ্য করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "একটু শীগ্‌গির শেষ করুন, আমার বিশেষ কাজ আছে।"

"থাক্ কাজ, এ সংসারের সব কাজকে আগে নিজের ক'রে নাও, তবে তোমার এত আত্মবিসর্জ্জন আমি সহ্য করতে পারব রেবা। এ ঘরকে যদি এত স্নেহই করেছ, যাকে ছেড়ে যেতেও তুমি একদিন চাও নি, সেই ঘরেই অচলা হ'য়ে থাক তবে। সলিলকে—"

সরোষে রেবা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন—সলিল আমায় 'দিদি' বলে! কে বললে, আপনাদের ঘর ছেড়ে আমি যেতে চাই নি? আমি শীগ্‌গিরই যাব, মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।"

অনিল থতমত খাইয়া বলিল, "তুমিই একদিন আমায় বলেছিলে—"

"যদি ব'লে থাকি তো সে মত আমার বদলেছে জানবেন।"

রেবার এমন উত্তেজিত ভাব অনিল কখনো দেখে নাই। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল মুখ ও জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর ক্রোধ-রক্তিমার পশ্চাতে আরও একটা কি যেন

বন্যার মত বেগে ছুটিয়া আসিতে চাহিতেছিল—যাহার আভাসে রেবার কালো চোখের পাতার কোল দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। রেবা প্রাণপণে তাহাতে বাধা দিতে দিতে পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র আবার অনিল বিহ্বলকণ্ঠে ডাকিল, "রেবা, রেবা—যেও না, দাঁড়াও আর একটু!"

রেবা মুখ ফিরাইল না—কেবল দাঁড়াইল।

"কিন্তু এই উপহার দিয়েই কি তোমায় এ ঘর থেকে বিদায় দেব? এই লজ্জা, আর এই অপমান! যাকে মুমূর্ষু দেখে—ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত দেখে তোমার যাত্রাপথ থেকে আবার তুমি ফিরে এসে এমন ক'রে যাকে বাঁচিয়েছ, তার হাত থেকে এই নিয়েই আবার তুমি এ সংসার থেকে বিদায় নেবে? অন্যত্র কিম্বা এ ঘরের সঙ্গেও এ বন্ধনে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তবে যেমন আছ, তেমনি থাক, চলে যেও না।"

রেবা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কি যেন সম্বরণ করিয়া লইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গাঢ়স্বরে বলিল, "না, তাও আর হয় না; তাতে আপনাদেরও সুনামের ক্ষতি, আমিও—যাক্ সে কথা। এ সম্ভব হ'ত, যদি শ্যামলীকে আনতে পারতেন।"

অনিলের বুকে আবার একটা আঘাত বাজিল—"তাতেই বা তোমার কি হ'ত রেবা? না হয় লজ্জা আর অপমানের হাত হতেই নিস্তার পেতে, কিন্তু—"

"এতে আবার কিন্তু কি? ঐগুলো ছাড়া আমার অসুখের আর কি আছে?"

"বাকি সবই কি তোমার সুখের? দিন রাত কেবল এমনি ক'রে আমারই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ব্যস্ত থেকে নিজে এই তপস্বিনীর মত এমনি করে চিরজীবন—"

রেবা তাহার অশ্রুভরা বৃহৎ সুনীল চক্ষু এইবার অনিলের পানে ফিরাইয়া, তাহাতে একটু যেন হাসির আভাস আনিয়া অনিলের মুখের কথাই যেন কাড়িয়া

লইয়া বলিল, "খুব সুখেই কাটিয়ে দিতাম, কেবল—কেবল যদি—" বলিতে বলিতে সমস্ত মুখখানিই হাসির আলোয় ভরিয়া ফেলিয়া রেবা বলিল, "কেবল যদি শ্যামলী আপত্তি করতো, তা হ'লেই তাও ছেড়ে দিতাম।"

রেবার মুখের অনুপম আলোয় অনিলের অন্তরের অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সনিশ্বাসে সে বলিল, "শ্যামলীতে কি এও সম্ভব রেবা? সে কি মানুষ?"

"কি জানি!" বলিয়া রেবা চুপ করিল।

অধীর অনিল বলিল, "না, এ ভ্রম আমার এইবার ভেঙেছে, তার বাপ যা বলেছে, সকলে যা বলছে, তাই ঠিক! না হ'লে সে আমায় চিনতেও পারলে না! যাক্, কিন্তু এ কি তুমি বললে রেবা? এই আমি—একটা উন্মাদ অর্দ্ধমনুষ্য জীবের স্বামী ও সহচর হ'য়েই যদি থাকতাম, তাতে নিজেও এমন কুশ্রী যে, স্বজনেও ঘৃণায় মুখ ফিরায়—"

"আপনার সেই স্বজনদের সামনে এর বিচার করুন গে,—এখানে সে কথা কেন!"

"রেবা যেও না, দাঁড়াও, হ্যাঁ জানি, আমার মা—আমার শিশির সলিল, আমার এই মুখের দিকেই সস্নেহে সাগ্রহে চেয়ে থাকে, এর সুখদুঃখের জন্যে ব্যস্ত হয়; কিন্তু তুমি কে রেবা যে বুঝি তাদের চেয়েও--কে তুমি আমার—'পরস্যাপি পর'—" উত্তেজনার আধিক্যে অনিল থামিয়া গেল। নিজেরই তাহার নিজের কাছে যেন ভয় করিতেছিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি রেবাকে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "রেবা, উত্তর দাও!"

রেবা এইবার সনিশ্বাসে মুখ তুলিয়া বলিল, "মনে করুন না কেন, আপনি উপকারী—আমি উপকৃত। আপনার মা আমাদের যে স্নেহ করেছিলেন—"

"কে তোমাদের কোন্ উপকার করেছে রেবা? একবিন্দুও না! তুমি তো আশ্রয়হীনা ছিলে না, অনর্থক তোমায় আমরা এমন করে কেন আন্‌লাম!

মা তোমায় স্নেহ করেছিলেন? হ্যাঁ—এ সত্য বটে, তাই কি তুমি তাঁর অনিলের জন্যে এমন ক'রে জীবন উৎসর্গ করতে চাও? সেই কৃতজ্ঞতায়? তাই কি তাঁর এমন বিশ্বাস হয়েছে যে, তাঁর ছেলেকে তিনি তোমার সম্বন্ধে অন্ধই ব'লে বসলেন! এ কি রেবা? তাঁর উপর কৃতজ্ঞতাতে তুমি এতদূর কেন ভুল করালে তাঁকে? তাঁকে কেন এমন কথা বুঝতে দিলে—কেন তিনি এ কথা বললেন আমার পীড়াপীড়িতে, যে তাঁর এই আতুর ছেলে—একেই কিনা তিনি বলতে চান—তোমার মত—না, চ'লে যেতে পাবে না—দাঁড়াও, উত্তর দিতে হবে তোমায়।"

রেবা মৃদুস্বরে বলিল, "এ সব তুচ্ছ কথা নিয়ে কেন আপনি মাথা খারাপ করছেন, এত এলোমেলো গণ্ডগোল সহ্য অবস্থা এখনো আপনার হয়নি। মন থেকে এ সব ঝেড়ে ফেলে দিন, শিশিরবাবুরা সকলে আসবেন শুনছিলাম, তারই উদ্‌যোগ করুন না, একটু অন্যমনা হওয়া যাক সকলে!"

"কিন্তু তার পরে? তুমি চলে যাবে তো ঠিক?"

"সে কথা এখনি কেন, তার দেরী আছে তো!"

"না, এখনি হোক, কি অন্যের ঘরে—কি এখানে, কিছুতেই তুমি বাঁধা দেবে না?"

"না।"

"কেন?"

"সব কথারই কি উত্তর থাকে?"

"হ্যাঁ থাকে, সব উত্তরই আজ তোমায় দিতে হবে। বল, এই দ্যাখো, আমি চোখ বুজে আছি। (বলিতে বলিতে অনিল আবার চেয়ারে শুইয়া পড়িল, তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সত্যই এ উত্তেজনা আর সহিতে পারিতেছিল না।) বল আমায়—কেন কিসের জন্যে তুমি এমন ক'রে—" ক্রমে অনিলের স্বরও নিস্তেজ হইয়া গেল।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, অনিল আবার চোখ চাহিতেই দেখিল, ব্যাধিগ্রস্ত শয্যার পার্শ্বের সেই রেবা আবার তেমনি করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে, সেই মুখ সেই চক্ষু আবার তেমনি করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সহসা রেবার হাত ধরিয়া ফেলিয়া অপ্রকৃতিস্থ অনিল বলিল, "কি ক'রে এ মুখের দিকে এমন ক'রে চেয়ে আছ রেবা? কি ক'রে? ছি ছি! তোমার ঘৃণা হচ্ছে না?"

রেবা উঠিতে গেল—পারিল না। অনিল সজোরেই তাহার হাতটা ধরিয়া ছল। দেখিতে দেখিতে রেবার সেই চোখ ছাপাইয়া বন্যার মত অশ্রুরাশি যেন অনিলের হাতের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অবশ ভাবে রেবার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া অনিল আবার বিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "তবে সত্যই – সত্যই কি এ কথা মার রেবা! সত্যই তবে আমি অন্ধ? কৃতজ্ঞতায় নয়—অন্য কিছুতে নয়—সত্যই তুমি আমাকে—এই আতুর আমাকেই—"

দুজনেই নিঃশব্দে রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অনিল সহসা উঠিয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার জীবন তো তুমি জান; যেমনই হোক, আমার একজন স্ত্রী আছে, যদি সে কখনো—জানি তা সম্ভব নয়—তবুও ধর যদিই কখনো—"

"আপনি কেন অত ভাবছেন? তাঁর জায়গা তাঁরই থাকবে, আপনিও নিজের মনের গতির বিরুদ্ধে—তার জন্যে—আমার জন্যে বেশী কিছু আর করতে চাইবেন না। মা পাগলের মত আমার সঙ্গে যাবেন বলছেন বটে, কিন্তু তা বলুন, ক্রমে তাঁকে একরকমে আমি রাজী করব। আর তিনিও যে আপনাদের ফেলে যেতে পারবেন কিম্বা গিয়েও বেশীদিন থাকতে পারবেন তা আমার বিশ্বাস নয়। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্,—সলিলেরই বিয়ের উদ্‌যোগ করুন, বরং তার পরে যা হয় হবে।"

"অর্থাৎ তুমি চ'লে যাবে? তা আর হয় না। সকলের মনে ব্যথা দিয়ে,

মাকে চির-অসুখী ক'রে, আর তোমার মত—জগতের আকাঙ্ক্ষিত এমন জিনিসও পেয়ে কিসের জন্যে আমি ত্যাগ করতে পারব রেবা! কর্ত্তব্যের জন্য? তাই বা কৈ পেলাম? সে অবসরও তো ভাগ্য আমায় দিল না। যে আমায় জানে না, চেনে না,—অর্দ্ধমনুষ্য, তার জন্যে আমি আমার রাজঐশ্বর্য্য এমনি করে বিসর্জ্জন দেব! আর সে হয়ত চিরজীবনই কখনো আমার কাছে আসবে না, আমায় চাইবে না—চিনবে না। তবে আর কেন? কিন্তু, তবু একটু ভেবেই আমায় নিতে স্বীকার ক'রো রেবা। আমার দিকের কথা ছেড়ে দিয়ে—তুমি কিন্তু আরও একটু এ বিষয়ে ভাব। এই তো আমার জীবন,—এমন বন্ধনে বাঁধা যে তোমায় এর সর্ব্ববিষয়ের অধীশ্বরী করতে যদি কখনো নাই পারি, যদিই সে কখনো আসে--তার উপরের সে কর্ত্তব্য যে আমায় পালন করতেই হবে। বিধাতারই এ বিধান।"

"রেবা আরো একবার ভেবে দ্যাখো, এত'র পরেও, আবার এই সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এই কুৎসিত বিকৃতমুখ স্বামী কি তোমার—"

রেবা এইবার অসম্বরণীয় বেগে অনিলের পায়ের কাছে—মেঝের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া বলিল, "আর না, দয়া কর, এমন ক'রে আর ব'লো না, আমি জানি, তুমি শ্যামলীরই স্বামী; আমি তো এর বেশী কখনো চাইনি। দয়া কর, আমায় এমনি থাকতে দাও।"

"না, তাও আর হয় না। তোমায় যখন যেতে দিতেও পারব না, তখন এমন অপমানের মধ্যেও রাখতে পারি না।"

রেবার সহিত অনিলের বিবাহের আর একদিন মাত্র বাকী আছে। আত্মীয়-স্বজন হইতে বাড়ীর দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই এ বিবাহে আন্তরিক আনন্দিত। অনিলের মা-ই কেবল দিন গুণিতেছিলেন, এই দুইটা দিন

কাটিয়া গেলে যেন তিনি বাঁচেন। তাঁহার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না।

এ কয়দিন রেবার সহিত অনিলের বড় দেখা হয় নাই। রেবা সেদিন একটা কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া কতকগুলা কাপড় ও দুইচারিখানা কি অলঙ্কার একটা দেরাজের ড্রয়ারের মধ্যে গুছাইয়া রাখিতেছিল। অনিলের মাতা একটু পূর্ব্বে সেগুলা রেবার জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। রেবা বুঝিয়াছে—এ দ্রব্যগুলা তাহাদের বিবাহেরই অঙ্গীভূত বস্তু, তাই তাহার মুখখানা একটু আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ধীরপদে কে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই রেবা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—অনিল। লজ্জারক্ত মুখখানিতে নিমেষে দ্বিগুণ রক্ত-আভা ফুটিয়া উঠিল। একটু বেগের সহিত ড্রয়ার টানিয়া বন্ধ করিয়া রেবা চলিয়া যায়—অনিল ডাকিল, "রেবা!"

রেবা দাঁড়াইয়া অনিলের মুখপানে চাহিল। স্বর শুনিয়া যতটা হইয়াছিল, মুখ দেখিয়া তাহার দ্বিগুণ চমকিত হইল।

অনিলের হস্তে একখানা পত্র। রেবার হাতে সেটা দিয়া বলিল, "পড়।"

রেবা নির্ব্বাক ভাবে পড়িয়া গেল।

শ্রীচরণেষু,

অনিলবাবু, আমি জানি আপনি শ্যামলীর জন্য যতটা করিয়াছেন, এ কেহ পারে না। সেইজন্যই তাহার বিষয়ে শেষ কৃত্যটুকুও আপনাকে করিতে অনুরোধ করিতেছি। সে আর বাঁচিবে না,—তা ছাড়া বেশীদিন দেরীও বোধ হয় তার আর নাই। আমি আজ দিনকতক মাত্র এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তার অবস্থা দিন দিন যে রকম দেখিতেছি, তাহাতে আপনাকে এ সময়ে একবার না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। দিনরাত্রির বেশীর ভাগই প্রায় সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। তার ও আমাদের ভাগ্যদোষে এ বিষয়ে আমাদের জোর

করিয়া বলার মুখ নাই, তবু আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি বলিয়া এ খবর আপনাকে দেওয়া উচিত মনে করিলাম।

বেশী আর কি বলিব? আপনি যে ফটোখানা পাঠাইয়াছিলেন, হতভাগী অজ্ঞান হইলেও সেখানা কাছে ধরিয়া রাখে। ইতি

প্রণতা

বিজলী।

রেবা তেমনি নির্ব্বাক ভাবেই রহিল। ক্ষণেক পরে অনিল বলিল, "রেবা, বল কি আমার কর্ত্তব্য?"

এইবার মুখ তুলিয়া রেবা বলিল, "আপনি আজই সেখানে যান।"

"আজই?"

"হ্যাঁ, নৈলে কি জানি কি হয়, আর—"

"আর কি রেবা?"

"পাছে মা আবার দেরী করিয়ে দেন!"

"তবে তাই যাই, কিন্তু তার পরে রেবা?"

"যদি শ্যামলী বাঁচে, সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।"

২১

সমুদ্রের গভীর তলে যেখানে তাহার উপরের কোন চাঞ্চল্যই পৌঁছায় না, সেই শব্দহীন নিস্তরঙ্গ বিস্তৃত স্বচ্ছতার মধ্যে দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের ক্রমপ্রকাশ যেমন করিয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকে, তেমনি করিয়া শ্যামলীর শব্দবোধহীন মূক অন্তরে তাহার কল্পনাপ্রবণ চিত্তের সেই তারকামণ্ডল-মধ্যস্থ মূর্ত্তিটি পূর্ণচন্দ্রের

মতই ফুটিয়া উঠিতেছিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় অসীম স্বচ্ছ আকাশে এক এক সময়ে শ্যামলী এমনি করিয়াই প্রকাণ্ড একটা জ্যোতির্মণ্ডিত বস্তুকে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু সে দৃশ্য তো সে সহ্য করিতে পারিয়াছে। আনন্দে করতালি দিয়াছে, হাসিয়াছে, নাচিয়াছে, তাহার পরে ক্রমশঃ তাহার দেহ মন অবশ হইয়া পড়িয়া নিস্পন্দভাবে কেবল চক্ষের সাহায্যে চাঁদ ও চরাচরের সেই দেওয়া-নেওয়ার মিলনদৃশ্য দেখিয়াও গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তো তাহাকে এমন জ্ঞানহারা করিতে পারে নাই। আর এই যে অন্তরের চন্দ্রোদয় ইহাকে যে সে সহ্য করিতে পারিতেছে না; দেখিতে দেখিতে সেই তীব্র দুঃখের মত সুখে তাহাকে যে জ্ঞানহারা স্মৃতিহারা করিয়া ফেলিতেছে। সেই জ্ঞানহারা অবস্থায় তাহার যে কতক্ষণ যাইতেছে, তাহা সে জানে না, যখন স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে, তখন চাহিয়া দেখিতেছে, দিনের আলোক রাত্রের আঁধারে ঢাকিয়া গিয়াছে। পিতা চিন্তিত মুখে মাথায় হাত দিয়া সম্মুখে বসিয়া আছেন, বিজলী সজল চক্ষে মুখে তরল পথ্য ধরিতেছে। শরীর একান্ত দুর্ব্বল—যেন চোখ মেলিবারও সামর্থ্য নাই, চাহিতে ইচ্ছাও করে না; কিন্তু এতক্ষণ সে নিজে কোথায় ছিল, কি করিতেছিল! বিজলীর পুনঃ পুনঃ আহার করাইবার আগ্রহে বিরক্ত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র মনে পড়িতেছে শিশিরকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের তীব্র বিকাশের মত করিয়াই মনে আসিতেছে, তাহার কেহ নাই—কেহ তাহার কাছে নাই! উঃ, এ কি অসহ্য অনুভব! ইহা অপেক্ষা সে জ্ঞানহারা হইয়া যে ভাল ছিল! কিন্তু তাহার কাছে কি কেহ ছিল না? কেহ কি তাহার নাই সত্যই? 'না-না, সেই যে—সেই যে—(শ্যামলীর হাতটা সেই ছবিখানার জন্য একবার পার্শ্বে সঞ্চালিত হইল, হাতে কিছু পাইল কি না সে বিষয়ে তাহার লক্ষ্য আসিল না, মন নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল) আলো আলো! সেই আলোর ঠিক মধ্যখানে কে সে—সে কে? চক্ষে তাহার ও কি অপূর্ব্ব আলো! সে আলোয় কত কি—কত কি, কত সুখ, কত দুঃখ,

কত মমতা, আরও কত যাহা মনের ভাষায়ও ফুটে না। সেই অব্যক্ত ভাবের ভাষাভরা দৃষ্টি সে যে শ্যামলীর মুখের উপরেই স্থাপিত—সে যে শ্যামলীকেই চাহিতেছে—শ্যামলীকেই নিকটে টানিতেছে। এই তো সে শ্যামলীর অতি নিকটে—অতি কাছে—এইতো আরও—আরও—

ভাষাহীন অব্যক্ত একটা শব্দ করিয়া শ্যামলী আবার জ্ঞান হারাইল। অন্তরের প্রবল উচ্ছ্বাসের বাষ্প কণ্ঠনালীর দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া মাঝে মাঝে এখন এমনি করিয়া বাহির হইয়া যাইত।

সেবার দীর্ঘ দুই দিন পরে শ্যামলীর জ্ঞান হইয়াছে। মৃতের মত নির্জীব হইয়াই সে পড়িয়া আছে। ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনার শক্তিও নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। দীর্ঘকাল এইরূপ অজ্ঞান হইয়া থাকার দরুন দেহের ও মনের ক্রিয়াশক্তি ক্রমেই নিস্তেজ ও শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মৃতের মত নিষ্প্রভ চক্ষু ও ক্ষীণ দেহের অবস্থায় সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল যে আর বেশী দিন সে বাঁচিবে না। এমনি দিনে স্বজনের সযত্ন শুশ্রূষায় যখন সে একটু সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তখন এক সময় হঠাৎ তাহার মনে হইল, একজন অপরিচিত লোক যেন তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে! প্রথমে সে সেদিকে লক্ষ্য করিল না, কিন্তু তাহার কাছে শ্যামলী যাহা পাইতেছিল, তাহাতে তাহার অর্দ্ধ-সচেতন মন তাহাকে একটু জানিবার জন্য হঠাৎ যেন উৎসুক হইয়াই উঠিল। এতদিন তাহার পিতা ভগ্নী তাহাকে যত্ন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা কি এমনি? না, এত তো নয়, এমনও নয়!

কে এ? দেখিতে সুদর্শন নয়। দৃষ্টিসর্ব্বস্ব শ্যামলীর তো এরূপ লোকের দিকে বেশীক্ষণ চাহিতে ভাল লাগে না, চাহিতে ইচ্ছাও করে না। কিন্তু ঐ ব্রণাঙ্কিত মুখের এমনই কি একটা মমতার ভঙ্গী—সমবেদনার ভাব, যাহার দিকে লক্ষ্য হইলে আর মুখ ফিরাইবার উপায় নাই। কি ব্যথার সঙ্গেই সে শ্যামলীর মুখের উপরের রুক্ষ চুলগুলা সরাইয়া দিতেছে, নিঃশব্দে শত পরিচর্য্যা করি-

তেছে। কে এ? ঠিক যেন তার মায়েরই মত! কতকাল যে শ্যামলী তার মাকে হারাইয়াছে! তাঁহার এই স্নেহস্পর্শ হারাইয়াই বুঝি তাহার চিত্ত দিন দিন এমন হইয়া উঠিতেছিল। এতদিনে তাঁর সে স্পর্শ ও ভঙ্গী লইয়া অপরিচিত এ কে আসিল? হোক সে অপরিচিত, তবু এ স্পর্শ যে তার অপরিচয়ের নয়। জন্ম-কাল হইতে এই স্পর্শতেই যে শ্যামলী বাঁচিয়া আছে, মাঝে হারাইয়াছিল, কিন্তু কল্পনার সে অশান্ত উত্তেজনা এই অতি দুর্ব্বল দেহে ক্ষীণ মস্তিষ্কে আর যেন শ্যামলী সহ্য করিতে পারিতেছে না! কল্পনার উদ্দাম ক্রীড়ার হাত এড়াইয়া শ্যামলী যদি এখন এই রকম একটু স্নেহস্পর্শময় ক্রোড়ের মধ্যে আশ্রয় পায়, তবে বুঝি বাঁচিয়া যায়! সে চিন্তা আর না—আর না, আর যেন তাহার মাথায় তাহা না আসে!

শ্যামলীর গড়াইয়া পড়া মাথাটা সযত্নে উপাধানে তুলিয়া দিতেই এবার শ্যামলী একেবারে তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া মুখের দিকে চাহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন তাহাকে একযোগে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কে তুমি, ওগো কে তুমি?" শ্যামলীর মৃতবৎ নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সহসা এই উত্তেজনার আবির্ভাব দেখিয়া শঙ্কিত মুখে অনিল তাহার মুখের পানে চাহিল। আর শ্যামলীও দেখিল, কে সে—সে কে? সেই চোখ—সেই! যে তারকা চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যস্থ হইয়া তাহার অন্তরে নিত্য আসিয়া দাঁড়ায়—এই দৃষ্টিই তো তাহার চোখে! এইই যে সেই —সেই—সেই আবার—আবার!

দুই হাতে সজোরে অনিলের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া তেমনি একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া শ্যামলী জ্ঞান হারাইল। অনিল নিঃশব্দে পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই শ্যামলীর জ্ঞান ফিরিল। আবার তাহার অপলক দৃষ্টি অনিলের চক্ষের পানে স্থাপিত হইতেই অনিল মুখ ফিরাইল, বুঝিল যে অর্দ্ধোন্মাদ ক্রমে তাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছে এবং সে পরিচয় বুঝি তাহার এ

অবস্থায় সহ্যও হইতেছে না। অনিল চোখ নামাইয়া মুখ ফিরাইতেই শ্যামলী যেন কি এক মন্ত্রে সহসা সজাগ হইয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিল। মৃতবৎ সে নিশ্চেষ্টতা অতিক্রম করিয়া তাহার বিবর্ণ মুখে জীবনের রক্তরাগ পিচ্‌কারী করিয়া কে যেন ছিটাইয়া দিল। জোরের সঙ্গে অনিলের দিকে ফিরিয়া দুই হাতে তাহার হাত ধরিয়া টানিল—অব্যক্ত ভাষায় যেন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "ফেরো আমার দিকে, দেখতে দাও আমায় কে তুমি—ফেরো!"

অনিল ফিরিয়া বসিল, কিন্তু চোখ তুলিতে পারিতেছিল না। উন্মাদিনী তখন খানিকটা উঁচু হইয়া দুই হাতে অনিলের মুখ ধরিল, নিজের দিকে চোখ না তুলাইয়া সে ছাড়িবে না—আবার সে দেখিবে!

শ্যামলীকে ধরিয়া ফেলিয়া অতি যত্নের সহিত অনিল আবার শয্যায় শোওয়াইতে গেল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শ্যামলী একেবারে তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া পড়িল, ছাড়াইয়া শোওয়াইবার উপায় নাই। তখন অগত্যা অনিল আরও একটু তাহাকে টানিয়া লইয়া নিজের ক্রোড়ে বা বক্ষের উপরে মাথাটা রাখিল, শান্ত করিবার জন্য মুখে ও মাথায় হাত বুলাইতে গিয়া দেখিল, শ্যামলীর সে বিস্ফারিত চক্ষু বুজিয়া গিয়াছে—আবার বুঝি সে অজ্ঞান! কিন্তু আর তাহার সে দেহ বেশী নাড়ানাড়ি করিতে অনিল সাহস করিল না। সেই ভাবেই নিজের বুকের উপরেই তাহার মাথাটা রাখিয়া নানা উপায়ে তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অনিল বুঝিয়াছে, শ্যামলীর ব্যারাম অন্য কিছুই নহে, কেবল অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনাই তাহাকে এরূপ অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং তাহারই ফলে এ ক্ষীণতা।

কিছুক্ষণ পরে অনিল শ্যামলীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল—সে চোখ খুলিয়াছে। জ্ঞান হইয়াছে কি না বলা যায় না—কিন্তু যে অপলক দৃষ্টিতে সে অনিলের মুখের পানে চাহিয়া আছে, তাহার যে একটা ভাষা আছে, সে ভাষা যেমন শ্যামলীর পক্ষে অনুচ্চরণীয়—অনিলের পক্ষেও তেমনি অসহ্য। সেই

শীর্ণ পাণ্ডু মুখের উপর জ্বলন্ত তুই চোখ যেন বলিতেছে—"এসেছ ? এতদিন পরে এমনি ক'রে আমায় তবে মনে পড়েছে ?"

অনিলও স্তব্ধ হইয়া শ্যামলীর সেই চোখের ভাষা পাঠ করিতেছিল, সহসা এক ঝলক অশ্রু শ্যামলীর সেই মৃতবৎ মুখের উপর—সেই চোখের উপর পড়িয়া গেল। চকিতে শ্যামলী অমনি একেবারে অনিলের মুখের উপর, সমস্ত দেহের উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল ও তেমনি একটা শব্দ করিয়া আবার নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে বিজলী পথ্য লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, শ্যামলী অনিলের ক্রোড়ের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। অনিল তাহার ধূলিধূসরিত মাথার চুলগুলা চিরিয়া চিরিয়া দিতেছে। শ্যামলীর মুদিত চক্ষে ধারার উপর ধারা বহিয়া চলিয়াছে, অনিলের মুখচক্ষুও রোদন-রত, অথচ শান্ত স্তব্ধ। শ্যামলী একেবারে যেন বিবশা—বিকলা।

বিজলী এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে সহসা যেন নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া অনিল একটু সংযত হইয়া চাহিতেই বিজলী পথ্যের বাটি নামাইয়া রাখিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "চিনতে পেরেছে কি ?"

অনিল জড়িতকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ।"

"একবার বাবাকে ডাকি ?"

"একটু পরে।"

রেবা ডাকিল, "মা!"

অনিলের মাতা ত্বরিত হস্তে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন, মুখ না ফিরাইয়াই গাঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "কেন মা?"

"এমন ক'রে তো তুমি থাকতে পাবে না।"

"আমি তো কিছু করিনি রেবা।"

"কেন তুমি ওঁদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকছ, কেন তুমি—"

কথা খুঁজিয়া না পাইয়া থামিয়া পড়িল। মাতা আর একবার ভাল করিয়া মুখ চোখ মুছিয়া ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, "পালিয়ে আর কোথায় যাব, ঘরেই তো আছি।"

"না মা, এমন ক'রে থাকলে চলবে না।"

"কি করতে বলিস্ আমায় আর তুই?"

আবার কথা হারাইয়া রেবা নীরব হইয়া গেল। এইবার অনিলের মা তার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহাকে দুইহাতে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ফুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রেবা আর তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না, তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দিয়া নিস্পন্দভাবে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। এমনি একটি প্রকাশমান বেদনাময় রোদনই যেন তাহার অন্তর কয়দিন হইতে চাহিতেছিল। আজ মাতার এ ব্যক্ত উচ্ছ্বাসে তাহারই অন্তর যেন প্রথমে আশ্রয় পাইয়া ক্রমশ লঘু হইতে লাগিল।

একটু পরে রেবা উঠিয়া পড়িয়া মাতার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দিতে দিতে

বলিল, "ঐ দিকে চল, রাতদিন ঘরে থাকতে পাবে না তুমি।"

রেবা এতদিন তাঁহাকে 'আপনি' বলিয়াই কথা কহিত, আজ কখন্ যে তাঁহার এত বেশী আপনার হইয়া পড়িয়াছে, তাহা উভয়ের মধ্যে কাহারই লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না।

তথাপি মাতা উঠিবার চেষ্টা করেন না দেখিয়া আবার রেবা বলিল, "কি ভাববেন উনি এতে ভাব দেখি! বৌ আনবার অনুমতি তুমিই তো দিয়েছিলে, তবে আবার কেন এমন করছ?"

"ওরে, যখন তা দিয়েছিলাম, তখন কেন অনিল আনলে না? এখন এমনি ক'রে আকাশের চাঁদ হাতে দিতে দিতে তা আবার কেড়ে নিয়ে অনিল যে কাজ করলে, এ যে আমি সহ্য করতে পারছি না।"

"ঠিক কাজই তো করেছেন মা। তখন যদি বৌ আসত, তাহলে কি আর—শ্যামলী যে তখন ওঁকে চিনতে পারত না, আর এখন দেখছ তো মা? আর কি ওকে না এনে তেমনি ক'রে ফেলে রাখতে পারেন?"

"আমি তার কিছুই দেখিনি রেবা, আমার চাঁদের পাশে সে?"

রেবা চমকিয়া তাঁহার মুখে হাত দিয়া নিবারণ করিল, "ছিঃ মা, ও কথা বলো না, শুনলে ব্যথা পাবেন, জান তো। শ্যামলীকে যদি ছাখো, তোমার নিশ্চয়ই মায়া করবে মা! কি রকম বিবর্ণ মুখ, রোগা শরীর, আর তার মধ্যে চোখদুটোই কেবল জ্বল্‌জ্বল্ করছে। আর—"

মা বাধা দিলেন—"থাক্ রেবা, অন্য কোনো কথা ক'।"

রেবা বাধা মানিল না, "দিনরাত কি ভাবে কাটাচ্ছে জান? কেবলই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে আর মুখের পানে এমন ক'রে চেয়ে আছে যে দেখলে—"

রেবা থামিয়া গেল। মাতা বলিয়া উঠিলেন, "রাহু রাহু, আমার চাঁদের জন্যে সে কাল-রাহু কোথায় ছিল?"

"না মা, বলো না ওকথা। তার চোখের সে চেয়ে থাকা দেখলে প্রাণের মধ্যে কি রকম যে ক'রে ওঠে! দ্যাখো যদি তুমি—"

"আমি দেখব না—কখনই দেখব না। চল্ রেবা, আমরা কাশী চ'লে যাই—হরিদ্বার যাই তোকে নিয়ে। অনিলের এ সংসার করায় আমি আর বাধাও দেব না, কিন্তু চক্ষেও দেখতে পারব না। তোকে বুকে ক'রে নিয়ে চল্ মা আমরা চলে যাই।"

"ছিঃ মা! কি বলছ? শুন্‌লে উনি কি ভাববেন! ওঁর সুখ শান্তি কর্ত্তব্যের দিকে না চেয়ে আমরা নিজেদের—ছিঃ ছিঃ মা, আর এ কথা বলো না!"

মাতা মুখ তুলিয়া অপলক দৃষ্টিতে একবার রেবার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পরে সহসা তাহাকে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "যেই যা বলুক ভাবুক, তবু আমি তোকে ওদের পাশে এমন সন্ন্যাসিনীর মত, কাঙালীর মত ঘুরতে দিতে পারব না। তুই যে দিনরাত ওদের—ঐ পাষাণ নিষ্ঠুর অনিলের আর তার সাধের বৌ-এর হেসে হেসে সেবা ক'রে বেড়াবি, এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না! আমার বুক তাতে ফেটে যাবে। আমি যে তোকে আমার সর্ব্বেশ্বরী করবার জন্যেই এনেছিলাম। তার বদলে কি না দাসীর মত—ওরে সে আমি কিছুতেই দেখতে পারব না। চল্, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।"

রেবা কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "পারবে মা ওঁকে—তোমার ছেলেকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে?"

"পারব। তোর জন্যে সবই পারব আমি।"

'মা!' রেবা এইবার ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। মাতৃপিতৃ-হীনা অনাথা সে, এই বিভবশালা গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং পুত্রগতপ্রাণা এই মাতার হৃদয় যে কতখানি অধিকার করিয়াছে, তাহা মনপ্রাণ দিয়া কিছুক্ষণ যেন অনুভব করিয়া দেখিল। শেষে কিছুক্ষণ ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে

বলিল, "কিন্তু আমি যে পারব না মা!"

"কি পারবি না? যেতে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন পারবি না?"

রেবা নিঃশব্দে রহিল।

মাতা এইবার যেন একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, "আমি পারব আর তুই পারবি না? এতদিনেও কি জানতে পারিস্ নি যে অনিল আমার কি!"

রেবা এইবার সচকিতে উঠিয়া বসিয়া ত্রস্তস্বরে বলিল, "সে কথা না মা, তুমি আর একটা দিক দেখছ না! তোমার যাওয়া আর আমার চ'লে যাওয়া কি একই কথা? তোমার পায়ে পড়ি মা, আমায় সে লজ্জায় ফেলো না। আমিই ওঁকে বৌকে আনতে বলেছি, উনি এতে কি ভাববেন? আমায় থাক্‌তে দাও মা ওদের কাছে।"

মাতা রেবার পানে ক্ষণিক নিশ্চল ভাবে চাহিয়া বলিলেন "জানি, তা তুই পারবি, কিন্তু আমি যে তোর এ ভাবে বেড়ানো সহ্য করতে পারব না রেবা।"

"আমার জন্যেই পারতে হবে মা তোমায়। আমায় আজ যদি তোমার ছেলের সুখশান্তির চেয়ে বড় করলে, তাহ'লে সেই অধিকারে বলছি মা, আমার এ লজ্জা তোমায় রাখতেই হবে। দেখো, আমি বেশ থাকব। শ্যামলী তো কিছুই জানে না, তাকে আমি হাতে ধ'রে সব শেখাব। ওঁর যত্ন করা, দেখাশোনা সবই শেখাব তাকে! আর উনি তো অনেক চেষ্টাই করবেন।"

"বেশ! তবে তোরা এই-ই কর! তোরাই যদি এতে সুখ পাস্, তবে কেন আমি আর—"

শুধু সুখ নয়, ওঁর কর্ত্তব্য উনি পালন করবেন, তাতে আমরা কাতর হচ্ছি, এত হীন আমরা ওঁর কাছে কেন হব মা? নিজে তো একবার আনতে অনুমতিও দিয়েছিলে, আজ আমার জন্যে তুমিও এত অসহিষ্ণু ওঁর কাছে

হতে পাবে না।"

মাতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "বেশ, তবে তোর ভাগ্যে যা আছে, তুই কর্।"

"হাঁা, আর তোমার কোলে শুযে থাকি ; এ জায়গা তো আমার কেউ—"

রেবা আবার তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। মাতা নিঃশব্দে বিশৃঙ্খল চুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজলে চুলগুলা ভিজিয়া যাইতেছে, বুঝিয়াও রেবা তেমনি পড়িয়া রহিল।

'মা!' রেবা চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সম্মুখে অনিল, পশ্চাতে শ্যামলী। অপ্রস্তুত ভাবে রেবা একেবারে উঠিয়া অন্যদিকে সরিয়া দাঁড়াইল, মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। অনিল মাতার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, 'মা!'

মাতাও একটু যেন অপরাধীভাবে মুখ নামাইয়াছিলেন। রোদনরত চোখ দু'টা তিনি অনিলের সামনে তুলিতে পারিতেছিলেন না। গাঢ়স্বরে কেবল উত্তর দিলেন, "কেন?"

"মা, আমায় কি আর দেখবে না? কি অপরাধ করলাম আমি আবার তোমার কাছে?"

পুত্রের স্বরে মাতা আর তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। কি উদ্বিগ্নকাতর মুখ! ছিঃ, তিনি কি করিতেছেন! ছেলেকে কেন এত ব্যথা দিতেছেন? মুখে বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল তাহাকে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইলেন। অনিল নিঃশব্দে সেই অনুতপ্ত স্নেহ ক্ষণেক ভোগ করিল তার পরে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা, আর একটা হতভাগ্য প্রাণী, যে জগতের অর্দ্ধেক সুখে বঞ্চিত, তাকেও তোমার এই কোলে একটু জায়গা দাও। আমার মার কোলে সেও যেন বঞ্চিত না হয়!

অনিলের কথার সঙ্গে সঙ্গে মাতাও চমকিয়া যেন বেত্রাহত হইয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই কোল—যাহার উপরে শুইয়া এখনি রেবা বলিতেছিল, এ জায়গা তো কেহ তাহার কাড়িয়া লইতে পারিবে না, আর এখনি কি না সেই রেবাকেই, যে তাহার জীবনের সার্থকতা হইতে বঞ্চিত করিল, তাহাকেই সেই ক্রোড়ে স্থান দিতে অনুরোধ করিতেছে? না না, তাহা তিনি কিছুতেই পারিবেন না। অনিলের শত মিনতিতেও না। কিন্তু এ কি? কে এমন করিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িল? কে এ? কি বিশীর্ণ মুখ! তার মাঝখানে দুইটা সজল উজ্জল চক্ষু, যাহা হইতে আর্ত্ত করুণা ভিক্ষার ভাষা—যেন অতি সুস্পষ্টভাবে বলিতেছে, "ওগো দয়া কর, আমায় দয়া কর। আশ্রয় দাও, তুমি আশ্রয় না দিলে বুঝি আশ্রয় পাব না।" এই কি অনিলের বৌ? কে বলে এ বোবা কালা? বোবায় কি এমন করিয়া চাহিতে জানে—না কালাবোবার চোখে মুখে এমনি করিয়া ভাষা ফুটে—যাহা উচ্চারণের অপেক্ষাও জলন্ত? বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া অনিলের মা শ্যামলীর পানে চাহিয়া রহিলেন। শ্যামলী তাঁহার মুখের পানে—তাহার সে দৃষ্টিকে মেলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাঁহার কোন ভাবান্তর না দেখিয়া, আবার দুই পায়ের উপর মুখখানা গুঁজড়াইয়া অব্যক্ত ভাষায় যেন দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ।ক নিবেদন করিতে লাগিল। তাহার এই আকুলিব্যাকুলি দেখিয়া অনিলের মাতা দ্বিগুণ স্তব্ধ হইয়া যাইতে-ছিলেন। শেষে একটু অধীর হইয়া অনিলকে বলিলেন, "ওকে তোল্ অনিল, কেন ও অমন করছে? তুই যখন এনেছিস্, তখন কি ওকে কেউ ফেলে দেবে?"

"তুমি না আশ্রয় দিলে সে আনা যে মিথ্যেই হবে মা!"

"তোল্ ওকে, কেন আর আমায় বিব্রত করিস্ বাপু? বুঝিয়ে বল্ ওকে।"

"মা, আমি তো ওকে শিখাইনি কিছুই, এই দু-দিনে তা কি পারা যায়? ও বুঝতে পেরেছে যে, এখানে জায়গা পেতে হ'লে তোমার পায়ের তলায়

আগে আশ্রয় পাওয়া চাই। মা, ওকে আমরা যতটা হীন ভেবেছি, ও ততটা নয়। বুঝতে চাও যদি, ক্রমে বুঝতে পারবে।”

“কেন অমন করছ, ওঠো বাছা, তোমার কি অপরাধ, সবই আমার আর তোমার মা-বাপের কর্ম্মফল! মা মাগী মরেছে না বেঁচেছে, আমারই মরণ নেই। ওঠো ওঠো।”

মাতা নত হইয়া বধূর হস্ত স্পর্শ করিতেই বধূ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। আবার সে দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার মন আরও কোমল হইয়া গেল।

“রেবা!” রেবা এইবার এক পাশ হইতে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অনিল ধীরে ধীরে মাথা নত করিল। মাতা বধূর দিকে ইঙ্গিত করিয়া রেবাকে বলিলেন, “ওকে আমার ঘরে নিয়ে চল্। কাপড় বড় ময়লা, চুলও বাঁধা নেই কতকাল! সে অসুখটা আছে নাকি এখনো?”

অনিল মৃদুস্বরে বলিল, “না।”

রেবা অগ্রসর হইয়া শ্যামলীর হাত ধরিতে গেল, কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সেই মূকবধির প্রাণী যেন কি একটা ভাবে অনিল ও তাহাকে কেবলই নিরীক্ষণ করিতেছে। অনিলের সঙ্গে রেবার ইতিমধ্যে দু-তিনবার অনিচ্ছার মধ্যেও চোখাচোখি হইয়া গিয়াছিল; উভযেই তাহাতে পুনঃপুনঃই দৃষ্টি নত করিতেছিল। অনিলেব মুখটা যেন হঠাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, রেবার ও তাহার বর্ণব্যত্যয় লক্ষ্য করিবার অবকাশ তখন কাহারো নাই, সকলেই নিজেকে লইয়াই বিব্রত। কিন্তু সেই অর্দ্ধোন্মাদ প্রাণীটি, জগতের ভাষার সহিত যাহার কোনই সম্পর্ক নাই, কেবল ভাব লইয়াই যাহার কারবার, প্রকৃতির বর্ণ বৈলক্ষণ্যেই যে তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুভব করে, সেই-ই কেমন এক রকম ভাবে যেন রেবাকে কেবলই দেখিতেছে। রেবা তাহার হাত ধরিতে গেল, সে হাত টানিয়া লইল।

মাতাকে প্রসন্ন হইতে দেখিয়া অনিল অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে একদিকে

চলিয়া গেল। কক্ষান্তরে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, শ্যামলী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। যে কয়দিন হইতে শ্যামলী অনিলকে পাইয়াছে, এমনি করিয়া দিবারাত্রি অশ্রান্ত অতন্দ্র হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং মাঝে মাঝে এমনি নির্নিমেষ ভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেছে যে, অনিলকে ব্যস্ত হইতে হইতেছে, পাছে আবার তাহার সেই অসুখ আরম্ভ হয়। ক্রমে অনিল শ্যামলীর অসুখটা যে কি তাহাও বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু হায় হতভাগী, অত্যন্ত দেরীতে যে! জাগিলিই যদি, আর কিছুদিন পূর্ব্বে কেন জাগিলি না!

যাক্, তবু যাহা করিবার, তাহা করিতেই হইবে। তাহাতে যাহাই হউক। শ্যামলী মায়ের কাছ হইতে ছুটিয়া পলাইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনিল তাহাকে সস্নেহ তিরস্কারের ভাবে নিকটে টানিয়া লইয়া সেটুকু বুঝাইতে গেল, কিন্তু তাহাকে স্পর্শমাত্রই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, শ্যামলী যেন সেই প্রথম পরিচয়ের শ্যামলীর মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেমন এক রকম দৃষ্টি, মুখের ও সারা অঙ্গের বিদ্রোহসূচক ভাব! সহসা শ্যামলীর এমন হইল কেন? কোন কারণে হয়ত তাহার মন অশান্ত হইয়াছে ভাবিয়া অনিল নিঃশব্দে তাহার মস্তকটি স্কন্ধের উপর পাতিয়া লইল এবং ধীরে ধীরে পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্রমে শ্যামলীর কঠিন শরীর কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সে স্বামীর অঙ্গে যেন লতাইয়া পড়িল। শেষে গোটাকতক অশ্রুর ফোঁটাও অনিলের বুকের উপর পড়িল। বোধ হয় কোন দুঃখ তাহার মনে উদয় হইয়াছে ভাবিয়া অনিল নীরবে তাহার মস্তকটি বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। পাগলিনী অসীম সুখে তখন ঘুমাইয়া পড়িল।

ওদিকে বধূ ছেলের পিছনে ছুটিয়া চলিয়া যাওয়াতে অনিলের মা প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেন। যার এখনি এমন কাতর ভিক্ষুক ভাব হইয়াছিল, এখনি সে এমন চঞ্চল কিসে হইল? মনে করিলেন, ওদের পক্ষে এই বোধ

হয় স্বাভাবিক! কোন ভাবকে বেশীক্ষণ তো ধারণা করিবার শক্তি নাই। একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পাগলও বোধ হচ্ছে না?"

রেবা নতমস্তকে মাথা নাড়িল।

"নয়? তবে কেন ছুটে পালাল?"

"বলেছি তো! একদণ্ডও একা থাকতে পারে না; কেবলই সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।"

"তাই?" তারপরে সনিশ্বাসে বলিলেন, "আমাদের ভাগ্য যেমন এ বিষয়ে মন্দ, হতভাগীটার কিন্তু তেমনি তপস্যা বলতে হবে। এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পায়?"

রেবা নীরবে রহিল।

"যাক্, যতদিন না নিজে ও আমাদের কাছে আসে, ততদিন অনিল বললেও ওকে বেশী টানাটানি করা ঠিক হবে না। তুমি এখন আমার কাছেই থেকো রেবা।"

২৩

অনিল শ্যামলীর শিক্ষকতায় মন দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মূকবধিরকে কি প্রকারে ভাষা ও লেখাপড়া শিখাইতে হয়, তাহা সে মাঝে মাঝে মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিয়া লইতে চেষ্টা পাইত, কিন্তু শ্যামলীরই বাধায় সে চেষ্টা তেমন অগ্রসর হইতেছিল না। মাসেক সময় বহিয়া গেল, তবুও শ্যামলী শান্ত হইল না। অনিলকে পাওয়ার সুখেই সে অশান্ত চঞ্চল হইয়া রহিল। এক

মুহূর্ত্তও সে অনিলকে কোথাও যাইতে দিবে না, অন্য কোন দিকে মন দিতে দিবে না। খাইবার স্নান করিবার সময়ও সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে চাহিত। না পাইলে কাঁদিতে বসিত, অশান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ফিরিত, শেষে অনিলকে দেখিতে পাইলে এমনি করিয়া নিকটে যাইত যে, অনিল তাহার এ ভাবে ঈষৎমাত্রও বিরক্ত হইতে পারিত না! শ্যামলীর মুখে, চোখে ও শরীরে তাহার গত দিনের না পাওয়ার,—বঞ্চিতের বেদনা, ব্যাকুলতা, এমনি করিয়াই ছাপ দিয়া গিয়াছিল। এখনো সে সুস্থ সবল হইতে পারে নাই, কিন্তু অনিল ছাড়া কাহারও যত্ন সে লইতে চাহিত না। করিবেই বা কে? অনিলের মাতা সহসা সলিলের বিবাহের উদ্যোগে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়াছেন, রেবাকেও তাঁহার কাছেকাছেই থাকিতে হয়। অনিল কি নিজের বিষয়ে, কি শ্যামলীর সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সাহায্য না পাইয়া বিব্রত ও শরীরে মনে ক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বুঝিতেছিল যে, তাঁহাদের এ বিষয়ে অপরাধ নাই। শ্যামলী এমন ফাঁক দেয় না, যখন তাঁহারা আসিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। স্নান-আহারের সময় অনিল তাঁহাদের অলক্ষ্য হস্তের আভাস পাইয়া বুঝিতেছে, তাঁহাদের অনিলের উপর মনোযোগ সমানই আছে, কেবল সে যে কর্ত্তব্যভার মাথায় লইয়াছে, তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহারা অনিলকে এমন বিপুল অবকাশ দিতেছেন।

কিন্তু এ অবকাশও যে অনিল ক্রমে আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যাহার জন্য তাহারা সকলে এমন দূরে গিয়াছে, সে কাজেরও তো এমন কিছু হইতেছিল না। শ্যামলীকে লইয়া সে ব্যবহারিক জগতের অক্ষর পরিচয় করাইতে বসে, মুখের শব্দহীন উচ্চারণভঙ্গীর সহিত বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া শ্যামলীর জড় জিহ্বাকে শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোথায় বা শ্যামলীর শিখিবার সে মন, আর কোথায় বা বুঝি অনিলেরও মন! ইচ্ছা ও মনের এই দ্বন্দ্বে প্রথমটা ইচ্ছাই জিতিতে থাকে। শেষে ক্রমে ক্রমে তাহাকে অসতর্ক করিয়া মন কখন নিজের সিংহাসনখানা দখল করিয়া লয়, অনিল তাহা জানিতেও

পারে না। সহসা এক সময়ে সচকিত হইয়া উঠিয়া দেখে, শ্যামলী তাহার কোলে বা বুকে মাথা দিয়া স্বামীকে আদর করিয়া শেষে এক সময়ে দুই চোখে জল ভরিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে! অনিল যে অন্যমনা, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে এবং অনাদরে সে ব্যথা পাইতেছে। তাহার সেই ভাষাহীন আয়ত-চক্ষু যেন বলিতেছে, "ওগো তোমার দয়া কি এইবার শেষ হইয়া আসিল? কিন্তু আমার যে এখনো দেখার তৃষ্ণাই মেটে নাই! তোমাকে পাওয়ার সুখই যে এখনো আমি সহ্য করিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু তুমি কোথায়—ওগো কোথায় তুমি?" ব্যথিত অনিল তখন শিশুর মত আদরে ক্রমে তাহার সে ম্লানভাব দূর করিয়া দেয়, সযত্নে তাহার শুশ্রূষা করে। এখনো শ্যামলীর যে অনেক যত্ন করার দরকার, কিন্তু অনিল কি তাহা পারিতেছে? যে পারিত, অনিলের নিজের অজ্ঞাতেই তাহার নাম মনে আসিয়া গেল। সে এখনি হয়ত আসিয়া সব ভার লইতে পারে, কিন্তু এ পাগলিনী একটু প্রকৃতিস্থ না হইলে তো তাহা সম্ভব নয়। তাই-ই সে দূরে দূরে আছে, মাও আড়ালে আছেন। কিন্তু আরও কিছুদিন পরে, যখন শ্যামলীর অনিলের সঙ্গ সহ্য হইয়া আসিবে, ক্রমে যখন সে শান্ত হইবে, তখন রেবা আসিয়া যেমন এতদিন অনিলের সমস্ত বিষয়ের ভার লইয়াছিল, আবারও তাহাই লইবে তো? তেমনি—তেমনি করিয়া? রেবা বোধ হয় তাহা পারিবে। কেননা সে যে এই কথাই বলিয়াছিল! ইহাই চাহিয়াছিল, তথাপি অন্যের ঘরে যাইতে পারিবে না বলিয়াছিল। কিন্তু এখনো কি তার মনের ভাব সেই রকমই আছে? এই অপ্রকৃতিস্থমনা অনিল, যে এমনি করিয়া তাহাকে এই গৃহের সকলের নিকটে কি না লজ্জায়—কি না অপমানেই ফেলিয়াছে, তাহারই গৃহে এখনো এমনি করিয়াই সে কাল কাটাইতে চায়? কেন? কোন্ সুখে? ঐ রূপৈশ্বর্য্যময়ী অতুল্য গুণময়ী রেবা—এই কুৎসিত কুদর্শন অনিলকে যে একদিন কি জন্য—সেই যে অতি আশ্চর্য্যের কথা! কিন্তু ততোধিক আশ্চর্য্য যদি সে এখনো এই রকমেই দিন কাটাইতে চায়। এই মূকবধির উন্মাদের সঙ্গী

—নির্ম্মম নিষ্ঠুর নির্লজ্জ অনিল, যে অনর্থক রেবার এত অপমান করিয়াছে, তাহারই গৃহে তাহারই অলক্ষ্যে সুখস্বাচ্ছন্দের বিধান করিয়া! রেবা—রেবা এ কি রহস্য? কি সে? কেন? কিসের জন্য তুমি এমন করিতেছ? তবে কি—তবুও তুমি—

চমকিয়া উঠিয়া অনিল মনের গতিকে সজোরে রুদ্ধ করিল। রুদ্ধ নিশ্বাসটাকে সবেগে ত্যাগ করিয়া শ্যামলীর দিকে চাহিতেই দেখিল, সে অনিলেরই ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিতেই সে অপরিসীম সুখে হাসিয়া উঠিল।

হায়! এই এক হতভাগ্য জীব! কি দেখিতে সেই বা এমন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে? ইহাকে তো এমন ভাবে অনিল পাইতে চাহে নাই। যখন অনিলের সহিতই বিধাতা তাহার ভাগ্যসূত্র জড়াইয়া দিলেন, তখন তাহাকে মানুষ করিতে, তাহার কিছু অভাব পূরণ করিতে অনিলের আত্মজ্ঞান তাহাকে উপদেশ দিল। তাহার সদয় অন্তকরণও তাহাতে সায় দিল, তাহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাতর হইল। কিন্তু তবু তো অনিল তাহাকে এমন দেখিবার আশা কখনই করে নাই। এও যে অনেকটা অসঙ্গত ব্যাপার। সে ইতিমধ্যে অনিলের মনে কি এমন পাইল? সুরূপ অনিল যাহা পায় নাই, এই কুরূপ অনিল, এই অর্দ্ধমনুষ্য—অর্দ্ধ ইন্দ্রিয়হীনা নারীর নিকট তাহাই বা এত প্রচুর ও অসহ্য ভাবে কিরূপে পাইতেছে? সে যে কল্পনাময় জীবই ছিল এতদিন। সেই কল্পনাতেই নিশ্চয় অনিলকে এমনি করিয়া অন্তরে লইয়াছে যে, তাহার বাহ্যিক ত্রুটি এখন আর শ্যামলীর চক্ষেই পড়ে না। ইহাও অনিল বুঝিতেছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের বা নারীত্বের অন্য কোন কিছু প্রকাশ না হইয়া এই দিকটাই এমন করিয়া ফুটিল যে, আর একটু হইলে তাহার প্রাণই যাইত! হায় অভাগিনী, আর কিছু দিন আগে এর একটুও যদি তোমাতে প্রকাশ পাইত! অনিল যে বহুদিন অপেক্ষা করিয়া ছিল! তৃষ্ণায় বক্ষ শুষ্ক হইয়া উঠিলেও সজোরে সে

এতদিন মনকে স্ববশে রাখিয়াছে। কোনদিকে তাহাকে চাহিতে দেয় নাই, অন্ত কোন কথা ভাবিতে দেয় নাই। ভগবান তাহার স্কন্ধে যে দায়িত্ব চাপাইয়াছেন, কি করিয়া সেই কর্ত্তব্য সে সাধন করিবে, তাহাই সর্ব্বদা ভাবিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তুমিই যে তাহাকে একেবারে না চিনিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অন্য পথে মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিলে। সে যে তাহার পরে গত এই দুই বৎসরের পূর্ব্বেকার কুমার অনিলের মত আশা-তৃষ্ণাভরা হৃদয় লইয়া উপযুক্ত প্রণয়িণী পাইবার জন্ত উন্মুখ হইয়াছিল। রেবার রূপগুণ, রেবার কথা, তাহার হৃদয়ের পরিচয়, নিজে যাচিয়া লইয়া আপনার হৃদয়কে যে অনিল স্বেচ্ছায় তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। তাই যে-রেবার কাছে তাহার জীবন বিক্রীত, তাহাকেও সে সকলের চক্ষে আজ এমন হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে! জানি না রেবা কি মনে করে, কি ভাবে! আর অনিল? অনিলই বা এখন কি করিবে? যাহার অন্তর চির-সংযত, সে যদি একবার তাহাকে অসংযমের পথে চালায়, আর বুঝি তাহার ফিরিবার উপায় থাকে না। বেগশালী নদীর অতি সুদৃঢ় বাঁধও একবার ভাঙিলে আর বুঝি তাহা তেমন ভাবে জোড়ে না।

অনিল সযত্নে শ্যামলীকে উঠিয়া বসাইয়া ইঙ্গিতে বুঝাইল, "চল, বাহিরে যাই।" অনিল উঠিল দেখিয়া অগত্যা শ্যামলীও উঠিল।

সেটা অসময়। মাসাধিক কাল এ সময়ে অনিল গৃহের বাহির হয় নাই। শ্যামলীর প্রতি যথাসাধ্য মনোযোগ এবং নিজের অন্তরস্থ চিন্তার কোটরেই সে এতদিন ডুবিয়া ছিল। আজ দ্বিপ্রহরের সেই সার্ব্বজনিক অবসরের সময় অনিল তাহাদের অন্তঃপুরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, পশ্চাতে অনিচ্ছুক পদে শ্যামলীও তাহার অনুসরণ করিতেছিল।

সম্মুখে তাহার মাতার ভাণ্ডার-ঘর। সেদিকে অনিলের বহুদিনই গতিবিধি নাই। যখন সে মাতার আঁচল ধরিয়া ফিরিত, তখনি কেবল এখানেও তাহার সর্ব্বদা আসা যাওয়া ছিল। ব্যারামের পর শয়ন-কক্ষ হইতে এতটা সিঁড়ি

ডাঙিয়া আসারও তাহার দরকার হইত না, মাতা সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকিতেন। আজ একেবারে অনিল এই দিকেই শ্যামলীকে প্রায় টানিয়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহের মেঝেয় অনেক জিনিসপত্র ছড়ানো, ভাণ্ডার-সজ্জার বোধ হয় কিছু সংস্কার হইতেছে। মাতা কিন্তু সেখানে উপস্থিত নাই, রেবা একমনে মাথা নীচু করিয়া কতকগুলা কি বাছিতেছে। অনিল দ্বারের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই রেবা এতখানি চমকিয়া উঠিল যে অনিল বলিতে বাধ্য হইল, "আমি রেবা!"

রেবা তাহা দেখিয়াছিল, কিন্তু অনিলের এ কথায় কথা কহিবারও প্রয়োজন যে। কিন্তু কোন মতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া রেবা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সে স্তব্ধতা অনিলের শ্বাসরোধের মত ব্যাপারই হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র সেটা সহ্য করিয়া অনিল অন্তরে বাহিরে ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া রেবাকে প্রশ্ন করিল, "মা কোথায়?"

এইবার রেবা কোন রকমে উত্তর দিল, "ও-ঘরে গেছেন।"

অনিল থামিল না, পূর্ব্বের মত সহজভাবে রেবার সঙ্গে কথা কহিবার তাহার নিতান্তই যে প্রয়োজন। আবার বলিল, "তোমরা এ ঘরে কি করছ এখন? চল, মার কাছে যাই।"

"মা এখানেই আসবেন এখনি।"

"রেবা, তোমার সঙ্গেও আমার একটু কথা আছে।"

রেবা একটু স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, "বলুন।"

"এমনি এইখানে দাঁড়িয়েই? তার চেয়ে এদিকে এস না কেন। তুমি কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করছ না রেবা! সেই কথা বলতেই আমি এসেছি।"

রেবা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল। অনিলের পশ্চাতে শ্যামলী অবাক ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া অগত্যা চেষ্টার সহিত উত্তর দিল, "কোন্ প্রতিশ্রুতি?"

'তুমি যে আমায় সাহায্য করবে বলেছিলে ! উত্তর দাও, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না ।"

রেবা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি তো কই ডাকেন নি !" কথাটা যেন ঠোঁট হইতে ঠোঁটেই মিলাইয়া গেল। রেবা আবার অনিলকে আপনি বলিতেছে, অনিল তাহা লক্ষ্য করিল। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া কেবল উত্তর দিল, "হাঁ, ডাকিনি সত্য, কিন্তু মনে করেছিলাম না বলতেই তুমি করবে।"

রেবা উত্তর দিল না। আবার অনিল বলিল, "আচ্ছা, এখন না হয় ডেকেই বলছি, আমায় একটু সাহায্য করো রেবা। তোমাদের সঙ্গে এর পরিচয় না করালে তো আমার কিছুই করা সহজ হবে না।"

রেবা এবার মুখ তুলিয়া স্পষ্টস্বরে বলিল, "কিন্তু সেটা সে যতদিন না অন্তরের সঙ্গে চাইবে, ততদিন কি তা করতে পারা যাবে মনে করেন ?"

"তোমারই একটু অগ্রসর হ'য়ে চেষ্টা করতে হবে রেবা। কেন তা করছ না ? আমি যে তোমার কাছে এই-ই আশা করেছিলাম।"

রেবা অন্তরে অন্তরে লজ্জায় যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। অনিল কি ভাবিতেছে, রেবা শ্যামলীর প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়াই এরূপ ভাবে চলিতেছে ? প্রথম দিনে শ্যামলীর সঙ্গে তাহার কাছাকাছি হওয়ার পরে শ্যামলীর চোখে মুখে হঠাৎ যে একটা পরুষ অসন্তোষের ভাব সে লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহা কি রেবার সন্দেহ মাত্র ? সর্ব্বক্ষণই শ্যামলী অনিলের সঙ্গে ফিরিতেছে বলিয়া মাতা যে আবার তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে নিষেধ ঠেলিয়াও হয়ত সে তাহাদের নিকটে আসিত, কিন্তু হঠাৎ ঐ সন্দেহে আর সে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। অনিল তাহাতে না জানি কিই ভাবিয়াছে ! কুণ্ঠিতা রেবা অনিলের কথার কোন উত্তর না দিয়া শ্যামলীর পানে চাহিয়া দেখিল, একদৃষ্টে সে চাহিয়াই আছে। হাসিয়া রেবা হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। শ্যামলী আসিল না, উপরন্তু অনিলের আর একটু অন্তরালেই দাঁড়াইল। অনিলও হাসিয়া রেবাকে

বলিল, "এটুকুতেই দমে যেও না, একটু চেষ্টা করো, একদিনে না হয় দু-দিনে হবে।"

রেবা এইবার ঘরের বাহিরে আসিয়া শ্যামলীর নিকটে দাঁড়াইল। শ্যামলীর মাথায় হাত দিয়া তাহার আলুথালু বিশৃঙ্খল চুলগুলা নাড়িয়া দিয়া, মলিন বস্ত্রে অসংস্কৃত দেহে হাত দিয়া সেগুলা যে পরিষ্কার করার দরকার, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। শ্যামলী প্রথমে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অসন্তুষ্টভাবে তাহার পানে চাহিতেছিল, শেষে বুঝিয়া নিজেও একটু ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে নিজের পানে চাহিতে লাগিল। রেবা তখন তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে একদিকে আকর্ষণ করিল। শ্যামলী অনিলের পানে চাহিতেই অনিলেরও তাহাতে অনুমোদনসূচক ইঙ্গিত পাইয়া সে অনিচ্ছুক পদে ও ধীরে ধীরে রেবার সঙ্গে তাহার কক্ষের দিকে চলিয়া গেল। অনিলও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আপনার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কাজটা সে ভাল করিল, না মন্দ করিল! ইহা না করিয়া তাহার উপায় কি? ভগবানই তাহাকে এই কার্য্যের ভার যে স্কন্ধে দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, অনিল না গেলে শ্যামলী কি বাঁচিত? সে যে মরিতেই বসিয়াছিল। যাহাকে উন্মত্তভাবে চিন্তা করিয়া এই মূক বালিকা প্রাণ দিতেই বসিয়াছিল, নিজের সুখের জন্য অনিল তাহাকে নিকটে আনিবে না, এমন সে যে চিন্তাতেও আনিতে পারে না। শ্যামলী সম্বন্ধে কর্ত্তব্য তাহার ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু রেবা? তাহার অন্যত্র বিবাহের কথাও যে অনিল মাতাকে বা তাহাকে সাহস করিয়া বলিতেই পারিবে না। ধরো, রেবা যদি তাহাও পারিত, কিন্তু—এ কিন্তুর আর শেষ নাই। অনিল এ বিষয়ে চিন্তাকে আর অগ্রসর হইতে দিল না। অমনি তাহার গতির রাশ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে সে অন্য দিকে ফিরাইল। রেবাকে এই সংসারেরই একজন হইয়া যখন থাকিতেই হইবে (এই থাকিতেই হইবে কথাটা অনিলকে যে কে বলিয়া দিল, তাহা বলা শক্ত)

তখন তাহাকে আত্মীয়ার মত করিয়া শ্যামলীর সহিত পরিচয় করানোও যে দরকার। আর সে অনিলের এত দূরে দূরে থাকিবে? না,—এও যে বড় অসহ্য! সে কেন আগের মতই চলুক না! রেবার কথা? ভাবিয়া তো কোন ফল নাই। কিন্তু এই দূরে দূরে থাকা—ইহা কি রেবাই এমনি ভাবে চাহিতেছে? না, অনিল তাহাও মনে করিতে পারিতেছে না। সে যে অন্যরকমই বলিয়াছিল।

ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে বসন-ভূষণে সজ্জিতা শ্যামলী ছুটিয়া আসিয়া আহ্লাদে প্রায় অনিলের গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার সে হর্ষের উচ্ছ্বাস একটু শান্ত হইলে উঠিয়া বসিয়া রেবা কেমন করিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহা অনিলকে দেখাইয়া, মাথার চুলের গন্ধ, বস্ত্রাদির সৌরভও পুনঃ পুনঃ অনিলের নাসার নিকটে ধরিল। তাহার পরে উঠিয়া গিয়া সম্মুখের আয়নায় নিজের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া অনিলের সম্মুখে একটা আসনে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। নিজের এমন সাজ তো সে কখনো দেখে নাই, তাই তাহার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।

অনিল কিন্তু স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। একটা দারুণ আঘাত সহসা তাহার বক্ষে আসিয়া এমনভাবে বাজিল যে, বহুক্ষণ তাহার যেন জ্ঞানই রহিল না। এ বস্ত্র অলঙ্কার যে সে চিনিতে পারিয়াছে। এ গন্ধ, এ প্রসাধন দ্রব্য যে আর একজনের প্রত্যাশায় এ গৃহে আসিয়াছিল। যাহা রেবার জন্য আসিয়াছিল, তাহাই দিয়া আজ রেবা শ্যামলীকে সাজাইয়া দিয়াছে।

তখনো সূর্য্যোদয় হয় নাই, প্রত্যুষেই অনিল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা, একটু বেড়াইতে বাহির হইবে। আজীবনের এ অভ্যাস সেই ব্যারামের সময় হইতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্যাধিমুক্ত তো সে অনেকদিন হইয়াছে, কিন্তু গৃহের কোটর সেই সময় হইতে যেন নূতন করিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। আজ আবার পূর্ব্বের অভ্যাস ফিরাইয়া লইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠিল বটে, কিন্তু মুখ হাত ধুইবার বা কাপড়-চোপড় পরিবার মত নড়াচড়া তখনো তাহার শরীর চাহিল না ; তখনো তাহার জড়তা ঘুচে নাই। তা ছাড়া তত সকালে চায়ের ব্যবস্থাও তো ইদানীং করা হয় নাই। অগত্যা অনিল একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ঝিমাইতে লাগিল। একবার চাহিয়া দেখিল, শ্যামলীও চোখ মেলিয়া তাহার কাজগুলা দেখিয়া যাইতেছিল, বাহিরে যাইতে উদ্যত অনিলকে আবার বসিয়া পড়িতে দেখিয়া সে আনন্দের হাসি হাসিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে সহসা অনিল চমকিয়া একেবারে উঠিয়াই দাঁড়াইল। জানালার কাছে কি এ? হ্যাঁ, প্রভাতসূর্য্যের রশ্মিচ্ছটার মতই একখানা হাতের লীলায়িত ভঙ্গী, রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া নবোদিত অরুণালোককে গৃহ-মধ্যে বরণ করিয়া আনিল।

গৃহের কৃত্রিম আলোক নিভাইয়া দিয়া আরক্ত রশ্মিচ্ছটায় সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ বায়ুতে ঘর ভরিয়া ফেলিয়া রেবা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। এ আলো যে কিসের—সত্যই কি এখনি সূর্য্যোদয় হইয়াছে, না অন্য কিছুর দীপ্তি, ঠিক করিতে না পারিয়া অনিল মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল, হ্যাঁ, রেবা এমনি করিয়াই আসে বটে। তাহার পদশব্দ তো কর্ণে প্রবেশ করে না।

আলোক-রেখার মত নিঃশব্দ চরণে লঘু ক্ষিপ্রগতিতে তাহার আগমন, অথচ তেমনি করিয়া মুহূর্ত্তে সব জিনিস হাসাইয়া তোলে।

সমস্ত জানালা দরজাগুলা ক্ষিপ্র হস্তে খুলিয়া দিতে দিতে রেবা সহাস্যে বলিল,—সে স্বরও ঐ প্রভাত-প্রফুল্ল পাখীর কাকলি আর পুষ্পসারসুগন্ধি শীতলস্পর্শ বায়ুর সঙ্গেই যেন এক সুরে বাঁধা,—"আমিও আজ বলি—আমি রেবা, অত চমকাবেন না। আলোর সুইচ্ টান্‌লাম, তাও কি শুনতে পেলেন না? আশ্চর্য্য তো!"

অনিল তাহার হাসির উত্তরে কিছুই দিতে পারিল না, নিঃশব্দে চাহিয়া কেবল মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কত দিন কত কাল পরে রেবার এ ঘরে এমনভাবে উদয়!

রেবা দেড়মাস পূর্ব্বের মতই অতি অনায়াসে ক্ষিপ্রহস্তে গৃহসংস্কার করিয়া যাইতে লাগিল। জানালা সার্শি খুলিয়া পর্দ্দাগুলা সুবিন্যস্ত ভাবে টানিয়া কোমল ঝাড়নের সাহায্যে তাহাদের ধূলা দূর করিয়া টেবিলের অল্পস্বল্প জিনিস-গুলা নিমিষে গুছাইয়া শেষে বলিল, "আপনার পড়বার ঘরে যান না, মেঝেটা ঝেড়ে ফেলি, কার্পেটে যে ধূলো জমেছে! ও ঘর এতক্ষণে বেহারা ঝেড়ে ফেলেছে।" সে ঘরের ব্যবস্থা করাও তাহা হইলে রেবার ইতিমধ্যে সারা হইয়াছে, নইলে রামদীনের শুভাগমন হইতে তো বেলা আটটা বাজিয়া যায়। অনিল তথাপি উত্তর দেয় না দেখিয়া রেবা এইবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। কি একটা রহস্যসূচক কথা তাহার মুখে আসিতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহা দমন করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আমি বড় বেশী কথা কই! এ ঘরে বেশী কথা কওয়া ঠিক নয়। আমার এ ঘরে আসার উপযুক্ত হ'তে এখনো দেরী আছে।" সেই সহানুভূতিতে কোমল বিষণ্ণতা, সেও যেন একটা দেখিবার জিনিস। প্রভাত-সূর্য্যে মেঘের ছায়া—সেও যেন অনুপম!

ঝি সম্মার্জ্জনী-হস্তে গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনি এসেছেন

আজ দিদি ?"

"হ্যাঁ, চায়ের সব ঠিক হলো কি না দেখে আয় ।"

"চা কি এখনি হবে ? এত সকালে তো এখন—" বলিতে বলিতে ঝি চলিয়া গেল। রেবা বলিল, "খুব সম্ভব এতক্ষণে চা ঠিক হয়েছে, আর দেরী করবেন না, মুখ ধুতে যান্ ।"

এতক্ষণে অনিল অঙ্গ সঞ্চালন করিল, "এই ঘরেই চা দিতে বলো ।"

ফিরিয়া আসিতে অনিলের অনেকটা দেরী হইল। আসিয়া দেখিল যে, গৃহের মধ্যস্থানে ছোট একটা চায়ের টেবিল ও দু'খানা হাল্কা ছোট চেয়ার পড়িয়াছে। টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জাম ও কিছু লঘু খাদ্য। একখানা চেয়ারে সুসংস্কৃত বেশে শ্যামলী বসিয়া অধীর উৎসুকভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে। অনিলকে দেখিয়াই তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার উৎকণ্ঠার কারণ বুঝিয়া অনিল নিঃশব্দে তাহার মস্তক সাদরে স্পর্শ করিয়া চেয়ার টানিয়া তাহার নিকটেই বসিয়া পড়িল। যে সুনিপুণ সেবা ও যত্নের স্পর্শ হইতে সে আজ কতদিন বঞ্চিত আছে, সেই সেবা-যত্ন আবার আজ সে পাইল বটে, কিন্তু এত দিন যেমন ভাবে ইহা লইতে পারিয়াছে, আজ কি তাহার তেমন ভাবে লইবার অধিকার আছে এবং সাধ্যও আছে ? এ অনিল কি করিল ! না—ইহার চেয়ে রেবা দূরে দূরে ছিল, সেই ভাল ছিল। নিজের জন্য সে রেবার বিষয় কি ভাবিয়া দেখিতেছে না ? ছিঃ ছিঃ, এ অতি অমানুষের কাজ !

অন্যমনা অনিলকে সচকিত করিয়া পশ্চাৎ হইতে কলকণ্ঠে কে বলিল, "চা খান্ না ! অনেকক্ষণ দেওয়া হয়েছে, খারাপ হয়ে যাবে !" অনিল চাহিয়া চাহিয়া চিনিল, ক্ষ্যান্ত ঝির ছেলে বিপিন।

"কি রে, তুই যে ?"

বালক সলজ্জে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "পিসিমা বলেছেন, আমায় এখন

থেকে আপনাকে এই ঘরে চা দেওয়া শিখতে হবে।"

অন্যমনে অনিল বলিল, "সত্যি নাকি? পারবি?"

"ভজহরিদার কাছে দেখেছি তো। পিসিমা বলেছেন, দু'দিন অভ্যাস হলেই পারব।"

অন্যমনেই অনিল বলিয়া ফেলিল, "কই তিনি?"

"পিসিমা? কর্ত্তামাঠাকরুণের পূজার ঘরে গিয়েছেন।"

উভয়ের চা পান শেষ হইলে বালক টি-পটগুলো উঠাইয়া লইয়া গেল এবং সগর্বে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে গেল। এতদিন সে জাহাজের পিছনে ল্যাংবোটের মত মায়ের পশ্চাতে থাকিয়া গৃহস্থের অনাবশ্যক ভারস্বরূপ ছিল, অদ্য তাহার এ পদোন্নতি সকলে যে দেখুক, ইহা তাহার নিতান্তই ইচ্ছা হইতেছিল।

শ্যামলীর মুখখানা ক্রমশই মলিন হইতেছিল। সেদিকে অনিলের দৃষ্টি পড়িবামাত্র অনিল বুঝিল, অনেকক্ষণ যে সে তাহার দিকে আদর করিয়া চাহে নাই—ইহাতে শ্যামলীর ব্যথা বাজিতেছে। তখন আস্তেব্যস্তে অনিল তাহার ত্রুটি সংশোধনের দিকে মনঃসংযোগ করিল। সেদিন শ্যামলীর মুখে হাসি ফুটিতে কিন্তু অনেকটা দেরী হইয়াছিল।

বিকালের খাবারটা অনিল সেদিন মায়ের ঘরে খাইয়া তখনি বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মাতা বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, শ্যামলী উন্মনা ভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া শ্যামলী আজ একটু শান্তনম্র ভাবে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী বুঝিলেন, বধূর এইবার সকলের সঙ্গে মিশিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, স্বভাবেরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি এ বধূর সহিত কোন্ ব্যবহার করিবেন? কি এ বুঝিবে? তাঁহার অনিলের এই বৌ? এতও কি তাঁহার ভাগ্যে ছিল?

দ্বিপ্রহরে আজ তাঁহার বিশ্রাম করা হয় নাই, সেজন্য তিনি বিশ্রামার্থ শয়নকক্ষে চলিলেন, কিন্তু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বধূও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তিনি খাটে শুইয়া পড়িলে বধূ তাঁহার পায়ের দিকে গিয়া বসিল। তিনি অন্য একটা আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু সে সেদিকে না গিয়া বরং তাহার পায়ের দিকেই ঘেঁষিয়া বসিল। রেবা আসিতেই মাতা বলিলেন, "মেঘনাদবধের সেটুকু শেষ কর্‌ত রেবা, কিছু ভাল লাগছে না।"

"বেলা যে নেই মা, এখন পড়তে বসব ?"

"তা হোক্, তুই পড়।"

অগত্যা রেবা খাটের একপাশে তাঁহার নিকটে বসিয়া কাব্যপাঠ আরম্ভ করিল।

কতক্ষণ অতীত হইয়া গেল কেহ জানে না, পাঠিকা এবং শ্রোত্রী তন্ময় হইয়াই পড়িয়াছিলেন। রেবার প্রথমে শ্যামলীর কথা মনে পড়িয়া মায়া করিতেছিল—কষ্টবোধ হইতেছিল, কিন্তু মায়ের আগ্রহাতিশয়ে বেশী কিছু অমতও করিতে পারিল না—শেষে পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সহসা চমকিয়া দেখিল, অনিল গৃহের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; তখন তাহাদের সঙ্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন চলিতেছিল। রেবা পড়িতেছিল—

"বরিষার কালে, সখি প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালি তীর অতিক্রমি
বারি-রাশি দুই পাশে। তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে—"

সহসা অনিলের আগমন দেখিয়া রেবা থামিয়া গেল। অনিল কিছুক্ষণ আগেই আসিয়াছিল, মাতা ও রেবা তাহাকে দেখিতে না পাইলেও শ্যামলী তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে এতক্ষণ একমনে রেবা ও শাশুড়ীর

ভাবভঙ্গী দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, ইহার মধ্যে এমন কিছু একটা চলিতেছে—যাহা তাহার অনুভবের অতীত। কিন্তু হায়, কি সে—সে কি? শ্যামলী কি এ জীবনে তাহা বুঝিতে পারিবে না? কেহ কি তাহাকে বুঝাইয়া দিবে না? ওগো কে কোথায় আছ, একবার শ্যামলীকে বুঝাইয়া দাও—তাহার কিসের এ অভাব? ঐ যে অনুপমা সুন্দরী তরুণী, যাহার দিকে চাহিলে মুগ্ধচক্ষু আর ফিরিতে চাহে না, কিন্তু এই তাহাকে দেখার সুখ ছাড়িয়া ইহারা আরও যেন কি করিতেছে, যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রেবার সেই সুন্দর মুখের উপর নানা ভাবের আভা খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। এই যে স্বামীও আসিয়া মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া—কি যেন করিতে লাগিলেন। রেবাকে দেখিতেছেন বটে, কিন্তু মন যেন তাঁহার রেবার দিকে নাই, যেন অন্য কোন একটা ইন্দ্রিয়ের কি একটা অনুভবে তিনিও বিভোর হইয়া আছেন। সেখানে যে শ্যামলী আছে, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার চোখে পড়িল না—তিনি এতই অন্যমনস্ক। এই সুন্দরী তাহার চোখ-ভুলানো সৌন্দর্য্য ছাড়া আরও কি যে একটা সুখ যেন ইহাদের দিতেছে, যাহার সন্ধান মাত্র শ্যামলী জানে না।

রেবাকে থামিতে দেখিয়া মাতা চাহিয়া দেখিলেন—"অনিল! আয়, বসবি নাকি?" অনিল তখন শ্যামলীকে দেখিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া একটা কষ্ট ছোট্ট একটু কাঁটার মত তাহার মনেও তৎক্ষণাৎ গিয়া বাজিয়াছে; তবুও এই ব্যথাই যে শ্যামলীর জ্ঞান হইবার একমাত্র উপায়, তাহা সে জানে, তাই ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কোথায় বস্‌ব? তোমার চারদিকই যে জোড়া মা!"

"কেন এ পাশে বস্ না।" অনিল বসিলে মাতা বলিলেন, "রেবা কি আর পড়বি না?"

"আজ থাক্"—বলিয়া রেবা উঠিয়া পড়িল। শ্যামলীকে সামনে রাখিয়া নিষ্করুণের মত এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের তৃপ্তিসাধন,—এ যেন তাহাকে অপরাধের মতই বাজিতেছিল। সেই সময়ে অনিলও আসিয়া পড়ায় তাহার

লজ্জার অন্ত রহিল না।

মাতা বলিলেন, "উঠছিস্ কেন, বস্ না।"

"সন্ধ্যা হয় যে—" বলিয়া রেবা চলিয়া গেল।

মাতা বলিলেন, "শরীরটা আজ ভাল নেই, বড় মাথা ধরেছে। এই অসময়েও শুয়ে থাকতে হ'ল দেখছি খানিক। যা, তোরাও একটু বাইরে যা অনিল। বৌমা অনেকক্ষণ ব'সে আছে,—রোগা শরীর।" অনিলও তাহা বুঝিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। জানিত, শ্যামলীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে,—কিন্তু মাতা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, আজ সে গেল না। উপরন্তু তাঁহার পায়ের নিকটে আরও সরিয়া বসিয়া সহসা দুই পায়ে হাত দিয়া তাহার উপরে মাথা রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়ফোঁটা অশ্রুও তাঁহার পায়ে ঝড়িয়া পড়িল। ব্যথা বোধ করিয়া অনিলের মা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার অন্তর তো মমতাশূন্য ছিল না। সাধারণ রমণী অপেক্ষা তিনি অনেকখানি বেশীই কোমলহৃদয়া ছিলেন। হতভাগিনী বধূর এই ভাবে সহসা তাঁহার চিত্ত কেমন করিয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া তাহার মস্তক ধরিয়া উঠাইলেন এবং নিঃশব্দ স্নেহে তাহার মস্তকে মুখে একবার হাত বুলাইয়া দিতেই শ্যামলা আবার তাঁহার পায়ে মুখ লুকাইয়া পড়িল। যেন সে অব্যক্ত রোদনে বলিতেছিল, "ওগো বলো তোমরা, আমি এমন কেন? কেন আমি সকলের মত নই?" গৃহিণী আবার তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া—"অনিল! অনিল!"—বলিয়া ডাকিলেন। উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, সে নিজ-কক্ষে চলিয়া গিয়াছে। তখন নিঃশব্দে শ্যামলীর মাথায় আশীর্ব্বাদের মত করিয়াই হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। বধূর উপর আর তাঁহার বিদ্বেষ মাত্র রহিল না।

অনিল বারান্দার কিছুদূর গিয়া দেখিল, রেবা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া ফিরিতেই অনিল বলিল, "এখানে তুমি? আর একটু তবে কেন পড়লে না? মা শুনতে চাচ্ছিলেন।"

রেবা একবার মাত্র অনিলের মুখের পানে চাহিয়া আবার দৃষ্টি নামাইল —উত্তর দিল না। অনিল ভাবিয়া বলিল, "আমায় এটুকু লজ্জা না করলেই পারো। কেন করো তা ?"

এবার রেবা কথা কহিল, "আপনি কি ঠাট্টা করছেন ?"

"ঠাট্টা ! সে কি রেবা ?"

"সেখানে কে বসেছিল, তা তো দেখেছেন। এমন নির্দ্দয়ের মত কাজ আমি—"

"না রেবা, ঠিক কাজই হয়েছিল। এতে তার পক্ষে ভাল ফলই দেবে। এই সব দেখলেই তার বইয়ের মধ্যে কি ব্যাপার আছে, জানতে ব্যগ্রতা আসবে। তা হ'লেই আমাদের অনেকটা সুবিধা হবে।"

রেবার বুকের উপর হইতে যেন একটা পাথর নামিল। "ভাল হবে এতে ? আপনি ঠিক বুঝছেন ?"

"হ্যাঁ রেবা, তুমি তার সামনে পড়তে সঙ্কোচ করো না। আপাততঃ সে একটু কষ্টবোধ করলেও পরিণামে এতে তার মঙ্গলই হবে। আর সেইটুকুই আমাদের দেখতে হবে। শুধু এই না,—তুমি আজ যখন আমার ঘর গোছাচ্ছিলে —সে অবাক হয়ে সে-সব দেখছিল। তোমার এইসব কাজ দেখে ক্রমে তার কাজের ইচ্ছাও আসবে দেখো। তুমি ওকে শুধু সাজিয়ে গুজিয়েই কর্ত্তব্য শেষ হ'ল মনে করো না। সাজের চেয়ে অন্য সব কাজে সঙ্গী করতে চেষ্টা করো দেখি ! দেখো—তোমার দৃষ্টান্তেই তার প্রকৃত নারীত্ব জেগে উঠবে।"

রেবার মুখখানি একটু আরক্ত হইয়া উঠিল, সে লজ্জাটুকু দমন করিয়া হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সর্ব্বদা তাকে ধ'রে টানাটানি করলে, ও ঘর ছাড়িয়ে তাকে অন্যত্র নিয়ে এলে সে কি তা সইতে পারবে ? মাঝ থেকে আমার উপর হয় তো রাগ করবে,—যে রকম রাগ !" বলিতে বলিতে রেবা থামিয়া গেল।

অনিল একটু হাসিয়া বলিল, "তবে না হয় আমারই সব কাজগুলো আগের

মত তুমি করো। তাতে শ্যামলীর চেয়ে হয়ত আমারই বেশী উপকার হবে। কিন্তু তুমি নিষ্কাম ভাবেই করবে, কেমন? কার উপকার তা চেয়ে দেখো না—কেবল চিরদিনের মতই দিয়ে যাবে। যেজন্য আমাদের এ সংসারে তুমি এসেছিলে—এই তোমার অহিতকারীদের শুধু এইই দিয়ে চল। তারপর, জানি না—তারপর আর কি!" অনিলের হাসিটা নিজের কথার মাঝখানেই কখন্ মিলাইয়া গিয়াছিল। রেবা স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। পশ্চিম আকাশ হইতে একটা সিঁদূরে মেঘ সে বারান্দাটায় অনেকখানি আলো ঢালিয়া দিতেছিল। রেবার আরক্ত মুখে, কেশে, বেশে, সে রাঙা আলো যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অনিল মুখ তুলিয়া রেবার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু বলিল, "আমি ভেবে পাই না রেবা—আমার মত তোমার এমন অপমানকারীকেও কি করে তুমি—" রেবাও চোখ তুলিয়া ক্ষণেক রুদ্ধবাক্ অনিলের পানে চাহিল, তারপর ধীরপদে এক দিকে চলিয়া গেল।

অনিল ফিরিয়া দেখিল, অদূরে শ্যামলী দাঁড়াইয়া স্তব্ধ নির্ব্বাক ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া আছে। অনিল নিকটে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত দিল, শ্যামলী নড়িল না। এতক্ষণ পরে অনিল তাহার দিকে মন দিতেছে, ইহাতেও শ্যামলী হয়ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; আর নয় তো রেবার পড়ার বিষয়েই তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ বুঝিয়া অনিল তাহার হাত ধরিয়া একটু জোরের সহিতই নিজ কক্ষে টানিয়া লইয়া গেল। শ্যামলী মুখখানা আঁধার করিয়া তথনো দাঁড়াইয়া থাকিল দেখিয়া অনিল একখানা চিত্রবিচিত্র বর্ণাক্ষরযুক্ত নয়ন-আকর্ষণ-কারী পুস্তক লইয়া শ্যামলীর সামনে মেলিয়া ধরিল। আজ বই দেখিবামাত্র শ্যামলী ব্যস্ত হইয়া তাহার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনিলের উপর তাহার সে ভাবান্তরকে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল।

মহা সমারোহের সহিত সলিলের বিবাহ হইয়া গেল। এবারে মাতার সমস্তই মনের মত হইল। বধূ সুন্দরী, শিক্ষিতা, উচ্চবংশের কন্যা এবং ঘর করিবার মত বয়ঃপ্রাপ্তা। বিবাহের পর মাত্র কয়েকদিন বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া গৃহিণী মনের সাধ মিটাইয়া ঘর করিবার জন্য আবার তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিবেন মনস্থ করিলেন।

এই উৎসবের মধ্যের দিনগুলা সকলেরই খুব ভাল রকমে কাটিল। শ্যামলী যদিও এ আনন্দের অর্দ্ধেক সুখ হইতেই বঞ্চিত, তথাপি ইহার নয়নাকর্ষক অংশতেই মুগ্ধ হইয়া সে সেই দিকে ছুটিয়া চলিয়া যাইত এবং প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া বিচিত্র বেশ-ভূষায় ভূষিত সমাগত নারীবৃন্দের নানা রকম কাজ, নানা মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বালক-বালিকাদিগের সোল্লাস ক্রীড়া, বহু জনসমাগম ও তাহাদের পানভোজন ইত্যাদি বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। এত বড় সমারোহ সে তো কখনো দেখে নাই। রাত্রের যাত্রা গান থিয়েটারের নিকট হইতেও সে নড়িত না। নারীদিগের আসনের একটি পাশে চুপ করিয়া বসিয়া নির্নিমেষ নেত্রে এ সকলের দর্শনীয় অংশটি একমনে ভোগ করিত। কেহ তাহার খোঁজ লইত না; সকলেই উজ্জ্বলদর্শনা নববধূকে লইয়াই ব্যস্ত। কেবল একজন শতকর্ম্মের মধ্যেও শ্যামলীর ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তাহার মুখে খাবার গুঁজিয়া দিত, পানীয়ের গ্লাস ধরিত, কিম্বা আহারের স্থানে টানিয়া লইয়া যাইত। উৎসব দেখিতে দেখিতে যখন তাহার ক্লান্ত নয়ন ঢুলিয়া আসিতেছে, তথাপি সে উঠিতে চাহিতেছে না—তখন নিঃশব্দে সে আসিয়া তাহার মাথাটা একটি উপাধানের উপর পাতিয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

উৎসবান্তে সকলেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, কেবল শ্যামলী হয়ত সেই সুদীর্ঘ আসনের এক প্রান্তে পড়িয়া ঘুমাইতেছে,—সহসা এক সময় সে জাগরিত হইয়া দেখিত, সে নিজগৃহে নিজশয্যায় স্বামীর পাশেই শুইয়া আছে। ক্রমশঃ মনে পড়িত, হ্যাঁ, রেবাই তাহাকে টানিয়া আনিয়া এ ঘরে রাখিয়া গিয়াছে বটে। সানন্দে নিদ্রিত স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার সে ঘুমাইয়া পড়িত।

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিত না, বেলা হইয়া যাইত, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র আবার সে ছুটিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া রেবা রাস্তা হইতেই তাহাকে পাকড়াইয়া, কিছু খাওয়াইয়া, তাহার বিশৃঙ্খল বেশ সুসংস্কৃত করিয়া দিত। সে বিলম্বও যেন শ্যামলীর সহিত না, অধীর বালিকার মত টানাটানি করিয়া শীঘ্র সে পলাইতে পারিলে বাঁচে। এই উৎসবানন্দের উৎকৃষ্টতর অংশ হইতেই সে অভাগিনী বঞ্চিত, তথাপি তাহার এই আগ্রহ দেখিয়া অনিল সুখী হইত। মাত্র স্বামীকে লইয়াই সে যে নূতন ভাবে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেছিল—তাহাতে তাহাকে জাগতিক অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়াই উঠিতেছিল। সে এখন এই উৎসবে আকৃষ্ট হওয়ায় অনিল যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল এবং নিজেও বাহিরে গিয়া আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মুখ দেখিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া বাঁচিল।

আরও একস্থানে যে এমনি উৎসব জাগিয়া উঠিয়াছে, শুদ্ধ অনিল তাহাও চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। রেবার সারা দেহ মনে যেন এই উৎসবের রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া বাজিতেছে। সে কতদিকে কত কাজ করিতেছে, কত লোকের আদর অভ্যর্থনা করিতেছে, এই বিরাট ব্যাপারে সে-ই মাতার দক্ষিণ হস্ত, তথাপি অনিল লক্ষ্য করিতেছিল, তাহার এ আনন্দের কেন্দ্রস্থল কোথায়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও অনিলের কোন বিষয়ে তো এতটুকু অনিয়ম হইবার উপায় ছিল না। অনিল রাত্রি জাগিতে পারিত না, অসময়ে অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গোলমালের মধ্যে তাহার খাওয়াও হইত না, এ সব বিষয়ে অনিলকে অনুরুদ্ধ

না করার জন্য সকলের উপরে অনিলের মাতার কড়া হুকুম জারী করাও ছিল। অনিল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দু-একঘণ্টা আনন্দ আলাপে কাটাইয়া যথানিয়মে স্নান, পান, আহার, নিদ্রার জন্য চিরনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিত—সমস্ত ঠিক করিয়া লইয়া রেবা পথ চাহিয়া আছে। অসময়ে কোন কার্য্যানুরোধে সহসা অনিল সে দিকে আসিলেও দেখিতে পাইত, রেবা তাহার ব্যবহারের সমস্ত জিনিসই নিজ হাতে ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। এত কাজের মধ্যেও এগুলি অন্যের হাতে রেবা দিতে পারে নাই। অনিল ও শ্যামলীর সে গৃহে অনুপস্থিতিতে বরং সে কাজগুলার মাত্রা যেন বাড়িয়াই গিয়াছে। গৃহসজ্জার প্রসাধন করিয়া, শয্যা ও বস্ত্রাদির মার্জ্জন করিয়া রেবার যেন আশ মিটিতেছে না। মধ্যে কিছুদিন একাজগুলা যে তাহার হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে ক্ষোভ যেন রেবা এইরূপে মিটাইয়া লইতেছে। সমস্ত কাজের মধ্য হইতে কি একটা আনন্দের সুর যেন রেবার চারিদিকে গলিয়া ঝড়িয়া পড়িতেছিল। রেবা তাহাতে এতই তন্ময় যে অনিল আসিয়া দাঁড়াইলেও সকল সময়ে সে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছিল না।

এমনি সময়ে একদিন অনিল এই রকম কাজের মধ্যে ধ্যানমগ্না রেবাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া রেবার সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই হাসিয়া বলিল, "দাঁড়াও, মাকে বলে দিচ্ছি, তুমি এই রকম ক'রে চুরি করতে শিখেছ!"

অনিলের সঙ্গে সে অবস্থায় চোখোচোখি হওয়াতেই না কি জানি কেন রেবা লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে অনিলের এই রহস্যে তাহার মুখ চোখ একেবারে রাঙা গোলাপের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। কোন উত্তর না দিয়া একবার মাত্র সে অনিলের দিকে চাহিয়াই সে ঘর হইতে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। অনিল সাশ্চর্য্যে ডাকিল, "রেবা—যাও কেন—শোন!" অনিল রহস্য করিয়া সংসারের নিকট হইতে সময় চুরির কথাই রেবাকে বলিয়াছিল—ইহাতে রেবা কেন লজ্জা পাইল বুঝিতে না পারিয়া অনিলও একটু

লজ্জিতভাবে তাহাকে ফিরাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বাহিরে দৃষ্টি-পাত করিতেই দেখিল,—শ্যামলী। আসিতে আসিতে সহসা সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া অন্যমনে কি ভাবিতেছে। অনিলকে দেখিয়াও সে ছুটিয়া আসিল না—তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া অনিল চক্ষের ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিল। ধীরগতিতে শ্যামলী তাহার নিকটে আসিলে বুদ্ধির গুরুভারযুক্ত তাহার সেই ধীর পদক্ষেপে অনিল খুশী হইয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল।

ক্রমে বিবাহের উৎসব শেষ হইয়া আসিল। কুটুম্বিনীগণ একে একে বিদায় লইতেছেন। গৃহশোভা পুষ্পপল্লবের মালা শুকাইয়া ক্রমে ঝরিয়া পড়িতেছে। বাড়ী-ঘর ধৌত মার্জ্জনের একটা হৈ চৈ চলিতেছে। শ্যামলীর আর তখন সেদিকে ঘোরা ভাল লাগিতেছিল না। সে তখন অন্য মনে নববধূর কাছে গিয়া বসিল। একটু বসিয়া তাহাতেও যেন সুখ পাইল না। বধূ যেন কি এক রকম ভাবে তাহার দিকে চাহে, তাহার সঙ্গের দাসীরাও এক রকম হাসি হাসি ভাবে শ্যামলীকে কোন কিছু ইঙ্গিত করে। এ অবজ্ঞার ভাব যে তাহার আশৈশব পরিচিত, তাই তাহার সেখানেও মন বসিল না। কিন্তু তথাপি নববধূর বসন-ভূষণের ঔজ্জ্বল্যে, রূপে ও নূতনত্বের আকর্ষণে শ্যামলী তাহার সঙ্গে একটু ভাব করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু বধূ যেন আমল দিতেছিল না। দাসীগণের সঙ্গে শ্যামলীর অলক্ষ্যে যেন মুখ টিপিয়া হাসিতেছে বলিয়াও শ্যামলীর একবার বোধ হইল। ইতিমধ্যে অনিলের মাতা আসিয়া শ্যামলীর হাত ধরিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। সেদিন তাঁহার করুণা-কোমল মুখ দেখিয়া শ্যামলীর চিত্ত তাঁহার উপরে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আর সে তাঁহার নিকট হইতে বড় নড়িতে চাহিল না, এক মনে বসিয়া বসিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নিজের হাতে তো বেশী কিছু করেন না, তাঁহার হাত যেন আর একজন। সে রেবা!

এই রেবা, এ কি এ সংসারের সর্ব্ব বিষয়েরই কর্ত্রী? শ্যামলী ও অনিলের

অধিকারভুক্ত ঘরগুলা—সেগুলার তো রেবার হস্তস্পর্শ নইলে একদণ্ড চলে না, সব বিশ্রী বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। প্রভাতে রেবা সে ঘরে প্রবেশ না করিলে, এমন কি, শ্যামলীরই মনে হয়, বুঝি এখনো সকাল হয় নাই, বাহিরে বুঝি সূর্য্য উঠে নাই, তাই আলো ফুটিতেছে না। তারপরে রেবা আসার সঙ্গে সঙ্গে—কেহ তাহাকে লক্ষ্য করুক না-করুক—সে ঘরের দিব্য শ্রী ফুটিয়া উঠিতে আর দেরি লাগে না। স্বামীর অশনে-বসনে-শয়নে সকল সময়েই যে রেবার হস্তস্পর্শ সব জিনিসেই লাগিয়া আছে তাহা শ্যামলী বেশ বুঝিতে পারে। তাহার নিজের শরীরেই বা কি? এই যে তাহার কেশের পারিপাট্য, এই যে বেশ-ভূষা, এ সবই তো রেবার হাতের কাজ। তাহার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার পানীয়, সেও বুঝি রেবার নিকট হইতেই আসে। এ গৃহের যিনি সর্ব্বেশ্বরী, তাহার শাশুড়ী, ইনিও তো সর্ব্বদা রেবারই মুখাপেক্ষী। তাঁহার নিকটে বসিয়া সংসারের কাজ শিখিতে শ্যামলীর ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু সেও সেই রেবার হাত হইতেই শিখিতে হইবে। শ্যামলীকে রেবার নিকট হইতে মায় নিজের প্রসাধন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তবু তাহার অন্তর যেন ক্রমশঃ তাহাতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। এই রূপে গুণে ঐশ্বর্য্যময়ী রেবা তাহারই মত তো একজন রমণী—বয়সও প্রায় একই পর্য্যায়ের, কিন্তু বিধাতা তাহাকে কি নিখুঁত করিয়াই না সাজাইয়াছেন। রূপের কথা তো ছাড়িয়া দিই, শ্যামলীর জ্ঞানেরও অতীত এমন কত না গুণ তাহার আছে, যাহাতে সে তাহার স্বামীর, শাশুড়ীর মনকে সুখী করিতে পারে। অনিলের মত বই হাতে লইয়াও সে কি করে আর তাহারা মুগ্ধভাবে তন্ময় হইয়া থাকেন। হায় সে যে কি গুণ তাহা শ্যামলীর বুঝিবারও সাধ্য নাই! যাক্, জগতে এ-গুণও বুঝি অনেকেরই আছে, কেবল শ্যামলীরই নাই, কিন্তু এই সংসারের কোন জায়গায়ই কি এই রেবাকে বাদ দিয়া শ্যামলীর কিছু পাইবার উপায় নাই? এই ঔজ্জ্বল্যময়ীর প্রভায় নিজের মালিন্য শ্যামলী যেন দিন দিন বুঝিতে পারিয়া কেমন এক রকম হইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে যেন সে রেবাকে

আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

ক্লান্ত মনে উঠিয়া সে অনিলের পড়িবার ঘরের দিকে গেল। দেখিল, সেখানে স্বামী নাই, শয়ন-কক্ষেও নাই। তিনি তবে বাহির-বাটীতে আছেন বুঝিয়া শ্যামলী অগত্যা গৃহপার্শ্বস্থ কাঠের বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। নীচে ফুলের বাগানে অজস্র ফুলের খেলা, পাতার বাহার, সৌরভরাশি দিকে দিকে ছড়াইতেছে, কিন্তু সম্মুখের আকাশে সাজন্ত কালো মেঘ পশ্চিমের আকাশে প্রৌঢ়সূর্য্যকে ধরিতে চলিয়াছিল। শ্যামলী কিছুক্ষণ সেই কালো মেঘের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু আজ সেও তাহার অন্তরকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া কখন্ যে তাহার অন্তর গৃহের কোণায় ঢুকিয়াছে তাহা সে এতদিন জানিতেও পারে নাই।

শ্রান্তপদে শয়নকক্ষে ঢুকিয়া শ্যামলী দেখিল, রেবা সে গৃহের সজ্জাগুলা যথাযথভাবে রাখিতেছে, নাড়িতেছে, চাড়িতেছে। তাহাতে সে এতই তন্ময় যে, শ্যামলীর আগমন জানিতে পারে নাই। যে আসনটায় অনিল আসিয়া সর্ব্বাগ্রেই বসিবে, সেই ছোট কোচখানা কি যত্নের সঙ্গেই আঁচল দিয়া শতবার মুছিয়া রেবা শয্যার পাশে টানিয়া রাখিতেছে। সহসা ও কি! শ্যামলী অবাক হইয়া দেখিল, রেবা হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সে আসনখানার উপরে মুখ রাখিয়াছে! শুধু যত্ন নয়, শুধু সেবা নয়, এই অনিলের স্পর্শময় আসনখানায় আরও কিছু দিয়া এবং কিছু লইয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মত রেবা ধীরপদে অন্য দিকের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল। শ্যামলীর উপস্থিতি সে জানিতেও পারিল না।

শ্যামলী ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার অন্তরের ও বাহিরের সেই মেঘ যেন ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত হইতেছিল। তাহাতে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত ক'দিনের কয়টা ঘটনা,—সেই প্রথম রেবা ও অনিলের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত, সেদিন শাশুড়ীর নিকট হইতে উঠিয়া আসার পরে রেবা ও অনিলের

একটু অবোধ্য ভাবের সঙ্গেই দুইদিকে দুইজনার হঠাৎ চলিয়া যাওয়া, যাহাতে কিছু না জানিয়াও শ্যামলীর মন সহসাই কেমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল,—শ্যামলীর মনে পড়িয়া গেল ; আজ সেই ঘটনাগুলার মধ্যে শ্যামলী কিসের যেন চকিত আলোক-রেখা দেখিতে পাইল। তারপরে রেবার সেই রক্তিম মুখে অনিলের ঘর ছাড়িয়া পলায়নের কথা শ্যামলীর মনে পড়িল। এসব ভাবকে যে শ্যামলী খুব ভাল রকমেই চেনে। বিছানার মধ্যেই আবার শ্যামলী কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের হাতপাগুলা তাহার নিজের অজ্ঞাতেই শক্ত হইয়া পড়িতেছিল।

অনিল রাত্রে শয্যায় আসিয়া দেখিল, শ্যামলী অত্যন্ত অসুস্থভাবে ছট্‌ফট্ করিতেছে। ব্যস্ত হইয়া সে নানাপ্রকারে তাহার কষ্টের কারণ জানিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনেকক্ষণ এই ভাবের পর অনিলের আদরে শ্যামলী ক্রমে যেন একটু শান্ত হইল, কিন্তু মেঘ নামিল না, স্বামীকে স্পর্শ করিয়া ক্রমে শান্তভাবে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শিশিরের স্ত্রীকে অনেকদিন হইতেই আনিবার কথা হইতেছে। কিন্তু সলিলের বিবাহের সময় অনিল ইহাতে সম্মতি দেয় নাই, সে জন্য শিশির তখন একাই আসিয়াছিল। অনিলের আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে অনেকেই তাহার সেই বিবাহবিভ্রাটের কথা জানে। এখন বিজলীকে দেখিলে, তাহারা শ্যামলী ও বিজলীকে লইয়া তাহাদের তুলনার সমালোচনায় হয়ত বিবাহবাড়ী নূতন ভাবে জাঁকাইয়া তুলিবে এবং গৃহিণীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া হয়ত তাঁহার দুঃখকে দ্বিগুণ করিয়া দিবে—এই ভয়েই অনিল তখন বিজলীকে আনিতে দেয় নাই। এখন আর সে ভয় নাই! কুটুম্বিনীরা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গিয়াছেন এবং নববধূকে কয়েকদিন মাত্র বাপের বাড়ী রাখিয়া অনিলের মাতা আবার তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অনিলের অনুরোধে এই সময়ে শিশির সপুত্র বিজলীকে আনিয়া মাতার চরণে প্রণাম করাইল।

মাতা যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া শিশিরের বধূকে উপযুক্ত যৌতুকাদি দিলেন। বিজলীকে নিকটে লইতে তিনি যথাসাধ্য আত্মসম্বরণ করিয়া রহিলেন, কিন্তু বিজলীর ক্রোড়ের সেই কুসুম-সুকুমার শিশুটির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার ধৈর্য্য রাখা সুকঠিন হইয়া উঠিল। ত্রস্তে তিনি রেবার হাত হইতে জলখাবার সাজানোর কাজটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বিজলীর দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

রেবা বিজলীর নিকট গিয়া তাহার ক্রোড় হইতে খোকাকে লইতেই বিজলী তাহার মুখের দিকে একটু চাহিয়া বলিল, "আপনিই বুঝি রেবা দিদি!" রেবা বুঝিল, শিশিরের নিকট হইতে রেবার কথা বিজলীর অজানা নাই, কিন্তু না জানি, সে কতটা জানিয়াছে! তিন মাস পূর্ব্বের ঘটনাটাও কি ইহার অজানিত নাই?—আরক্ত মুখখানাকে খোকার মুখের উপর রাখিয়া রেবা অস্পষ্ট কণ্ঠে কেবল বলিল, "হুঁ।"

"দেখেই আমি চিনতে পেরেছি দিদি,"—বলিতে বলিতে বিজলী নত হইয়া রেবার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

তাহার কণ্ঠের স্বরেই রেবার সে কুণ্ঠা যেন অনেকটা সরিয়া গেল। রেবা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কি করো ভাই!"

বিজলী একমুখ হাসির সহিত বলিল, "কেন আপনি যে সকলেরই দিদি শুনতে পাই, আমারও কি হবেন না?"

রেবার লজ্জাবেদনার রক্তিমাভা ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল। শিশিরের উপরে কৃতজ্ঞতায়ও তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে তখন বলিল, "চলো, শ্যামলার কাছে যাই।"

"যাচ্ছি, আগে আপনাকে একটু ভাল করে দেখি। আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে এত সাধ হ'ত! আপনি যে আমাদেরই মতন মানুষ, এ যেন মনে হ'ত না!"

এইবার সলজ্জে রেবা তাহার গাল দু'টি টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "দিদিকে লোকে বুঝি ঐরকম ক'রে কথা বলে ?"

রেবার এই সাদর স্পর্শে বিজলী আনন্দে তাহার অধিকতর নিকটস্থ হইয়া দুই হাত দিয়া তাহার একটি হাত ধরিয়া বলিল, "আপনার মত দিদিকে এ কি বেশী কিছু বলা হ'ল ?"

"হ্যাঁ, যাকে দিদি বললে, তাকে অমন পরের মত কথা কইতে নেই।"

বিজলী হাসিয়া বলিল, "শিখিয়ে দেন তবে কি বলব ?"

"দিচ্ছি। প্রথমেই বলি, খোকার মাসীমাকে আপনি বললে খোকাবাবু রাগ করবেন, এটুকু জেনে রাখো।"

"না দিদি, আপনাকে আমি কখনই তুমি বলতে পারব না, ওঁরাই আপনার নামে যে-রকম—"

"তবে খোকা রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন"—বলিতে বলিতে রেবা শিশুটিকে লইয়াই অগ্রসর হইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে বিজলীও চলিল। শিশিরের মুখে যে-রেবার কথা সে শুনিত, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণা প্রৌঢ়গাম্ভীর্য্যময়ী দেবী রেবার স্থলে এই স্নেহপ্রবণা অলোকসুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া এবং তাহার বয়সোচিত কথায় ও ব্যবহারে বিজলী একটু বিস্মিত হইতেছিল বটে, কিন্তু আনন্দটা তাহার চেয়ে অনেক বেশীই হইতেছিল।

বিজলী বুঝিল যে, রেবা তাহাকে শ্যামলীর নিকটেই লইয়া যাইতেছে। সে প্রশ্ন করিল, "শ্যামলী কি আপনাদের কাছে থাকে না ?"

"থাকে বৈকি। কাল থেকে তার কি-বকম অসুখ করেছে, বিছানা থেকে বেশী উঠেনি। জ্বরটর নয়, জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বোঝা যাচ্ছে না— "

রেবাও কথার অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল। বিজলীও নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া শেষে যেন কষ্টের সঙ্গেই উচ্চারণ করিল, "বোঝা যে'বড় শক্ত ! মা-ই কেবল বুঝতেন তার কি চাই বা কি হয়েছে। অনিলবাবু বোধ হয় জানেন—"

"বাইরের কিছু অসুখ হলে নিশ্চয় শুনতে পেতাম। মনেই তার কি এক রকম ঝোঁক ওঠে অনেক সময়,—দেখেছি। তোমায় দেখলে বোধ হয় খুশী হয়ে এ ভাবটা সেরেও যেতে পারে।"

অনিলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিজলী মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে লাগিল। এ প্রাসাদের ঐশ্বর্য্যে সে প্রথমেই বিস্মিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই কেন্দ্রস্থলে নিজের অনুপযুক্তা ভগিনীকে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহাকে আর হতভাগিনী বলিয়া ভাবিতে পারিল না এবং এই গৃহস্বামীগণের উপরে শ্রদ্ধা ও সম্মানে তাহার অন্তর পূরিয়া উঠিল।

রেবা দেখিল, খাটের উপরে শ্যামলী একইভাবে শুইয়া আছে। চক্ষু অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দেওয়ালের গাত্রে নিবদ্ধ, মুখে অশান্ত চিত্তের উদ্বেগের চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। রেবা বিজলীকে তাহার নিকটে গিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলে বিজলী শ্যামলীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শ্যামলীর মাথায় হাত দিয়া ডাকিল। শ্যামলী দৃষ্টি ফিরাইল, দুই এক পলক মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়াও বসিল। কিন্তু তাহাতে ব্যস্ততার বা কোন রকম উচ্ছ্বাসের আভাসমাত্র নাই। যেন বিজলীর সঙ্গে প্রত্যহই তাহার দেখা হয়, বিজলী যেন এমনভাবে প্রত্যহই তাহাকে ডাকিয়া থাকে। শ্যামলী তো এতদিন এমন ছিল না। এই মূকবধির প্রাণীটির প্রত্যেক ভাবের অনুভবটি যে খুব গভীরভাবে প্রকাশিত হইত। সে শ্যামলী সহসা এমন হইল কেন? রেবা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া ভাবিল, অনিল কেন এখন শ্যামলীকে একা রাখিয়া গিয়াছে, এ কাজ তাহার ভাল হয় নাই।

শ্যামলীকে কোন মতেই তাহার দিকে তেমন আগ্রহযুক্ত করিতে না পারিয়া বিজলীও কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। মৃদুস্বরে রেবাকে প্রশ্ন করিল, "এ কি সব সময়েই এমনিভাবে থাকে?"

"না।"

"তবে? আচ্ছা, অনিলবাবুকে একবার ডাকালে হয় না? বোধ হয়, সেই জন্যই—"

"তাই ডাকাই; কিন্তু এখন তো সে রকমও আর ছিল না—সকল দিকেই বেশ যেতে চাইত। হঠাৎ বিহ্বল—" বলিয়া বিমনা রেবা সে গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার বিজলীর খোকাকে শ্যামলীর সম্মুখে বসাইয়া দিতেই এইবার শ্যামলীর একটু ভাবান্তর দেখা গেল। যেন বিস্মিত এবং মুগ্ধভাবে সে শিশুটির দিকে চাহিতে লাগিল। তারপর সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল দেখিয়া বিজলী সহর্ষে বলিল, "থাক্ দিদি, অনিলবাবুকে আর তবে ব্যস্ত ক'রে এখন কাজ নেই। তিনি তো ঐ ভোগ রাতদিনই ভুগছেন।"

রেবা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তিনিই কি বেশীক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকবেন, এখনি আসবেন।"

শ্যামলী তখন খোকাকে নিবিড়ভাবে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে এবং নিজেও যেন একটা অব্যক্ত আবেগে চঞ্চলভাবে ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ভগ্নীর সঙ্গে চোখো-চোখি হইতেই এবার ছুটিয়া তাহার নিকটে গিয়া হস্তদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া মাথা নাড়িয়া সঙ্কেতে যেন প্রশ্ন করিল, "তোর সেই খোকা না?—এতবড় হয়েছে? এত সুন্দর হয়েছে?" বিজলীও তাহার উত্তরস্বরূপ মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ, সেই খোকা।"

শ্যামলীর দুর্দ্দাম আদরে খোকা এদিকে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে তাহার ক্রোড় হইতে তখন লয় কার সাধ্য। ক্ষুধিত স্নেহে সে যেন তাহাকে অন্তরের মধ্যেই পুরিয়া লইতে চায়—ঠিক এমনি ভাবে সে শিশুটিকে বুকের উপর টিপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছিল।

অনিল সে ঘরে প্রবেশ করিতেই বিজলী একটু সংযত হইয়া দাঁড়াইল,

আর শ্যামলী তাহাকে দেখিবামাত্র এমনি ভাবে ছুটিয়া তাহার অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইল এবং সহর্ষে তাহার বক্ষস্থ শিশুকে অনিলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, যাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, এতক্ষণ ইহাকে একা ভোগ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছিল না, স্বামীকে ইহার অংশ দিবার জন্যও সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

অনিলও সানন্দে শ্যামলীর ক্রোড়স্থ শিশুর গাল টিপিয়া দিয়া আদর করিল এবং ক্রোড়ে লইবার জন্য হাত পাতিতেই শিশু ঝাঁপাইয়া অনিলের কোলে চলিয়া গেল। শ্যামলীর হাত হইতে উদ্ধার পাইলে সেও যেন বাঁচে। অনিলের ক্রোড়ে যাইতে তাহার আগ্রহ দেখিযা শ্যামলী প্রথমে একটু আমোদিত হইয়া উঠিল, স্বামীর ক্রোড়স্থ শিশুকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চারিদিক হইতে চুম্বন করিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিল, শেষে আবার অধীর ভাবে শিশুকে নিজের বুকেই টানিয়া লইল।

অনিল এতক্ষণ কোন দিকেই মন দিবার অবকাশ পায় নাই। শিশুকে আদর করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি যে শ্যামলীর দিকেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা রেবা ও বিজলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। শ্যামলীর এই ভাবান্তরে সেও যেন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হইযা এইবাবে অন্য বিষযে মনোযোগ দিল। বিজলীকে কিছু কুশল প্রশ্ন করিয়া শেষে জানাইল, মাতা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন,—বিজলীকে এখনি তাঁহার কাছে যাইতে হইবে। রেবা বুঝিল, ইহা জলখাবারের ডাক, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে খোকাকে যে শ্যামলীর কবল হইতে মুক্ত করিয়া দুধ খাওযাইতে হইবে। বিজলী এবং রেবা অনুপায়ভাবে অনিলের পানে চাহিল। রেবা মৃদুস্বরে বলিল, "খোকাকে আপনি নিন্ দেখি।"

অনিলের ক্রোড়ে খোকাকে দিতে যে শ্যামলীর বেশী কিছু আপত্তি তাহা বোধ হইল না—কিন্তু সহসা তাহার বোধ হইল, রেবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিজলী যেন সে ঘর ছাড়িয়া যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে,

স্বামীও যেন ছেলেটিকে লইয়া উহাদের সঙ্গেই যাইবেন। এই সন্দেহ শ্যামলীর মনে উদয় হইবামাত্র শ্যামলী অনিলের কোলে খোকাকে তো আর দিলই না, উপরন্তু তাহার হাত সজোরে ধরিয়া টানিয়া একটা লম্বা কৌচের উপরে তাহাকে বসাইয়া দিল এবং ছুটিয়া গিয়া বিজলীরও গতি রোধ করিল। কোলে শিশু, একটা হাত তো তাহাতেই আবদ্ধ, বাকি একটা হাতে শ্যামলী বিজলীকেও টানিয়া আনিয়া সেই একই কৌচের উপর একদিকে বসাইল। সকলে অবাক হইয়া তাহার কাণ্ড দেখিতেছিল। ভগ্নী ও স্বামী দুইদিকে দুইজনকে স্থাপিত করিয়া নিজে তখন শ্যামলী তাহাদের মাঝখানে খোকাকে কোলে লইয়াই বসিয়া পড়িল। মুখে একটা উদ্বিগ্ন পরুষভাব, কাহাকেও সে নিজের নিকট হইতে দূরে যাইতে দিবে না। অস্থিরভাবে একটা হাতেই কখনো স্বামীকে কখনো ভগ্নীকে নিকটে টানিয়া লইবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তখন তাহারাও অগত্যা শ্যামলীকে শান্ত করিবার জন্য তাহার ইচ্ছানুরূপ ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। রেবাও নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, সেও কোন উপায় দেখিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ পরে সহসা এক সময়ে চমকিত হইয়া অনিল চাহিয়া দেখিল, মা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছেন। শ্যামলী এতক্ষণ স্বামীর হাতটা একহাতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বিজলীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া ছিল। বুকের উপরে শিশুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে, শ্যামলীর মুখের ভাবটাও এখন যেন কোমল হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণে তাহার কয়েক ফোঁটা জল— তাহা যে এই মিলনানন্দের কিংবা কিসের জন্য, তাহা বোধ হয় সে নিজেই জানে না। স্বামীর হাত যে-হাতটায় ধরা ছিল, তাহাও এইবার শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

মাতাকে দেখিয়া অনিল ও বিজলী সসম্ভ্রমে যুগপৎ দুইদিক হইতে দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইতে শ্যামলীও চোখ মেলিয়া চাহিল এবং সেও ধীরে ধীরে উঠিয়া

দাঁড়াইল। অনিল বিস্মিত হইয়া দেখিল—শাশুড়ীকে দেখিয়া শ্যামলী এইবার ধীরপদে তাঁহার নিকটস্থ হইল এবং আপনা হইতেই শিশুকে তাঁহার ক্রোড়ে তুলিয়া দিল।

মাতা শিশিরের শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন। মুক্তার হার তাহার কণ্ঠে দুলাইয়া দিয়া গম্ভীর সংযতমুখে শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া বিজলীর হস্ত ধরিয়া সে ঘর হইতে লইয়া চলিলেন। শ্যামলী আপত্তি মাত্র করিল না, বরং স্নেহমুগ্ধভাবে তাঁহাদেরই অনুসরণ করিল।

অনিল নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাতার নিঃশব্দ বেদনা সে নিজের অন্তরের মধ্যেই অনুভব করিতেছিল।

২৬

শিশিরের আর বেশী দিন থাকিবার উপায় ছিল না। সলিলের বিবাহের আগে হইতেই সে এখানে আসিয়াছিল। তারপরে বিজলীকে সঙ্গে আনিয়াও দিন পনেরোর কমে তাহাদের লইয়া যাইবার নাম করিতে পারিল না। শেষে অনিলই তাহাদের এ বিষয়ে সাহায্য করিল। মাতাকে বুঝাইল, শিশিরের আর ক্ষতি করা উচিত নয়।

এ কয়দিন গৃহিণীর পক্ষেও বড় সুখেই কাটিয়াছে। শ্যামলীর বিষয়ে বাকী ক্ষোভটাও ক্রমশঃ তিনি সংযত করিয়া লইয়াছিলেন। দুইটি বধূ এবং শিশুটিকে লইয়া তিনি পুরামাত্রায় সংসার-সুখ অনুভব করিয়া লইলেন। শ্যামলীও এ কয়দিন সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে নিকটেই থাকিত এবং খোকাকে একদণ্ডও

ছাড়িতে চাহিত না। এমন কি, এক একটা রাত্রেও তাঁহাদের পাশেই ঘুমাইয়া পড়িত। সকলেই শ্যামলীর এই স্বাভাবিক ভাবে সন্তুষ্ট হইতেছিল। অনিলই সর্ব্বাপেক্ষা আশান্বিত হইল।

বিজলীদের বিদায়ের সময়ে সকলেই দুঃখিত হইল,—অল্পবিস্তর চোখের জলও ফেলিল,—কেবল শ্যামলীকেই বিদায়ের সময়টা বুঝিতে দেওয়া হইল না। কি জানি, সে পাগল যদি কোন বিভ্রাট বাধাইয়া বসে। খোকার জন্য সে যে বেশী কাতর হইবে, তাহা সকলেই আন্দাজ করিতে পারিতেছিল।

বিজলী রেবার নিকট হইতে কাঁদিয়াই বিদায় লইল। বলিল, "দিদি, আপনাকে কখনো ভুলতে পারব না। আপনার কথা যে রকম শুনেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী যে পেয়ে গেলাম। যেখানে আপনি থাকবেন, তার বাতাসটাও গায়ে লাগলে আমরা ধন্য হব। জানি নে, কোন্ বিধাতার শাপে আপনি এমন ক'রে এখানে আছেন।"

অনিল শুনিতে ও দেখিতে পাইল, মাতা এই সময়ে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রেবার দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন।

বিজলীদের চলিয়া যাওয়া শ্যামলী যখন বুঝিতে পারিল, তখন সে একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। কি যে করিবে, ভাবিয়া না পাইয়া খানিকক্ষণ ঘরের মেঝেয় মাথা ঠুকিয়া হাত-পা আছড়াইয়া শেষে বিছানায় উবুড় হইয়া পড়িল। অনিলের সান্ত্বনাতে দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। না খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনুপায় অনিল নিঃশব্দে ঘরের এককোণে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল কতক্ষণে তাহার ক্ষোভ শান্তি হয়। ক্রমে বেলা যাইতেছিল। রেবা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিল, "খাওয়াতে পারা গেল?"

অনিল মাথা নাড়িল—"না।"

রেবা তখন শ্যামলীর মাথার কাছে বসিয়া নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত

বুলাইল, শ্যামলী চোখ খুলিল না। রেবা ক্রমে সাহস পাইয়া তাহার মুখের মধ্যে একটু কিছু গুঁজিয়া দিল, শ্যামলী এবার আর বেশী আপত্তি করিল না। ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ হয় এবার তাহার দুঃখকে অভিভূত করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহাও অল্পক্ষণের জন্য। একটু পরেই সহসা সবেগে উঠিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বোধ হয়, আর একবার ভাল করিয়া বাড়ীখানা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে তাহারা কোথায় লুকাইয়া আছে।

অনিল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়াই রহিল দেখিয়া রেবা বলিল, "সঙ্গে গেলেন না কেন?"

"তাতে বাধা বোধ ক'রে আরও অস্থির হয়ে উঠত। খানিকটা দেখে এখনি আপনি ফিরে আসবে।"

রেবা খাবারগুলার পানে ক্ষুণ্ণভাবে চাহিয়া বলিল, "আর একটু যদি খাওয়াতে পারা যেত,—কিছুই যে খেলে না।"

রেখে দিয়ে যাও—চেষ্টা করে দেখব।"

রেবা একটু হাসিয়া বলিল, "ঐ তো সকাল থেকে খাবার পড়ে রয়েছে, পারেন নি তো? কি করে পারবেন? যাদের যা কাজ।"

অনিল বিষণ্ন মুখে বলিল, "সে সত্যি—তবে উপায় কি?"

"কেন, উপায় কি নেই? আমাদের ডেকে পাঠাবেন।"

"তোমার কি এখন আর অন্য কাজ নেই?"

"কাজ মানুষ যখন করবে তখনি আছে, জগতে কাজের দুঃখটা অন্ততঃ নেই—"

বলিতে বলিতে উঠিয়া রেবা সকাল হইতে অভুক্ত খাবারের রেকাব ও বাটি কয়টা এক জায়গায় জড় করিল, যাইবার সময় হাতে করিয়া লইয়া যাইবে। তার পরে শ্যামলীর সারাদিনের ব্যবহৃত অপরিষ্কার বিছানাটা সুসংস্কৃত করিয়া, টেবিলের উপরটা, ঘরের চারিদিকটা কোথায় কি কোন্ ভাবে আছে ভাল করিয়া দেখিয়া

লইয়া রেবা যখন খাবারের বাসনগুলা হাতে তুলিতে গেল, তখন নির্ব্বাক অনিল এইবার একটু বেগের সহিতই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, এগুলো করবারও কি এ বাড়ীতে লোক নেই ?"

রেবা হাসিয়া ফেলিল, "না। কি করব, অগত্যা আমায়ই করতে হয়।"

"রেবা, হাসির কথা নয়, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"আচ্ছা, এখন থাক,—এখন আমার—"

"কিছু কাজ নেই তোমার ; তোমার কাজ তো কেবল আমাদের বিব্রত ক'রে তোলা। না রেবা, এ রকম চলবে না।"

রেবা একটু যেন বিস্মিতভাবে অনিলের পানে ক্ষণেক চাহিল—তাহার পরে মৃদুস্বরে বলিল, "কি চলবে না ?"

"এ রকম ক'রে তুমি কেবলই আমাদের—না, তুমি দিনরাত কেবল—এমন ক'রে চলতে পারে না,—কিছুতেই না।"

রেবা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। নিঃশব্দে অবনতমুখে অনিলের পানে চাহিয়া চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি কি আপনাদের বেশী বিরক্ত করি ? অন্যায় করি কিছু ?"

রেবার কণ্ঠস্বরে অনিল এইবার মুখ তুলিল,—দেখিল, রেবার মুখ একেবারে নীল হইয়া উঠিয়াছে। চোখ দুটি নিষ্প্রভ, দৃষ্টি স্থির, হাতপাগুলা স্পষ্টই কাঁপিতেছে। তথাপি অনিল বিচলিত হইল না, বিজলীর কথাগুলা তখনো যেন তাহার কানে বাজিতেছিল, "জানি না, কোন্ বিধাতার শাপে আপনি এমন ক'রে এখানে আছেন।" মাতার দীর্ঘশ্বাস তখনো তাহার কানে বাজিতেছিল। জগতের উচ্চতম স্থানেই যাহার আসন হওয়া উচিত, সেই রেবাকে এমন করিয়া দিনরাত্রি তাহাদের দাসীভাবে আর সে থাকিতে দিবে না। কিছুতেই না। অনিল বলিল, "হ্যাঁ, তুমি অন্যায় করো। আজ থেকে এ ঘরের কাজ ঝিয়েরা করবে—

বিপন্নে করবে। তুমি আর এ রকম করবে না।"

রেবা একভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় দেখিয়া অনিল তখন চমকিত হইয়া ডাকিল, "রেবা—রেবা—দাঁড়াও, ফেরো!" রেবা দাঁড়াইল বটে, কিন্তু তাহা যে সে পারিতেছিল না—তাহা তাহার পায়ের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইত। ফেরা তো পরের কথা!

"ফেরো রেবা—এদিকে এস,—আমায় বলতে দাও আর একটু।"

রেবা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "বলুন!"

অনিল উঠিয়া গিয়া রেবার সম্মুখে দাঁড়াইল। ব্যথিত মুখে রেবার পানে চাহিয়া বলিল, "বলো, কি ভাবলে তুমি আমার এ কথায়? আমি তোমার ওপর বিরক্তই হয়েছি, না? বল,—না বলে চ'লে যেতে পাবে না।"

রেবা তথাপি কথা কহিতে পারিল না। অনিল বলিল, "চলো ওদিকে, আর একটু কথা আছে।"

রেবা এইবার নতমুখে তেমনি রুদ্ধকণ্ঠেই বলিল, "না—আমি যাব এ দিকে।"

"না—আজ আমার কথাগুলো তোমায় শুনতে হবে।"

"বলুন এইখানেই—শীগগির করে।"

"কি ভাবলে তুমি আমার ও-কথায় রেবা? আমি তোমার ওপর বিরক্ত হয়েছি,—না?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যিই তুমি তাই ভাবলে? আর কিছু—আর কিচ্ছুই তোমার মনে এলো না? এত অনুভবময়ী হয়েও তুমি আমার সম্বন্ধে এইই বিচার করলে? একবার ভেবে দেখলে না যে, তোমায় এরকমভাবে দিন-রাত্রি আমাদেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করাব?"

"আপনাদের এতে আর সুখস্বাচ্ছন্দ্য কোথায়,—বরং অসুখই তো দিলাম।"

"অসুখ রেবা? হ্যাঁ, একরকম তাই বৈ কি, এ আর আমি সত্যই সহ্য করতে পারছি না।"

"এতদিন তো পেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ—পেরেছিলাম। শুধু তাই না—তোমার অনুপস্থিতিতে অনুযোগ করেই তোমায় নিজে ডেকে এনেছি, তাও আমার মনে আছে। কিন্তু মানুষ চিরদিনই কি আত্মসুখসর্ব্বস্ব হয়ে থাকতে পারে?"

"নিজের সুখ আর অসুখ এই দুটোই মাত্র কি জগতে দেখবার? এ ছাড়া আর কিছুই নেই?"

অনিল দেখিল, সাদা পাথরের উপরে নীলের সে আভা ঘুচিয়া ধীরে ধীরে রক্তিমার সঞ্চার হইতেছে। বিমূঢ় ভাবে বলিল, "কি বলছ একটু বুঝিয়ে বল। নিজের সুখের দিকটা ভুলে তোমার দিকটাই তো দেখতে চাচ্ছি রেবা।"

"অনুগ্রহ করে এ দৃষ্টি থেকে আমায় অব্যাহতি দাও। আমার সুখ-দুঃখের জন্য তোমায় এত ভাবতে হবে না। সরুন, পথ ছাড়ুন!"

"না। তবে আমার অসুখের দিকের কথাটা তুমিই ভাব।"

"যে পরের সুখের দিকে এতখানি অন্ধ, তার সুখ-অসুখে পরেরও যায় আসে না। পথ ছাড়ুন, যাই আমি।"

চকিতে রেবার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া অনিল বিহ্বল ভাবে বলিল, "আর একটু, আর একটু দাঁড়াও। সত্যিই, সত্যিই তবে আমি এখানেও অন্ধ? সত্যি তবে এতে তোমারও কিছু সুখের আছে? বলো রেবা, মুখ ফুটে এ কথাটা একটু বলো।"

রেবা নিঃশব্দে কেবল যেন কাঁপিতে লাগিল। অনিল তাহার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া যেন স্বপ্নাভিভূত ভাবে বলিল, "তবে জগৎ আমায় যা ইচ্ছা বলুক, তাতে দুঃখ নাই, তুমি তো আমায় আত্মসুখসর্ব্বস্ব বলতে পারবে না! তুমিও তো স্বীকার করছ।"

সহসা অনিল ও রেবা একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল। কোথা হইতে শ্যামলী ছুটিয়া আসিয়া একেবারে অনিলের পিঠের উপর যেন আছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাছে সে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে অনিল ত্রস্তে তাহাকে নিজের পশ্চাৎ হইতেই কৌশলের সহিত ধরিয়া ফেলিয়া নিজে তাহার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া দেখিল, শ্যামলী একেবারে যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শরীরে অত্যন্ত কম্পন,—মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ, চক্ষু নিমীলিত। অনিলের হস্তচ্যুত হইয়া সে পড়িয়া যায় দেখিয়া রেবাও তাহার সেই অবশ দেহের এলায়িত অংশটা ধরিয়া ফেলিল।

দুইজনে তাহাকে বিছানায় লইয়া গিয়া শোওয়াইয়া যথোচিত সেবা করিতে লাগিল। এইবার অনিল বলিল, "এই ভয়ই করেছিলাম। ওদের আনায় সুফলের চেয়ে কুফলই ফললো দেখছি। এই ধাক্কায় আবার সেই মূর্ছাটা না দেখা দেয়।"

রেবা নিঃশব্দেই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে শ্যামলী চোখ মেলিয়া চাহিতেই অনিল তাহার মুখের নিকটে সরিয়া বসিয়া তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। স্বামীর মুখের দিকে দু-একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই শ্যামলী যেন চঞ্চল ভাবে ঘাড় তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি ফিরাইয়া অনিলও চাহিয়া দেখিল—রেবা নিঃশব্দে কখন্ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘরে কেহই নাই।

শ্যামলী তখন একটু শান্ত মুখে অনিলের ক্রোড়ের উপর মাথাটা তুলিয়া দিয়া তাহার একটা হাত নিজের দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চোখ বুজিল। অনিল আর একটা হাতে নিঃশব্দে তাহার বিশৃঙ্খল চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

দুইদিন অনবরত শ্যামলীর নিকটে থাকিয়া এবং আপনার আন্তরিক স্নেহে অনিল ক্রমে শ্যামলীর এই আকস্মিক মনোবিপ্লবকে সংযত করিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহার মনে হইল। শ্যামলীর এই যে মাঝে মাঝে ভাবের বিদ্রোহ, ইহার যে কোন বলবৎ কারণ আছে—তাহা অনিলের মনে হয় নাই। বার কয়েকই অনিল শ্যামলীকে বিনা কারণে এইরূপ সহসা রুষ্ট হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু আবার অনিলের আদরে যে একটু পরেই তাহা সে ভুলিয়াও গিয়াছে। যে অৰ্দ্ধমনুষ্য, তাহার যে কোন সামান্য মনোভাবও প্রকাশের কোন উপায় নাই এবং অৰ্দ্ধমাত্রিক ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা যে জগতের বার্ত্তার আধখানা মাত্রই অনুভব করে, সে বুঝি এমনি হইয়া থাকে। অল্পমাত্র কারণেই তাই শ্যামলী রাগিয়া উঠে এবং সে রাগও আবার তেমনি দপ্ করিয়াই নিভিয়া যায়। শ্যামলীর মনের অল্পস্বল্প খুঁতখুঁতানিই প্রকাশের ভাষার অভাবে মনের মধ্যে জড় হইয়া উঠিয়া ক্রমে এইভাবে প্রকাশ পায়, ইহাই অনিলের বিশ্বাস। সে খুঁতখুঁতটাও যে অনিলের অধিকক্ষণ অদর্শনেই জন্মে, তাহাও অনিল লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে। তাই অনিল শ্যামলীর এ দিনের ব্যাপারকেও সেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াই দেখিল এবং একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াই ভাবিল—"হায়!"

এই 'হায়'টার যে কতখানি দূর পর্য্যন্ত বিস্তার, তাহা বুঝি অনিলও ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে চাহে নাই। কেবল একটা "হায়"। সেটার লক্ষ্য যে কে, —শ্যামলী, রেবা, কিম্বা সে নিজে; অথবা তিনজনেই ইহার লক্ষীভূত, তাহাও বুঝি সে ভাবিতে চাহে না। কেবল ভগবান তাহার উপরে যে কর্ত্তব্যের ভার

নিক্ষেপ করিয়াছেন, শ্যামলী হইতে অনিল অনেকখানি উচ্চপদস্থ জীব বলিয়া সে কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি না হয়, এই মাত্রই যে সে ভাবিতে চাহিত। আর ভাবিত, অভাগিনী শ্যামলী তাহার স্ত্রী, আবার অনিলকে সে কি উন্মাদভাবে ভালোবাসে! এই তিনটির বেশী অনিল আর কিছু যে ভাবিতেও চাহে না।

ভাবিতে তো সে চাহে না, কিন্তু জগতে ভাবিব না বলিলেই যদি সকল ভাবনার নিবারণ হইত, তাহা হইলে তো গোলই মিটিত। বরং যেখানে যত বাধা, সেইখানেই এ ভাবনার উৎপাতটা কিছু বেশী। এতদিন অনিলের মানসিক রাজ্যে বা বাহিরেও এমন কোন বাধা ছিল না, যাহাতে তাহার কোন চিন্তা বা ইচ্ছা কোন কিছুর আঘাত পায়। সেইজন্যই বোধ হয়, সে চিন্তাগুলাও এতদিন সংযত ভাবেই অনিলের অন্তরে বিচরণ করিয়াছে। কিন্তু এখন সম্মুখে কি যেন একটা আসিতেছে, যাহার মূর্ত্তিটা ঠিক চিনিতে না পারিলেও অনিল আপনার অজ্ঞাতেই অন্তরে অন্তরে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। রেবাকে আর নিজের নিকট হইতেও বাদ দিবার যে উপায় নাই, তাহা অনিল আবার নূতন করিয়া গভীরতর ভাবেই অনুভব করিল এবং রেবাকেও একটু যেন বুঝাইতে চাহিল। কিন্তু রেবা বুঝিল কিনা, তাহাই যে অনিল এখন বুঝিতে পারিতেছিল না। সে দিন অনিল রেবাকে তাহাদের এই নিকৃষ্টতর পরিচর্য্যায় এমন করিয়া জীবন কাটাইতে বাধা দিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে রেবা যে কাণ্ড করিল, তাহাতে ব্যগ্র হইয়া, ব্যথিত হইয়া, অনিল আবার রেবার ইচ্ছার অনুরূপ পথে চলিতেই তো অনুমোদন করিয়াছে। কিন্তু তবুও সেদিনের শেষ কথাগুলা তেমন যেন সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। শ্যামলী আসিয়া সেই ভাবে তাহার পিঠের উপর আছড়াইয়া পড়ায় উভয়েই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনিলের সঙ্গে খানিকটা শ্যামলীর সেবা করিয়া রেবা সেই যে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে, এই দুইদিনে আর তো সে একবারও অনিলের সম্মুখে আসিল না। সে দিনের কথার শেষে সে কি সঞ্চয় করিয়া লইয়া গেল, তাহা যে অনিলের

জানিবার দরকার হইতেছে ; কিন্তু রেবা তো আর আসে না। তাহার হাতের কাজ চারিদিকে পড়িয়া যেন তাহারই প্রতীক্ষায় অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে ; অপরাধী ভাবে অনিল একবার সেগুলার দিকে, একবার দ্বারের পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু কখনো ঝি, কখনো বালক বিপিন ছাড়া রেবা আর অনিলের দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়ায় না।

রেবা তবে কি বুঝিল ? অনিল বারণ করিয়াছে, দুঃখিত ও লজ্জিত হইতেছে দেখিয়াই কি রেবা আজ সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল ? সে যে একবার কতখানি ব্যথা পাইয়াছিল, তাহা তো অনিল দেখিয়াছে ! স্বেচ্ছায় কি সে এমন করিয়াও অনিলের সঙ্গে—এই পর্য্যন্ত ভাবিতে গিয়াই অনিলের হাতের পায়ের তলা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। অনিল সজোরে নিজের মনকে যেন মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিবার জন্যই শ্যামলীর আলুলায়িত চুলগুলাকে মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিল। শ্যামলী তখন শুইয়া শুইয়া নিবিষ্ট মনে কি একটা ছবি দেখিতেছিল। স্বামীর এই আদরে একটু হাসিয়া, একটু কৃত্রিম রাগের রেখা মুখে আনিয়া সভ্রূভঙ্গে জানাইল, "উঃ—আমার লাগছে যে, চুল টান্‌ছ কেন ?" অনিল অপ্রতিভভাবে ছাড়িয়া দিলে উন্মাদিনী আবার তখনি হাসিয়া ছবি ফেলিয়া অনিলেরই কোলে মুখ লুকাইল এবং চুলগুলা তাহার ক্রোড়ের উপরে ও পায়ের উপরে ঘষিয়া ঘষিয়া জানাইয়া দিল—এগুলার এই একমাত্র সার্থকতা। অনিল বুঝিল। এই নির্ব্বাক ও একটা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়হারা প্রাণীর অন্তরের এই নিবেদনে আবার আজ তাহার চোখে দেখিতে দেখিতে একটা অশ্রুকণা সঞ্চিত হইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত একটু নিশ্বাসে সেই 'হায়' শব্দ আবার ফুটিয়া উঠিল।

রেবার দিকে অতখানি অগ্রসর হইয়াও যে অনিল আবার নিজেকে সংযত করিয়া লইতে পারিয়াছিল,—কর্ত্তব্যের উপরেও শ্যামলীর এই উগ্র ভালবাসাও তাহার একটা মুখ্য কারণ। তবুও রেবাকে দেখিলেই কিছুদিন পর্য্যন্ত অনিলের

অন্তর বিচলিত ও বিকল হইয়া পড়িত। নিজের মনের সে ব্যথাকাতর এবং লজ্জিত ভাবকে অনিল প্রশ্রয় দিতে চাহিত না। অনিল রেবাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে, যেদিন চিরসংযত রেবা অনিলেরই আঘাতে বিবশা হইয়া তাহার পায়ের তলায় পড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে দিনের কথাও কি শ্যামলীকে আনার পর কখনো অনিলের মনে হইত না? হইত, এবং তাহাতেও অনিলের ভিতরটা এমনি করিয়াই কাঁপিয়া উঠিত, হাত পায়ের তলা এমনি করিয়াই শীতল হইয়া যাইত, নিশ্বাস যেন পড়িতে চাহিত না। অনিল তখন চাহিয়া দেখিত, সম্মুখে শ্যামলী! কি ক্ষুধিত ভালোবাসায় সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে! এই ভালোবাসায় এই অর্দ্ধোন্মাদ নিজের জীবনই যে দিতে বসিয়াছিল! অভাগিনী, হায় অভাগিনী। তুই নিজেও জানিস্ না, জগতের কতখানিতে তুই বঞ্চিত। অনিল মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া সহানুভূতিমাখা স্নেহে শ্যামলীকে নিকটে টানিয়া লইত।

রেবার উপর যে অন্যায় হইয়া গেছে, তাহাতে তো অনিলেরও হাত ছিল না। পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা যেন বিধাতার হাতেই নিষ্পাদিত ব্যাপার। ইচ্ছা করিয়া কেহই কিছু করে নাই। না অনিল, না রেবা, না তাহাদের মাতা! কিন্তু এ দিনের এই কাজটা, অকারণে রেবাকে এই ব্যথা দেওয়া, ইহার ফলটি যে অনিল কোন মতেই মন হইতে সরাইতে পারিতেছিল না। রেবা তো শ্যামলীর প্রথম আবির্ভাবে আপনিই দূরে সরিয়া ছিল। অনিলই তাহার এ নিঃসম্পর্কীয় ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে নিজেদের নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছিল। আজ আবার কি এক তুচ্ছ লজ্জায়, সৌখীন বেদনায় রেবাকে এমন ব্যথা দিয়া ফেলিল যে, রেবা সে কষ্ট বুঝি ভুলিতে পারিল না। তাই অনিল বলিলেও আর সে আসিল না। এই যে তাহার দূরে যাওয়া, সেই যে তাহার ব্যথিত মুখচ্ছবি, ইহার কাছে অনিলের সে লজ্জার ব্যথা কত তুচ্ছ, কত না লঘু! রেবার সেই আহত নীল মুখের স্মৃতি আজ অনিলকে ভাল

করিয়াই বুঝাইয়া দিতেছিল,—রেবাকে নিজের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ লইয়া অন্তরের দ্বারাও স্পর্শ করিতে গিয়া অনিল নির্দ্দয়তা ও মূর্খত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।

দিন দুই পরে অনিল সংসারের কাজের মধ্যে এখানে সেখানে দিনান্তে দুই-একবার রেবাকে দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু রেবা অত্যাবশ্যকীয় সামান্য দু-একটি কথা ছাড়া অনিলের সহিত কথাও কহিল না বা তাহার মুখের ভাবের কোন বৈলক্ষণ্যও অনিল বুঝিতে পারিল না। যেন কিছুই হয় নাই! সে কি তবে ইচ্ছা করিয়াই এমন দূরে থাকিতেছে? তবে কেন সেদিন সে ও-রকম ভাব প্রকাশ করিয়াছিল? অনিলের সে অনুরোধ যে সে মানিয়া চলিবে, এমন স্বীকার তো সে করে নহে। বরং অনিলের এই অযাচিত অনুগ্রহে ব্যথিত হইয়া বিদ্রোহী ভাবেই বলিয়াছে, যখন আমার সুখের দিকটা বুঝিতে পার না, তখন তোমার কথাও আমি শুনিতে চাহি না। আর আজ সেই রেবা এমনি ভাবেই তাহার কর্ত্তব্য করিয়া চলিল যে, মুখে একটু ব্যথার দাগও নাই। অনিল যাহা রেবার কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল, কাজে রেবা তাহার অনেক বেশীই করিতেছে না কি? এতখানিই কি অনিল চাহিয়াছিল? আর এই ঔদাসীন্য? এমন করিয়া সব ছাড়িতে তবে কি রেবার একটুও ব্যথা লাগিতেছে না? সেদিন তো লাগিয়াছিল। আর হুকুমেই কি অমনি মনের যত যা কিছু সব যথাকর্ত্তব্যভাবে চলিতে থাকে? কৈ, অনিল তো তাহা পারিতেছে না। তাহার মন তো নিজের হুকুম কিছুই মানিতেছে না।

তবে সেই রেবা আজ কি করিয়া এমন অম্লান মুখে অনিলের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছে। মানুষ পারে অবশ্য সবই,—কিন্তু তা কি রেবার মত এমনি কঠিন উদাসীন ভাবে? না, সাধ্য নাই! রেব'র এই ঔদাসীন্য অনিলেব এটুকুও সহিবার যে সাধ্য নাই, তাহা সে ক্রমে ভালো করিয়াই বুঝিল।

কিন্তু রেবার সহিত যখন অনিলের পুনর্ব্বার দেখা হইল, তখন মনের বহুবার

কথিত কথাগুলির একটি শব্দও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। উপরন্তু রেবার কর্ম্মরত শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি তাহাকে একটা সঙ্কোচই আনিয়া দিল! তাহার মনের এই কথাগুলি যদি রেবা জানিতে পারে, না জানি সে কি ভাবিবে! অনিল এত অসার—এমন আত্মসুখপ্রয়াসী দেখিলে সে ঘৃণাই করিবে না কি? না—আর না, রেবা স্ব-ইচ্ছায় যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাই তবে করুক। কিন্তু তবুও যে মনের "কিন্তু" লোপ পায় না।

অনিল নিজের মনের সঙ্গে এইসব দ্বন্দ্বগুলার মীমাংসা করিতে করিতে সহসা এক সময়ে চাহিয়া দেখিল, রেবা নিজ কার্য্য সারিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়! তখন সমস্ত মীমাংসার শেষের সেই 'কিন্তু'টুকুই তাহাকে মুহূর্ত্তে বিচলিত করিয়া রেবার যাইবার পথে বাধা দিয়া দাঁড়াইল: "রেবা, সে দিনের কথা-গুলোর তো সেদিন শেষ হতে পায়নি। আজ সেটুকু শেষ করবে কি?"

রেবা যেন একটু অস্বাভাবিক ভাবে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু এমন সঙ্কোচের সহিত যে, অনিলের বিস্ময় যেন মাত্রা অতিক্রম করিল। এই দুই-দিনে রেবা এতই পরের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে? আজ রেবার এ সঙ্কোচটুকুও অনিলের নিকট যেন ব্যথার মতই বাজিল।

রেবা একটু ত্রস্তস্বরে—"শেষ হয়েছিল বৈ কি—আপনার তবে মনে নেই।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকুমাত্র দিয়া এক পাশ দিয়া চলিয়া যায়,—কিন্তু অনিলের সেই সহসা আঘাতপ্রাপ্ত বিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অজ্ঞাতে তাহার পা যে কখন্ নিজের গতিরোধ করিয়া ফেলিল, তাহা সে নিজেই জানিতে পারিল না।

এ আঘাতটুকু নিঃশব্দে হজম করিয়া অনিল রেবার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "শেষ হয়েছিল? কৈ, না! কি তুমি স্থির করলে, তা তো আমি শেষ বুঝতে পারিনি!"

রেবা একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "আপনি যা বলেছিলেন,

সেইটাই ঠিক, শেষে এই স্থির হয়েছিল।"

"তাই কি?—বরং উল্টোই যে আমার ধারণা হ'ল। তুমিই না বলেছিলে যে—"

একটু বেগের সহিতই অনিলের কথায় বাধা দিয়া রেবা বলিল, "সে যাই হোক,—শেষে বুঝলাম, আপনার কথাটাই ঠিক।"

নিজের কথাটা প্রমাণিত হইয়া গেলে যেটুকু আত্মশ্লাঘা আসে, রেবার এ কথাতে তো অনিল সে গর্ব্বটুকুব কোনই সন্ধান পাইল না, বরং তেমনই ব্যথিত বিবর্ণ মুখেই উত্তর করিল, "আমার কথাই ঠিক? তা হ'লে কি তোমার কথাগুলো একেবারেই মিথ্যা?"

"আমার কথা? হ্যাঁ, মিথ্যাই সেগুলো—"

অগ্রসর হইযা দাঁড়াইয়া অনিল বলিল, "আজ তা যে তোমার কাছে একেবারেই মিথ্যা হযে দাঁড়িয়েছে, তা আমিও বুঝেছি, কিন্তু এইটুকু মাত্র জানতে চাই যে—কেন আমার এ প্রস্তাব কবার পরেও যে-কথা তোমার কাছে অতখানি সত্য ছিল—যাতে আমাকেও—যাক্ সে কথা—কিন্তু এই দুদিনে তা এতখানি মিথ্যা কিসে হ'ল—কেন হ'ল—সেটুকুও কি আমি জানতে পাব না?"

রেবা অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল, "আমার যা বলবার ছিল, আপনাকে বলেছি।"

"আর কি তবে কিছুই বলবার নেই রেবা?"

"না।"

স্তব্ধ অনিলের অনুভবের বাহির দিয়া কতটা সময় বহিয়া গিয়াছে, তাহা অনিল জানিতে পারে নাই, সহসা রেবার আর্ত্ত-ক্রন্দনে সে চমকিয়া চাহিল।

"দেখুন আবার কি হ'ল,—কেন আপনি আমার সঙ্গে কথা কইতে আসেন—কেন—কেন? সেদিনও কি আপনি বুঝতে পারেন নি? অন্ধ—আপনি

একেবারে অন্ধ। দেখুন—একে।"

অনিলের পায়ের কাছে শ্যামলীর অচেতন দেহটা নামাইয়া দিয়া দুইহাতে আঁচলে মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে রেবা সেখান হইতে চলিয়া গেল। অনিল যেন বজ্রাহতভাবে শ্যামলীর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।

২৮

শ্যামলীর সম্বন্ধে এ কথাটাকে যেন অনিলের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। এও কি সম্ভব? এই অর্দ্ধমনুষ্য জীবটি, যাহাকে এতদিন উন্মাদ জড় বলিয়াই সকলে জানিত, অনিলও যাহাকে এতদিন পূর্ণ নারী বলিয়া অনুভব করিতে পারে নাই, যাহার বুদ্ধি, স্নেহ, ভালোবাসা রাগ বা দুঃখ সমস্ত একেবারে এতদিন বালকের মতই ছিল, সেই শ্যামলীতে নারীত্বের এই নিকৃষ্ট অংশটি সহসা এমনই ভাবে কি ফুটিতে পারে? সে হিংসা করিতেছে? সেও কাহার উপর? না যে তাহাদের সংসারের সকলেরই মাত্র সুখস্বাচ্ছন্দ্য দাত্রী-রূপে সে সংসারে অবস্থান করিতেছে, যে কেবল সকলকে প্রচুর ভাবে দিয়াই যাইতেছে,—কাহারও নিকট হইতে কিছু পাইবার যাহার প্রয়োজন নাই—সেই রেবার উপরই শ্যামলীর এই ঈর্ষা? এও কি সম্ভব? এই রেবা নহিলে যে শ্যামলীরও এতদিন একদণ্ড চলিত না। অশন, বসন, শয়ন সকল বিষয়েই যে শ্যামলীকেও এ সংসারের সকলের মত রেবার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতে হইত! সেই শ্যামলী সহসা রেবার উপর এমন বিদ্বিষ্টা কিসে হইল, যাহাতে রেবা অনিলকে বলিতে বাধ্য হইল, "আপনি কেন আমার সঙ্গে কথা কন্—কেন আসেন—আপনি কি বুঝতে পারেন না?" সত্যই অনিল যে এখনও নারীচরিত্রের এ রহস্যকে বুঝিয়া

উঠিতে পারিতেছে না! কি লইয়া কিসের জন্ত শ্যামলীর এ ঈর্ষা? রেবার সহিত অনিলের কতটুকু সম্পর্ক? শ্যামলীর এই ব্যাপারে রেবা না জানি কতখানি বেদনাই পাইয়াছে! আঃ—এ কি অচিন্তনীয় ঘটনা! তাও আবার কিনা শ্যামলীর মত জীবের দ্বারা রেবার উপরে এই আক্রমণ? ছিঃ ছিঃ—রেবা, কি-ই না-জানি ভাবিতেছে! অনিলের দ্বারা রেবার কোন অপমানেরই আর বাকি রহিল না!

ভাবিতে ভাবিতে অনিলের দৃষ্টি একেবার নত হইতেই দেখিল, শ্যামলী তাহার কোলের কাছে পড়িয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সেই বিবর্ণ মুখে বিস্ফারিত চক্ষে বেদনার নীল ছায়া এমনি গাঢ় হইয়া উঠিতেছে যে, সেদিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র অনিলের চিন্তার গতি সহসা থমকিয়া গেল। অনিল যে কি ভাবিতেছে, কাহার ব্যথার চিন্তায় অনিলের সমস্ত বুক জুড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন শ্যামলীর অবিদিত নাই। এই অৰ্দ্ধমনুষ্য শ্যামলী, পশুর মতই যাহার মনোবৃত্তি, আপনার প্রকৃতির উপরে যে বিন্দুমাত্রও বিচারশক্তি লাভ করে নাই, তাহার এই বিকারে অনিলের এতখানি বিচলিত হওয়াই কি উচিত? সে যদি, সৰ্ব্ববোধসম্পন্ন প্রকৃত মনুষ্য হইত, তাহা হইলে কি এমন হইত? যদিই তাহার কিছু মনে আসিত—বিচারশক্তির দ্বারা নিশ্চয় তাহাকে সে দমন করিয়া লইত। কিন্তু সেটুকু হইতে ভগবানই যে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন!—তাহার তবে অপরাধ কি? একটা ভ্রান্ত ধারণা তাহাকে একবার পাইয়া বসিলে বুদ্ধির বলে সে ভাবের হাত হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমতা কি তাহার আছে? আর ভ্রান্ত ধারণা! সত্যই কি শ্যামলী এ বিষয়ে পশু-প্রকৃতির বশেই চলিতেছে? ইহার মধ্যে সত্য কি কিছুই নাই? এই যে অনিল শ্যামলীর এই ব্যাপারে মৰ্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অনিলের সে চিন্তা বা ব্যথা কাহার বিষয়ে? কাহার বেদনার ও লজ্জার আশঙ্কা অনিলকে এমন অভি-ভূত করিয়া ফেলিয়াছে? এই অৰ্দ্ধমূৰ্চ্ছিতা শ্যামলীর জন্যই কি? তাহা তো

নয়। তবে কেন অনিলের এত বিস্ময়? শ্যামলীর এই ব্যবহারে এত অসঙ্গতি-বোধ? শ্যামলীরই না হয় বিচারশক্তি নাই, কিন্তু অনিলেরও কি নিজের পক্ষের বিচার ঠিক হইতেছে? নিজের মনকেও অনিল কি ক্রমশঃ নিজের কাছে গোপন করিয়া চলিতেছে না? যে সন্দেহে শ্যামলী এত অধীরা হইয়া পড়িয়াছে, সে কি এতই মিথ্যা? সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন অনিল নিজের অন্তরের যে গূঢ় কথাটি নিজে লক্ষ্য করে নাই বা নিজের কাছেও গোপন করিয়া চলিতেছে, সে কথাটি তো এই অর্দ্ধেন্দ্রিয়ের বোধপ্রাপ্তা অসম্পূর্ণা নারী শ্যামলীর অবিদিত নাই। তবে কি বলিয়া তাহাকে অনিল দোষী করিতে চায়? তাহার অন্যায় কোথায়? শ্যামলীর না হয় রেবার পার্শ্বে দাঁড়াইবার অধিকার নাই, বিধাতা তাহাকে সাধারণ নারী অপেক্ষাও অনেকখানি হীন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য—কিন্তু এখানেও কি একথা বলা চলে? সেই ইন্দ্রিয়াঙ্গহীনা নারীকে এ অধিকার যে অনিল স্বেচ্ছায়ই দিয়াছে! অনিলের মত ব্যক্তিকেও একান্ত নিজের স্বামী বলিয়া জানিবার—পাইবার দাবী যে সেই অনুপযুক্তা স্ত্রীকে অনিলই দিয়া রাখিয়াছে। তবে কেন সে তাহা চাহিবে না? তাহার ব্যতিক্রমে কেন সে অধীর হইবে না? এ দাবী যে তাহার পশুপ্রকৃতিরই পরিচায়ক, এ কথা ভাবাও কি ঠিক? এই ঈর্ষা, নারীত্বের এই রহস্য, এ যে বিধাতারই নিজহস্তে দত্ত নারীজীবনের অভিশাপ!—ইহা হইতে কোন নারী মুক্ত? যে ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে, সে বুঝি মানবীত্বেরও একটু উপরে উঠিয়াছে। সে কি এই শ্যামলীতেও সম্ভব? বরং যে অনুভবে শ্যামলী অনিলের এই অন্তরের কথা,—যাহা বুঝি অনিলেরও অজ্ঞাতে অনিলের অন্তরে লুকাইয়া বাস করিতেছিল, তাহাও যাহাতে এমন করিয়া বুঝিয়া লইতে পারে, শ্যামলীর সেই অনুভবের কথা ভাবিলেই আশ্চর্য্য হইতে হয়! অপরের অন্তর-দর্শী এই অনুভব, এ তো নারী সহজে পায় না। যেখানে আপনার অন্তরকে সে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে, নারীত্বের সেই পূর্ণ বিকাশ—ভালোবাসিবার

সেই প্রচণ্ডশক্তি না লাভ করিলে নারী তো তাহার প্রেমপাত্রের অন্তর সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। সে অন্তরকে তো এমন দর্পণের মত দেখিতে পায় না। শ্যামলী যে আর সেই জড়বুদ্ধিসম্পন্না অর্দ্ধোন্মাদ জীব নাই, সাধারণ নারী-পদবীতেই যে সে এখন দাঁড়াইয়াছে, এ ঘটনা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনিল ধীরে ধীরে শ্যামলীর মাথাটা নিজের কোলের উপরে তুলিয়া লইল। হায় অভাগিনী! তোমার এই জাগরণের প্রতীক্ষাতেই যে অনিল বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছিল, তখন কেন অনিলকে বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলে? তোমার সম্বন্ধে সে হতাশ্বাস হইয়াই না ক্রমে জীবনের অন্যপথ খুঁজিতে চলিয়াছিল? আজ তোমার এ ভাবান্তর, এতে বুঝি তোমারও যত যন্ত্রণা, অনিলেরও তত! এর বেশী আর কাহারো কথা অনিলের তো ভাবিবারই অধিকার নাই।

অনিল ধীরে ধীরে শ্যামলীর কপালে হাত দিতেই শ্যামলী আবার মুখ তুলিয়া অনিলের মুখের পানে, চোখের পানে চাহিল। স্বামীর সেই মুখ চোখে সে কি দেখিল, কি পাইল—সেই জানে, কিন্তু ঘুরিয়া তাহার মাথাটা অনিলের কোলের উপর হইতে পায়ের উপর গিয়া পড়িল। সেইখানেই সে-মাথাটা বার বার লুটাইয়া শ্যামলী যে কি অব্যক্ত রোদনে নিজের এই ব্যথাটিকে স্বামীর নিকটে নিবেদন করিতে লাগিল, তাহা অনিলেরও বুঝিতে বাকী রহিল না। নিস্তব্ধ অনিল কেবল তাহার মাথার উপরে হাত রাখিয়া মূকের মত বসিয়া রহিল। শ্যামলীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সামান্য একটু অঙ্গসঞ্চালনেরও যেন আর তাহার ক্ষমতা রহিল না।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমে শ্যামলী শান্ত হইয়া চোখ মুখ মুছিয়া যেন একটু সলজ্জভাবে উঠিয়া বসিল। তখনো অনিল ম্লান নত দৃষ্টিতে এক ভাবেই বসিয়া আছে দেখিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া অন্য দিকে

লইয়া গিয়া তাহাকে অন্যমনা করিবার জন্ত একখানা ছবির বই, কতকগুলা ফুল, ফল পাখী আনিয়া ফেলিয়া স্বামীর চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। তাহাতেও অনিলের বিমনা ভাব ঘুচিল না। তখন সহসা দুই চোখে একরাশ জল পুরিয়া শ্যামলী স্বামীর সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া জোড় হাতে স্বামীর মুখের পানে চাহিল। অব্যক্ত কণ্ঠে সে যেন বলিতে চাহিল, "ওগো, আমায় ক্ষমা কর! আমি নির্ব্বোধ, আমি পশু, তবু তোমায় যে আমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে। জানো ত, আমি কত নিরুপায়, কত অক্ষম। তুমি ছাড়া আমার ব্যথা আর কে বুঝিবে?" অনিল তাহার এই অব্যক্ত ভাষা বুঝিল। অনুতাপ ও করুণায় বিগলিত হইয়া স্ত্রীকে তখন সে নিকটে টানিয়া লইয়া তাহার যোজিত হস্ত খুলিয়া দিয়া কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তখনো শ্যামলী শান্ত হইল না। উদ্বিগ্ন নেত্র স্বামীর পানে স্থির রাখিয়া দীন দৃষ্টিতে যেন তাহাকে বলিতে লাগিল—"যদি ক্ষমা করিলে, তবে অমন করিয়া কেন রহিয়াছ? কেন হাসিতেছ না,—মুখ কেন অমন হইয়া রহিয়াছে? তবে কি এখনো ক্ষমা কর নাই?" অবোধের এই দীনতার দায়ে অগত্যা অনিল জোর করিয়া মুখে হাসি আনিল এবং তাহার কাকাতুয়াটাকে একটু আদর করিয়া, ছবির বইখানার পাতা উল্টাইয়া শ্যামলীকেও ক্রমে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। শ্যামলী তখন অনিল তাহাকে যে যে বস্তু কয়টির নামের সহিত বহু চেষ্টায় পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল, সেই সেই দ্রব্যগুলির নাম উচ্চারণের ইচ্ছায় শিশুর মত উৎসাহের সহিত পুনঃ পুনঃ মুখ নাড়িতে লাগিল ও হস্ত দ্বারা তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিল। অনিলকে তাহার প্রফুল্ল করিবার এই দীন চেষ্টায় অনিল শ্যামলীর উপরে করুণায় দ্বিগুণ আর্দ্র হইয়া পড়িল।

অনিল বুঝিল, রেবাকে তাহাদের মধ্যে হইতে একেবারে বাদ দিয়াই ফেলিতে হইবে। তাহার সহিত আর একটুও সম্বন্ধ রাখা অনিলের চলিবে না। চলিলে এই উন্মাদিনী এক-একদিন এক-একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে এবং

তাহাতে রেবার ও অনিলের পক্ষেও লজ্জার সীমা থাকিবে না। রেবা যাহা করিতেছে, ইহাই একমাত্র পথ। তাহাকেও এই পথেই চলিতে হইবে। সে অন্ধই বটে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আগাগোড়াই সে নিজের অন্ধত্বের পরিচয় দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আর নয়! এখন সম্মুখে যে নবীন পথ উন্মুক্ত হইল, এ পথ হয়ত অনিলকে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের নিকটও পৌছাইয়া দিবে। শ্যামলীরও মানসিক অবস্থা এখন এমন স্থানে দাঁড়াইয়াছে যে, অনিল তাহার দিকে বেশী মনোযোগ দিলে সেই সুখে হয়ত সে যাহা তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব, তাহাও ক্রমে সম্ভব করিয়া তুলিবে, নিজের শিক্ষার বিষয়ে নিজেও সে মনের সঙ্গেই সচেষ্ট হইবে।

শ্যামলীকে নিজের কাছে আনিয়া প্রথম প্রথম অনিল যেমন একান্তভাবে তাহার শিক্ষার বিষয়ে নিজের অখণ্ড মনোযোগকে নিযুক্ত করিয়াছিল, তেমনি করিয়া এখনো সে আবার নিজেকে নিয়োজিত করিতে চাহিল, কিন্তু দুই দিনের চেষ্টার পরই সহসা একদিন সচকিত হইয়া নিজের :সেই অটুট শক্তির অচিন্তনীয় ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

তেমনভাবে শ্যামলীর বিষয়ে মনঃসংযোগ কবিতে আর তো তাহার সাধ্য নাই। পূর্ব্বের চেয়ে কাজ এখন অনেক সহজ হইয়াছে, সংসারের অভিজ্ঞতাও শ্যামলীর অনেকটা বাড়িয়াছে—শিখিবাব জন্যও সে একান্ত উন্মুখ, গোটাকয়েক শব্দও সে এখন অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু এত সুযোগেও অনিল নিজের মনের দুর্য্যোগ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। নাই, পূর্ব্বের সে অধ্যবসায় আর তাহার নাই। শ্যামলীর উপরে তাহার করুণা বা স্নেহের অভাব নাই, তাহার শিক্ষার জন্যও মন ইচ্ছুক, কিন্তু সহসা এমনভাবে তাহার সর্ব্বশক্তি কে হরণ করিল, কেন সে এই দুই দিনেই শ্যামলীর সঙ্গে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে! আরব্ধ কার্য্যের মাঝখানে মন যে কখন্ সেস্থান হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তাহা অনিল জানিতেও পারিতেছে না। এক সময়ে হঠাৎ

সচকিত হইয়া উঠিয়া দেখিতেছে, কোথায় বা তাহার কাজ, কোথায় বা তাহার মন, মাঝখানে শ্যামলী কখ:না ম্লান বিষণ্ন মুখে, কখনো জলভরা চোখে তাহার পানে চাহিয়া আছে মাত্র।

রেবা আর সেদিকে মোটেই আসে না। অনিলও আর তাহা ইচ্ছা করে না, কিন্তু নিজে সে তবে কিসের জন্য যে তাহাদের ঘর ছাড়িয়া হঠাৎ একসময়ে বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হঠাৎ এক একবার বিদ্রোহীর মত ছুটিয়া মাতার ঘরে গিয়া তাঁহার কোলে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়ে। মাতা প্রশ্ন মাত্র করেন না, কেবল নিঃশব্দে পুত্রটির মাথায় হাত বুলাইতে থাকেন। ছেলের জন্য দুঃখ অথবা গর্ব্ব কি যে তাঁহার করিবার আছে, তাহা তিনিও সব সময়ে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। রেবা ক্বচিৎ কোনদিন সহসা সে ঘরে ঢুকিয়া পড়ে এবং নিজের কাজ সারিয়া আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়,—অনিলও কিছু বলে না, সেও কথা কহে না। মাতা কিছু বুঝিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না—কিন্তু দুজনকেই কোন প্রশ্নই তিনি করিতেন না। সহসা একদিন তিনি জানিলেন, অনিল শ্যামলীকে লইয়া দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

অন্য কোন ভণিতা না করিয়া তিনি পুত্রকে একেবারে প্রশ্ন করিলেন, "আমরা কি তোর কাজের কোন ক্ষতি করছি অনিল?"

অনিল চম্‌কিয়া উঠিল, "ক্ষতি, না মা, ক্ষতি কিসের?"

"তবে কেন বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিস্?"

অনিল মাথা নামাইল। মাতাকে মিথ্যা স্তোকে ভুলাইতে তো তাহার সাধ্য নাই। মাতা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আমার অনেক সাধের পাতা এ সংসার অনিল, তবু তুই ছাড়া এর কোনই মূল্য নেই জানিস্। তুই ব্যস্ত হস্‌নে, আমি এইবার কাশীবাস করতে চাই। আমি আর রেবা দুজনেই যাব। কোন্ দিনই তো এ চেয়েছিলাম, ঐ হতভাগীই তা কিছুতে করতে দেয়নি।"

অনিল নিঃশব্দে রহিল। একটা প্রতিবাদের শব্দও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

হ্যাঁ—তাহাকে দূরে থাকিতেই হইবে। ক্রমশঃ নিজের চাঞ্চল্যে অনিল ভীত হইয়া পড়িতেছিল। অন্তরের মধ্যে এ কি হাহাকার ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতে চায়? শ্যামলীকে পাশে লইয়া তাহার শিক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে সহসা একসময়ে তাহার অন্তর হইতে কে যে একজন বিদ্রোহীর মত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়—তাহা অনিল জানে না। সভ্রূভঙ্গে সে যেন প্রশ্ন করে, "এই কি তোমার জীবনের সার্থকতা? এর বেশী কি আর তোমার জগতে প্রাপ্য কিছু ছিল না? পাইবার কি উপায় নাই?"—কি সে পাইতে চায়—কাহাকে সে জীবনের সার্থকতা নাম দেয়, তাহা ভাবিতে গিয়া অনিল স্তব্ধ হইয়া পড়ে। শুধু কি বিদ্রোহ? অন্তরের এই উন্মাদ বেগকে সে যত না ভয় করে—তাহার এক একদিনের কাতরতাতেই তত বেশী বিচলিত হইয়া উঠে। সে কি ক্রন্দন,—অন্তরের সে কি দুর্নিবার দহন! "দাও ওগো, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে একবার দিনান্তেও দেখিতে দাও,—একটু কিছু পাইতে দাও—আর আমি পারি না!" ইহার হাত হইতে অনিল কি উদ্ধার পাইবে?

রেবার সঙ্গে কোন কোন দিন দিনান্তেও দেখা হয় না—কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়া কি আশায় মন যে নানাস্থানে ছুটিয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই নানা ছল করিতে থাকে, তাহা অনিল ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে। ক্বচিৎ কোন স্থানে রেবাকে দেখিলে তাহার সেই কর্ম্মরত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মন এক এক সময়ে যেন গগনভেদী চীৎকার করিয়া একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে চায়,—"না, —ওগো—না"! এই 'না'র যে কি অর্থ, ক্রমশঃ অনিল বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া পড়িতেছে। তাই সে শ্যামলীকে লইয়া দূরে পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনিল শ্যামলীকে লইয়া বাগানে গিয়াছিল। উদ্দেশ্য—ফুলের সম্বন্ধে তাহার একটু জ্ঞান জন্মানো। নানা জাতীয় ফুল লইয়া এতক্ষণ অনিল তাহাদের বর্ণের পার্থক্য, কোমলত্ব, গন্ধ প্রভৃতির বিষয় ইঙ্গিতে শ্যামলীকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছিল। তাহাদের দুই চারিটির নামও শ্যামলী একটু যেন উচ্চারণ করিতে পারিতেছে। অনিলের সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শব্দ উচ্চারণের সময় মুখের ও ওষ্ঠের যে ভঙ্গী হয়, তাহার অনুকরণ করিয়া করিয়া শ্যামলী এখন অস্পষ্টভাবে কতকগুলা ছোট ছোট শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। ফুল ও পাখী পাইলেই তাহার এ বিষয়ে উৎসাহ বেশী হয়। তাই অনিল তাহাকে বাগানে আনিয়াছে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এখন শ্যামলী স্বামীর কোলে মাথা দিয়া শুইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিল। সহসা তাহার একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দে অন্যমনা অনিল চাহিয়া দেখিল, দুই চোখে কি বিষণ্ণতা ও বেদনা মাখিয়াই শ্যামলী তাহার পানে চাহিয়া আছে! সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকেও তাহার চোখ-মুখের সে দীনতা অনিলকে বুঝাইয়া দিল, স্বামীর অবস্থা অনেকটা সে যেন বুঝিতেছে। সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া অনিল অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তাহাতেও শ্যামলী আর অভিমানে চঞ্চল হইয়া উঠিল না। হয়ত তাহার চোখে একটু জল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ অভিমানের দুঃখে নয়। নিজের কথা ছাড়া অনিলের কথাও সে যেন এখন মাঝে মাঝে ভাবিতেছে। এই যে দীর্ঘশ্বাস, এই যে সহসা সঞ্চিত অশ্রুকণা, এ আজ যেন নিজের জন্য নয়।

স্বামীর মহিমামণ্ডিত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আজ সে দুর্দ্দান্ত পশু যেন আপনা হারাইতেছিল। তাই অনিলের আত্মগোপনের জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরানোয়ও তাহার আজ অভিমান আসিল না। ধীরে ধীরে কোল হইতে মাথাটা পায়ের কাছে নামাইয়া মুখখানায়, ঠোঁটদুটায়, চোখদুটায় পা-খানাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়া শ্যামলী চোখ বুজিল। যেন নিঃশব্দ অজস্র চুম্বনে শ্যামলী তাহার এই দেবতাকে অন্তরের পূজাই নিবেদন করিয়া দিল।

অনিল একভাবে স্তব্ধ হইয়াই বসিয়া রহিল। এই অজস্র রূপ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের মেলার মধ্যে তাহাদের সে আনন্দ অনুভব করিবার মত অবসর না পাইয়া কেবল এই নিকৃষ্টভাবের শিক্ষকতায় নিযুক্ত অনিল যেন আজ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই শ্যামলীর এই নির্ব্বাক বেদনার অভিব্যক্তিতেও সান্ত্বনার স্পর্শ দিতে আজ তাহার সাধ্য হইল না। বহুক্ষণ পরে অনিল অনুভব করিল, শ্যামলী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকের অন্ধকার সেখানে ঘনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতি এতক্ষণ তো নির্ব্বাক নিঃশব্দ ভাবেই অনিলের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ছিল, এখন যেন সেই মৌন মূকত্বের উপরে অন্ধ অন্ধকারের যবনিকা ফেলিয়া দিল। অনিল যেন আর কানেও কিছু শুনিতে পাইবে না। এই বিচিত্র শব্দময়ী প্রকৃতির এই উৎকৃষ্ট বস্তুটি হইতে সে যেন জন্মের মতই বঞ্চিত হইয়াছে। আবার আজ বুঝি অন্ধও হইয়া পড়িল। একটু শব্দ, একটা কথা, কণ্ঠের বীণার একটু মূর্চ্ছনা,—এ নইলে এ মূক জগতে আর যে সে বাস করিতে পারে না। কণ্ঠপথে প্রাণের সেই সাড়া—ইহারই অভাবে অনিলের জগৎকে বুঝি একটা ঘোর অন্ধত্বের অন্ধকারও এমনি করিয়া আসিয়া ছাইয়া ধরিল। যে পথে অনিল চলিয়াছে, সে বুঝি এমনি শব্দহীন, রূপহীন, আলোক-হীন অন্ধগুহার পথ। ইহা হইতে এ জীবনে আর বুঝি তাহার উদ্ধারের উপায় নাই।

সহসা এক সময়ে চমকিত হইয়া অনিল দেখিল, সে নিদ্রিত শ্যামলীকে

ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া আসিয়াছে। ফিরিবার ইচ্ছার পূর্ব্বেই চাহিয়া দেখিল, রেবা তাহার সম্মুখে। বাগানের অন্ধকার অংশ ছাড়িয়া অনিল আলোকের দিকে অজ্ঞাতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল।

রেবা এমন সময়ে এখানে, একা, এ সমস্ত কথা ভাবিবার অনিলের সময় ছিল না। সে কেবল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। জগৎ আলোকহীন অন্ধ গুহা মাত্র নয়। আছে—ইহাতে আলোক, বাতাস, আশা, আনন্দ, মুক্তি—অনেক জিনিসই আছে।

রেবাই প্রথমে কথা কহিল, "আপনি এখানে? আমি আপনাদের কাছেই যাচ্ছিলাম।" তাহাদের কাছে? অনিলেরও কাছে? সহসা রেবার আজ এ পরিবর্ত্তন কেন? কি জন্য সে আজ অনিলকে খুঁজিতেছে? এ সব প্রশ্ন মনে জাগিবার সময়ও তখন অনিলের ছিল না। সে কেবল কানে শুনিতে পাইতেছে, চোখে দেখিতে পাইতেছে, এই অনুভবেই তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রেবা অনিলকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল, "শ্যামলী কই? তার কাছে চলুন। আমার গোটাকতক কথা আছে।"

"সে ঘুমুচ্ছে, এইখানেই বল।" বেশী কথা কহিবার অনিলের তখন সাধ্য নাই।

"না, তার তো শব্দে ঘুম ভাঙবে না,—সেইখানেই চলুন।"

অনিল নিঃশব্দে অগ্রসর হইল—রেবা তাহার পিছনে পিছনে চলিল। নিদ্রিতা শ্যামলীর অদূরে একটি লৌহাসনের উপর বসিয়া পড়িয়া অনিল নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—রেবা তাহাকে কি বলিবে!

"কি অন্ধকার!" অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত অনুভূতা রেবার এই স্বর যেন জগতের অন্য কোন জগৎ হইতে ভাসিয়া আসিল। তাহাতে যেন পুঞ্জীভূত বেদনা—হতাশা ও অশ্রুর জমাট ভাঙ্গিয়া গলিয়া বহিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তে অনিলের শুষ্ক নীরস চক্ষে, বক্ষে, কণ্ঠে, কিসের একটা ঢেউ আসিয়া

আঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। রুদ্ধ কণ্ঠে অনিল বলিল, "হ্যাঁ রেবা, অন্ধকার। কিন্তু তার পরে?"

"বলি।" রেবা যেন একটু দম লইল। কয়েকবার সুস্থভাবে নিশ্বাস ত্যাগের চেষ্টা পাইয়া শেষে অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে বলিল, "শ্যামলী বড্ড ঘুমুচ্ছে তো? জাগাবেন একবার?"

"না, তুমি বল।"

"আপনিই জাগবে হয়ত একটু পরে। মা কাশীবাস করতে যাচ্ছেন শুনেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি তাঁকে যেতে দেবেন?"

অনিল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন? কিসের জন্য তাঁকে তাঁর এই সাধের সাজানো সংসার ছেড়ে—আপনাদের ছেড়ে—কাশীবাস করতে যেতে হবে?"

"আমার জন্য?"

"আপনার জন্য! মিথ্যা কথা। আমি জানি, কার জন্য। কিন্তু এ ছাড়া কি অন্য কোন উপায় নেই?"

"না।"

"আছে, আর তাই-ই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছি। আপনি কি ভুলে গেছেন, আমার আত্মজন এখনো কেউ না কেউ আছেন। আমার আশ্রয়ও আছে।"

আকাশে তখন ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয় হইতেছিল। অনিল একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া রেবা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনি আজকালের মধ্যেই তার ব্যবস্থা করুন। মা যে রকম ব্যস্ততা

লাগিয়েছেন, শীগ্‌গিরই বোধ হচ্ছে বেরিয়ে পড়বেন। আমি তার আগেই যেতে চাই।"

সেই সদ্যোদিত খণ্ডচন্দ্র হইতে চোখ ফিরাইয়া অনিল মূঢ়ের মত রেবার পানে চাহিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কোথায় যেতে চাও রেবা?—কোথায়?"

অনিলের সেই বুদ্ধিহৃত বিহ্বল কণ্ঠে রেবার আপাদমস্তক সহসা একবার কাঁপিয়া উঠিল। অনিলের কণ্ঠস্বর যেন চারিদিকের বাতাসে মিশিয়া সেই একইভাবে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "কোথায়! কোথায়!"

একটু পরে অনেকখানি জোরের সঙ্গে অনেকটা চেষ্টার পরে রেবার কণ্ঠ ভাঙা ভাঙা স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল, "সেখানে বাবা, সাধু জ্যেঠামশায়, কি বুড়ো মহারাজ তিন জনের একজনও নিশ্চয় আছেন। আর বাবা তো আমায় ডেকেই রেখেছেন। ব'লে দিয়েছিলেন, যেদিন—"

সহসা রেবা থামিয়া গেল। অনিলও এতক্ষণে যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "যেদিন সংসার তোমায় আর না চাইবে, সেদিন তোমায় তাঁদের কাছে ফিরে যেতে আদেশ আছে তাঁদের জানি,—কিন্তু রেবা,—মা?—মার কথা কি ভাবছ না?—তিনি যে তোমায় চিরদিনই চাইবেন।"

দ্বিগুণ রুদ্ধ কণ্ঠে রেবা উত্তর দিল, "তাই ব'লে তাঁকে আমি কিছুতেই আপনাকে ছেড়ে—তাঁর এই সংসার ছেড়ে—বনবাস করতে দেব না।"

"আমিই অন্য কোথাও যেতে চাই যে রেবা।"

"না, সে তাঁর নিজের বনবাসেরও বেশী হবে। আমার বাপের কাছে আমাদের সেই হিমালয়ের কোলের কুটীরে আমি ফিরে যেতে চাই। এতে তো ভাবনার কিছু নেই।"

স্ফুট চন্দ্রালোকে রেবার পানে চাহিয়া অনিল উত্তর দিল, "না,—কিন্তু —পারবে রেবা—"

অনিলের কথা শেষ না হইতেই রেবা ত্রস্তে ঘাড় নাড়িল। হ্যাঁ—কেন

পারিবে না—নিশ্চয় পারিবে। কিন্তু অনিল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল—"তোমার এ ঘর ছেড়ে যেতে পারবে তুমি ?"

রেবা কাঠের মতন বসিয়া রহিল। তাহার অচল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চাহিয়া একটু যেন বেশী বিচলিত হইয়া উঠিয়া অনিল বলিল, "মাকে ছেড়ে—তোমার মাকেও ছেড়ে যেতে পারবে রেবা ?"

রেবা এইবার দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার সঘন কম্পিত মূর্ত্তির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া অনিল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কাঁপিয়া কাঁপিয়া শেষে রুদ্ধ কণ্ঠে রেবা বলিল, "ভুলে যাচ্চেন কি—আমি কৃষ্ণার বোন ?—সে কি পারেনি ? তার মা বাপ—প্রাণাধিক আমরা—সকলকেই কি তার ছেড়ে যেতে হয়নি ?"

"গিয়েছিল—কিন্তু যাঁদের মঙ্গলের জন্য সে তেমন ক'রে গেল—তাঁদের তাতে কি কিছু মঙ্গল হয়েছিল ?"

"কিন্তু আমি গেলে হবে।"

"না,—না,—হবে না! তুমি এই ঘরে আছ মাত্র, এই চিন্তায় যা হবে, তুমি একেবারে চ'লে গেলে তার কিছুই হবে না। তুমি যেমন আছ, এম্‌নি থাক,—এর থেকে আর সরো না। সে বুঝি আর—শোন,—আমায়ই শ্যামলীকে নিয়ে দূরে যেতে দাও একটু। তুমি থাক,—এ ঘরেও অন্ততঃ তুমি থাক রেবা।"

"না, এ ঘর আজ আর আমার ঘর নয়। আমার ঘর সেই—সেই—" বলিতে বলিতে রেবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তখনি আবার জোরের সহিত সে উচ্চারণ করিল, "আমাকে আমার নিজের ঘরে নিজের আত্মীয়দের কাছে ফিরে যেতে দিন। তাঁদের জন্য আজ আমার প্রাণ কাঁদছে। কৃষ্ণার সঙ্গে—আমার মা-বাপের সঙ্গে—বিছিন্ন হয়ে আর আমি এখানে থাকতে পারব না।"

"হ্যাঁ ঠিক, তোমার আত্মজন তাঁরাই বটেন! আর তোমার ঘর, যেখান থেকে

তুমি এসেছিলে, সেইখানেই! কবে ফিরে যেতে চাও রেবা—আজই ?"

"হ্যাঁ।" তার পর সহসা জ্যোৎস্নারাত্রে বিদ্যুৎবিকাশের মত জ্যোতিহীন হাসি হাসিয়া রেবা বলিল, "সে ঘরের কথা কি আপনার মনে পড়ছে না? সেই ব্যারাম থেকে ওঠার পরে শিশির সলিলদের সঙ্গে আলোচনায় কি বলেছিলেন, মনে করুন দেখি। সেই হিমাচলের কাছে আমাদের সেই ছোট গঙ্গার তটে আবার আমি ফিরে যাব,···এতে দুঃখের কি আছে ?"

অনিল নিঃশব্দে রহিল। রেবাও নতমুখে নিস্পন্দভাবে কিছুক্ষণ থাকার পরে সহসা চমকিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া যাইবার মত হইল। অনিল উন্মাদের মত আসিয়া সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। "না—না—সে তোমার ঘর নয়। সে পাষাণের কাছে, সে বরফের কাছে কি আছে তোমার? এই তোমার ঘর, এইখানে তোমায় থাকতে হবে। হ্যাঁ, এমনি ভাবেই, তবু থাকতে হবে তোমায়।" অনিলের চীৎকারে রেবা ভীত হইয়া উঠিল। নিজে মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্য হস্তে অনিলের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ত্রস্ত স্বরে বলিল, "কি করো—থামো—ছিঃ!"

নিজের উন্মাদ উচ্ছ্বাসে অসংযত কণ্ঠস্বরে অনিল নিজেই চমকিয়া উঠিয়াছিল। রেবার স্পর্শে আরও একটু সম্বিত পাইয়া অধোমুখে দাঁড়াইল। রেবা মৃদু কণ্ঠে বলিল, "বসো।" অনিল সেইখানে বসিয়া পড়িল।

"একটু ভালো করে ভেবে ছাখো—কি করা উচিত।"

অনিলও শান্তভাবে উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তখনো তাহার সর্ব্বাঙ্গের কম্পন সম্পূর্ণ থামে নাই, তাই কণ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। "দেখেছি, কিন্তু তবু এ নয় রেবা। এতখানি অসমসাহস করতে পারছি না তবুও; তুমিও তা ক'রো না! তার চেয়ে—"

সহসা রেবা বলিয়া উঠিল, "কি করছেন—শ্যামলী কেমন ক'রে চেয়ে রয়েছে, দেখছেন না?"

অনিল চাহিয়া দেখিল—আসনের উপরে একভাবেই শুইয়া শ্যামলী কেবল চাহিয়া আছে মাত্র। সংজ্ঞা আছে কি না আছে বোঝা যায় না।

"যান—শ্যামলীর কাছে গিয়ে দেখুন—কি করছে সে।"

অনিল নড়িল না,—নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্ত্তির মত কেবল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র। রেবা তখন ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে শ্যামলীর মুখ ধরিয়া ডাকিল, "শ্যামলী—শ্যামা!—" শ্যামলী ধীরে ধীরে তাহার হাত হইতে নিজের মুখখানা ছাড়াইয়া লইয়া নিজেরই দুইহাতে নিজের মুখটাকে ঢাকিয়া ফেলিল। ব্যথিত রেবা তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, "শ্যামা,—আজ আর অমন করিস্ না—মুখ খোল্, ওঠ্,—আজ তুই একবার আমার কথা শুনতে পা,—বুঝতে হবে তোকে আজ আমার কথা! ওঠ্ শ্যামা—ওঠ্।" শ্যামলী উঠিল না। ব্যাকুল বেদনায় রেবা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াই টানাটানি করিতেছিল। সজোরে নিজেকে রেবার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া শ্যামলী উবুর হইয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ হইতে বিরক্তি অথবা বেদনা—কিসের যে একটা অব্যক্ত গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতেছিল, বোঝা গেল না। ব্যথায় লজ্জায় নীল হইয়া রেবা নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সজোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল। "চল, আজই তোমার হরিদ্বারে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দি।"

"আজই? এই রাত্রেই?"

"হ্যাঁ—এখনি।"

রেবা একটু স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, "মা যেন না জানতে পারেন।"

"না।"

অনিল উদ্যান ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে রেবা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শ্যামলীকে—"

অনিল অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ফিরে এসে।"

রেবা ফিরিয়া দেখিল শ্যামলী উঠিয়া বসিয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। আবার ছুটিয়া সে শ্যামলীর নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিল। কাঁদিয়া বলিল, "দিদি আমার—আজ আর রাগ করিস্ না—ছাখ্ আমি যাচ্ছি—চ'লে যাচ্ছি আজ আমার ঘর থেকে। আজ অন্ততঃ হাসিমুখে বিদায় দে। আমার শেষ সময়েও আজ তোর এই বিদ্বেষই দিস্ নে।"

শ্যামলী কিছু বুঝিল কি না বোঝা গেল না। আবার সে দুইহাতে মুখ ঢাকিল।

অনিল ডাকিল, "এসো রেবা।"

রেবা উঠিয়া দাঁড়াইল। অনিল তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিল, "যাও—কিন্তু অপেক্ষা ক'রো। আমার এই কর্ত্তব্য—জীবনের এই যুদ্ধ শেষ ক'রে—আমি যেদিন তোমার দুয়ারে আবার গিয়ে দাঁড়াব—সে দিনের জন্য অপেক্ষা ক'রো তুমি। সেই দিনই আমাদের বিবাহের দিন। এই জীবনের শেষেই হোক্—পরজন্মে হোক্—লোক-লোকান্তরে হোক্—যে দিন আমি সময় পাব, সেই দিনই তোমার কাছে যাবার জন্য যাত্রা করব। ততদিন তুমি অপেক্ষা করবে তো আমার জন্য রেবা?"

রেবা যন্ত্রচালিতের মত মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। হ্যাঁ, সেও জন্মজন্মান্তরে—লোকলোকান্তরেও অনিলের জন্য অপেক্ষা করিবে।

"যাও তবে।"

অনিলের মা স্বপ্নেও কোন দিন একথা ভাবিতে পারেন নাই যে, রেবাকে এমন ভাবে একা বিদায় দিয়াও তাঁহাকে সেই সংসারে থাকিতে হইবে। তিনি তাহা থাকিতেনও না। রেবা চলিয়া যাওয়ার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দিন দুই চারি বজ্রাহতের মতন স্তব্ধ হইয়া থাকার পর তিনি আবার কাশী যাইবার উদ্যোগে নূতন করিয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন! যাত্রার সমস্ত ঠিক হওয়ার পরদিন সেই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অনিলই আবার তাঁহার যাত্রা পণ্ড করিয়া দিয়াছে! মানুষ বড়ই দুর্ব্বল,—বিশেষ মা-জাতীয় জীবেরা! অপরাধী পুত্রের এতবড় পাপকেও তাঁহারা ক্ষমা না করিয়া তো পারেন না। জগতের আর কোথাও যে অনিলের ক্ষমা পাইবার কথা নয়। মা ভিন্ন অপরাধী পুত্রের সান্ত্বনা বা শাস্তির স্থান আর কোথায়? অনিল যখন তাঁহার ক্রোড়ে ও দুই পায়ের মধ্যে মাথা রাখিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িয়া কেবল 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিল, সেই এক 'মা' শব্দেই মাতা যে পুত্রের যত বক্তব্য সব বুঝিতে পারিয়াছিলেন! অনিলকে তিনিও কোন্ প্রাণে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছেন?—তিনি যে মা!

কিছুদিন পরে অনিল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, সে নিজেই স্বেচ্ছায় রেবাকে যাইতে দিয়াছে,—এবং রেবাও কেবল মাতাকে অনিলের নিকটে রাখিবার জন্যই তাঁহাকে না জানাইয়া এমন অকৃতজ্ঞের মতন চলিয়া গিয়াছে। এখন মাও আবার এই ভাবে এ সংসারকে যদি ছাড়িয়া চলিয়া যান—রেবার এ আত্মোৎসর্গ বৃথাই হইবে। মাতা একথা শুনিয়া অনবরত অশ্রুত্যাগ করিয়াছেন, অনিলকে "হৃদয়হীন, পাষাণ, পাপী, কৃতঘ্ন" অনেক কথা বলিয়াই গালি দিয়াছেন, কিন্তু তবুও বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই।

শ্যামলীকে তিনি কিছুদিন সম্মুখে আনিতে দেন নাই। শ্যামলীর সব কথা তিনি তবু জানিতেন না। অনিলই তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির আতিশয্যবশতঃ রেবাকে সম্মুখে দেখিয়া বা রেবার স্মৃতি স্মরণে আনিয়া যেটুকু ক্লিষ্টতা অনুভব করিত, তাহাও তাহার পছন্দ না হওয়ায় তাঁহার "ভারত ছাড়া" ছেলেই রেবাকে এইভাবে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে,—মাতার এইই বিশ্বাস ছিল। তথাপি শ্যামলীকে তিনি আবার অকারণেই সহ্য করিতে পারিয়া উঠিতেন না। কিন্তু যখন সলিলের বৌ ঘর করিতে আসিল, তখন শ্যামলীকে দূরে রাখা উচিত নয় বোধে তাহাকেও সংসারের মধ্যে ডাকিয়া আনিতে লাগিলেন এবং শ্যামলীর বিনীত মৃদু ব্যবহারে তাহার উপরের সে অকারণ রাগটাও বেশীদিন আর রাখিতে পারিলেন না। এ হতভাগা মেয়েটারই বা অপরাধ কি! অপরাধী যদি কেহ থাকে তো তাঁর পেটে যে ভীষ্মদেব জন্মিয়াছে, সেই। আর ততোধিক দোষী তাঁর নিজের মন্দ অদৃষ্ট!

একদিন সেই আজন্ম মূক-বধির বধূ যখন তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিল—তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। বধূ যে এখন শ্লেটে দুই চারিটা কথা লিখিয়া জায়ের সঙ্গে আলাপ করে, তাহা সলিলের স্ত্রীর নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন—কিন্তু সে যে একটু আধটু কথা কহিতেও শিখিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না। পুত্রের এই যে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, রেবার যাওয়ার পর এই যে ছয় মাস সে গৃহের বাহির হয় নাই—বুঝি চন্দ্রসূর্য্যেরও মুখ দেখে নাই, তাহার ফল আজ তিনি বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া সহসা যেন পুত্রের এই অসাধারণত্বকে তিনি সার্থক বলিয়া মনে করিলেন। পুত্রগর্ব্বে তিনি সহসা একটু গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়া যেন অনেক দুঃখই ভুলিলেন। ইহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, শ্যামলী স্বামীর নিকট দয়া বা করুণাই মাত্র লাভ করিয়া থাকে না। তাহার মুখে তৃপ্তির যে মধুর হাসি—সুখের যে সলজ্জ আভা সর্ব্বদা ফুটিয়া থাকে, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, স্বামীর স্নেহ-ভালোবাসাতেও সে বঞ্চিত নয়।

পুত্রের এই ক্ষমতাতেই তিনি সব চেয়ে বিস্মিত হইতেন। রেবাকে মনে পড়িয়া তখন তাঁহার সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত।

বধূ মাত্র লেখা-পড়া শিখিয়া বা দু-একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তাহার শিক্ষার শেষ সীমা নির্দ্ধারণ করিল না। একবৎসরের মধ্যেই রেবার শূন্য সিংহাসন,—সলিলের বধূও যাহা দখল করিতে পারে নাই,—সেই ধনীগৃহের গৃহলক্ষ্মীর পদ বধির মূক অর্দ্ধমানবী শ্যামলী অনায়াসে অধিকার করিয়া লইল। রেবার মত তৎপরতার সহিতই সে সংসারের সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে—সকল কর্ম্ম নিপুণভাবে সম্পাদন করিতে শিখিল। অনিলের মাতা রেবার হাতে যেমন করিয়া সংসার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া বড়বধূর হাতেও আবার ধীরে ধীরে সব ছাড়িয়া দিলেন। শ্যামলীর উপরে পূর্ব্বে যাহারা বিদ্বেষী ছিল—শ্যামলীর নম্র দীন ব্যবহারে আন্তরিকতাভরা যত্নে ও সারল্যে ক্রমে তাহারাও শ্যামলীর পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সলিলের স্ত্রী তো এই তাহার নির্ব্বাক স্নেহময়ী দিদিটির একটি অন্ধ ভক্তই হইয়া উঠিয়াছিল।

বৎসর দুই পরে যে দিন শ্যামলী একটি ফুল্লকুসুম-তুল্য শিশু শাশুড়ীকে উপহার দিল, সেই দিন অনিলের মাতা যেন রেবার দুঃখও ভুলিলেন। সকলের মনে যে ভয় ছিল, তাহাও কয়েক মাস পরে দূর হইল। শিশু মাতার মত হয় নাই। তাহার শ্রবণশক্তি সাধারণ বালকের মতই হইয়াছে। সে মূকও হইবে না, তাহাও ক্রমে বুঝা গেল।

* * *

কালের মাপ করিবার মত ভাবে এ গৃহের দিন যাইতেছিল না—কাজেই অনিলের মাতা পৌত্রকে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া সুখী ভিন্ন অসুখী ছিলেন না। সলিল তখন উচ্চপদ পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশেই বেশীর ভাগ থাকিতে হয়,—তাহার বধূটিও তাহার কাছে থাকে। ছোট বধূও ক্রমে ক্রমে পুত্রকন্যায় ঘর আলো করিতেছিল, কিন্তু অমিয়কে ছাড়িয়া তাহার পিতামহীর

একদিনও কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। গৃহস্বামী অনিলচন্দ্র একটা মূক-বিদ্যালয় খুলিয়া অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী জুটাইয়াছিল এবং তাহাদের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ করিয়া তাহাদের শিক্ষায় দিনপাত করিত। সম্প্রতি কয়েকটি অন্ধের কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া অন্ধকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হয়, সে বিষয়েও মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। এই সব বিষয়ে সে এতই মাতিয়া থাকিত যে সময়ে স্নানাহারও তাহার হইয়া উঠিত না। মাতা কিছু বলিতেন না—কিন্তু শ্যামলী বিষণ্ণ হইত। মুখে যেটুকু সে প্রকাশ করিতে পারিত করিত—বাকি লিখিয়া বলিত—"তুমি কি চিরকালই এই কালা-বোবাদের মধ্যেই জীবন কাটাবে?"

অনিল হাসিয়া বলিত, "হ্যাঁ।" শ্যামলী দ্বিগুণ বিষণ্ণ হইয়া পড়িত, অনুনয় করিয়া জানাইত, "বাইরেও আর এ-সঙ্গী রেখো না। তোমার পায়ে পড়ি একটু অন্য গল্প করো, অন্য লোক ডাক, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেশো। শিশিরদাদাকে মাঝে মাঝে আসতে বল।"

অনিল তেমনি হাসিমুখেই বুঝাইত, "কি জানি, হাসি গল্প আব আমার সহ্য হয় না। ঐ ভাষাহীন শব্দহীন কালা'বোবার রাজ্যেই আমি বেশ থাকি।"

শ্যামলী তখন নিঃশব্দে থাকিত। অনেক কথাই তাহার মনে পড়িত। এই মহাপুরুষ স্বামীর মহাপ্রাণতায় দিন দিন যেমন সে মুগ্ধ হইতেছিল, তেমনি আবার কি যেন মনে পড়িয়া অপরাধের ভাবে নিজে মুহ্যমানও হইয়া পড়িতেছে। শ্যামলীর মুখভাবে তাহার নীরব বেদনার সে বার্ত্তা অনিলের কাছে সেই মুহূর্ত্তেই পৌঁছিত। অমনি স্নেহে, আদরে, সান্ত্বনায় পত্নীর সে ম্লানিমা ঘুচাইয়া দিয়া অনিল নিজের কার্য্যে চলিয়া যাইত। সত্যই এই অন্ধমূকবধির-গুলা তাহাকে যেন ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়াই ফেলিতেছিল। বন্ধুবান্ধবদের বিরক্তির উত্তরে অনিল যে উত্তর দিত, "এ ছাড়া জগতের অন্য কোন কাজই আমার আর করবার শক্তি নেই। কিছু না ক'রে তো দিন যেতে পারে না—

আমায় তাই এইই চিরদিন করতে হবে!" এ কথায় অনেকটা সত্যই নিহিত ছি।। যে কাজে সে জীবনের আর সবই বিসর্জ্জন দিয়াছিল—যৌবনের প্রথম প্রভাতে নব জীবনপথের প্রথম পদক্ষেপে ভগবান তাহার মাথায় যে গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন—তাহাকেই সে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছে। সত্যই সে এ ছাড়া নিজের আর কোন কর্ত্তব্য দেখিতে পাইত না। শ্যামলীর বিষয়ে যাহা মানবসাধ্য, তাহা অনিল সম্পন্ন করিয়াছে, করিতেছে। এখন সে জগতের আরও গুটিকযেক হতভাগ্যেরও কিছু অভাব এইরূপে মোচন করিতে চায। ইহাতে তাহার নিজের জীবন দিন দিন অন্ধতমসের গর্ভে ঢুকিতেছে, বন্ধুবান্ধবেরা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তা হইলই বা —অনিল তো ভগবানের আদেশেই এই জীবন মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর যে তাহার জগতে কিছুই পাইবার নাই।

কেবল অমিয় যখন তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আধ-আধ ভাষায় 'বাবা' বলিয়া ডাকিত, তখনই অনিল খানিকটা আত্মবিস্মৃত হইত।

মাতা ভাবিতেন, অমিয়কে আর একটু বড় করিয়া দিয়া তিনি তীর্থবাসে যাইবেন। বধূ কি তাঁহার মত করিয়া অমিয়কে মানুষ করিতে পারিবে! এ বিষয়ে অবশ্য শ্যামলী ও অনিলের সন্দেহ মাত্র ছিল না, কিন্তু মাতা যে অমিয়কে একটু বড় করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন এই বিষয়েই অনিলের যা কিছু সন্দেহ ছিল।

তথাপি অনিলের মাতা রেবাকে ভুলেন নাই। এতদিন ইহাদের উপর অভিমানে তাহার নাম মুখে আনিতেন না, স্বজন-পরিত্যক্ত সন্তানকে মায়ে যেমন করিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, রেবার স্মৃতিকে তিনি তেমনি করিয়া বুকের মধ্যেই পুরিয়া রাখিতেন, কিন্তু অমিয়কে পাইয়া পর্য্যন্ত যখন তখন তাঁহার বড় বড় এক একটা নিশ্বাস পড়িত। অতর্কিতে বুঝি রেবার নামও এক একবার উচ্চারণ করিয়া ফেলিতেন। অমিয় আর খানিক বড় হইলে তিনি যে একবার

তাহাকে লইয়া হরিদ্বারে যাইবেন, এ সাধটাও অনিলের সম্মুখে একদিন প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অনিল মাথা নামাইল। কিন্তু অমিয়র ততখানি বড় হইতে যে এখনো অনেক দিন। এতদিন দেরী ভাগ্যের সহিবে কি? সে হতভাগীকে তিনি এরও পরে খুঁজিয়া পাইবেন কি? রেবাকে দেখা আর তাঁহার অদৃষ্টে আছে কি? ঈশ্বর জানেন।

৩১

বসন্তের প্রভাতে সেদিনও পার্ব্বত্য দেশেব পাদমূলে শোভার অন্ত ছিল না। হৃষিকেশ হইতে লছমনঝোলার চড়াইয়ের পথে কয়েকটি বাঙ্গালী সেদিন অগ্রসর হইতেছিল। দলটি ছোট ও অনন্যসাধারণ। রমণী হইতে আরম্ভ করিয়া একটি কিশোরবয়স্ক বালকও তাহাদের মধ্যে ছিল। দলের প্রায় সকলেই ছেলেটির তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। কেহ তাহাকে কোলে করিতে, কেহ কাঁধে করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল। ভাবে বোধ হইতেছিল লোকগুলি তাহার কষ্ট নিবারণের জন্যই সঙ্গে চলিয়াছে, কিন্তু বালক তাহাদের আগ্রহ তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিতে ছুটিতে চড়াইয়ের পথে তাহাদের আগাইয়া চলিতেছে। তাহার অনুচরের দল কষ্টের সঙ্গেই তাহার অনুসরণ করিতেছিল।

দলের অগ্রে একটি পুরুষ ও একটি রমণী। অন্য সকলে ইহাদের সান্নিধ্য হইতে যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত একটু দূরে দূরে চলিতেছিল, তাহাতে ইঁহারাই যে এ দলের প্রভু, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। রমণীটি মুগ্ধনয়নে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়াছে,—কখনো বা পুরুষটির দিকে ফিরিয়া নিজের বিস্ময় জ্ঞাপনার্থ